প্রবাস বন্ধু



শারদীয়া সংখ্যা ১৪৩৩

১৪৩৩ প্রবাস বন্ধু : সূচীপত্র : শারদীয়া সংখ্যা 2026

সম্পাদকীয়	মালবিকা চ্যাটার্জী (ডিকেটার, জর্জিয়া)	2
ডঃ অসিত কুমার সেন-এর স্মৃতিসঞ্চয়ন		
আমার চোখে অসিতদা	চন্দ্রা দে (হিউস্টন, টেক্সাস)	4
অসিতদা	মালবিকা চ্যাটার্জী (ডিকেটার, জর্জিয়া)	6
ডঃ অসিত কুমার সেনকে যেভাবে জেনেছি	ভজেন্দ্র বর্মন (হিউস্টন, টেক্সাস)	7
অসিত কুমার সেন	উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন, টেক্সাস)	8
হিউস্টন প্রবাস বন্ধু ও অসিতদা	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	9
আমাদের অসিতদা	সুমিতা বসু (হিউস্টন, টেক্সাস)	10
অঙ্কন	দেবস্মিতা কর্মকার (বয়স ১১) (কলকাতা, ভারত)	12
গদ্য		
সংজ্ঞাবিভ্রমের ধোঁয়াশা	আলী তারেক (হিউস্টন, টেক্সাস)	13
যুদ্ধের দিনগুলি	অরিন্দম ঘোষ (নাগপুর, ভারত)	17
সময়ের স্রোতে বিপাশা	আশীষ দত্ত রায় (মানালি, ভারত)	28
পরের পৃষ্ঠা	সুমিতা বসু (হিউস্টন, টেক্সাস)	30
গল্প এবং ইতিহাস	শেলী শাহাবুদ্দিন (স্টোন মাউন্টেন, জর্জিয়া)	33
কৈলাস থেকে কলকাতা: মা দুগ্গার সোশ্যাল মিডিয়া পরিবার	অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস (ফিনিক্স, অ্যারিজোনা)	37
মধ্যযুগের প্রেমকাব্য	কৃষ্ণা গুহ রায় (কলকাতা, ভারত)	40
আশ্চর্য ও করুণ	ডাঃ শান্তনু মিত্র (কলকাতা, ভারত)	44
নতুন বইয়ের গন্ধ, মামার-বাড়ি আর দুর্গাপুজো	সুশোভন মুখোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	47
কবি না কবিতা	উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন, টেক্সাস)	48
বেঁচে থাকার জন্য মানুষের কি কি প্রয়োজন এবং করণীয়	ভজেন্দ্র বর্মন (হিউস্টন, টেক্সাস)	51
কিছুক্ষণ আরো নাহয় রহিতে কাছে	সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো)	54
সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি	সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় (শান্তিনিকেতন, ভারত)	59
বৃদ্ধাবস্থার উপলব্ধি	হুসনে জাহান (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	80
কুয়াশা ও রোদ্দুরের কোলাজ	সুব্রত ভট্টাচার্য (কলকাতা, ভারত)	82
নাম, অনাম, বেনাম, ছদ্মনাম…	বাপ্পাদিত্য (হিউস্টন, টেক্সাস)	84
আলোর সন্ধানে	বীরেশ্বর মিত্র (পুনা, ভারত)	90
চাঁপাডাঙ্গায় ছ'বছর	শ্যামল মজুমদার (দিল্লী, ভারত)	92
চেন্নাই-এ হারিয়ে যাওয়া	কাবেরী ঘোষ (কলকাতা, ভারত)	94
ভালোবাসার ভূত আর ভূতের ভালোবাসা	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	96
উড়িয়ে দেবার লাগল নেশা	বলাকা ঘোষাল (হিউস্টন, টেক্সাস)	102

শাশুড়ির ছেলেকে সামলানো	রবি দে (হিউস্টন, টেক্সাস)	105
বন্ধু	সুজাতা দাস (কলকাতা, ভারত)	107
নারী সম্পর্কিত, নারী বিবর্জিত	শান্তনু চক্রবর্তী (এডিনবার্গ, টেক্সাস)	109
আরো কিছু স্মৃতি	স্যমন্তক দত্ত (দিল্লী, ভারত)	116
উত্তর	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	119
অর্ধেক আকাশ	বিষ্ণুপ্রিয়া (ইউ এস এ)	120
বিস্মরণ	আনন্দিতা চৌধুরী (ইস্ট ব্রান্সউইক, নিউ জার্সি)	124
বন্ধুত্ব	নন্দিতা ভট্টাচার্য্য (কলকাতা, ভারত)	126
কীভাবে একটি সাধারণ বাস্কেটবল কোর্টকে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা যায় এবং তুমি থাকবে বক্তৃতামঞ্চে মূল গল্প: “How to Transform an Everyday.....” written by – Matt de la Peña	অনুবাদ: নূপুর রায়চৌধুরী (অ্যান আর্বার, মিশিগান)	127

কবিতা

কেউ আছে	ডাঃ শান্তনু মিত্র (কলকাতা, ভারত)	63
মনসঙ্গীত	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	63
শান্তি	সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো)	64
প্রিয় শরৎ	কমলপ্রিয়া রায় (হিউস্টন, টেক্সাস)	65
আমি	বাপন দেব লাড়ু (মেদিনীপুর, ভারত)	65
রাই...	দেবযানী সাহা (কলকাতা, ভারত)	66
জলপ্রপাত	বিনীতা দত্ত (কলকাতা, ভারত)	67
সৃষ্টি, প্রহর শেষে	সুশোভন মুখোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	68
বাংলার ঘরে উমা	ডাঃ নিবেদিতা গাঙ্গুলী (হিউস্টন, টেক্সাস)	69
সমুদ্র এসেছিল ঝাউবনে	দেবাশিস মজুমদার (অ্যালেকজান্ড্রিয়া, ভার্জিনিয়া)	69
যদি তুমি শিশুর মতো ভালোবাসতে না পারো, কান্না আমাকে বলল ডেকে	আলী তারেক (হিউস্টন, টেক্সাস)	70, 71
ভাতা, একদিন	শঙ্কর তালুকদার (কলকাতা, ভারত)	71, 72
ঘোর, ঘাসফুল, অবাস্তব	দীপান্বিতা সরকার (কলকাতা, ভারত)	73
নৈঃশব্দের ধ্বনি	বাপ্পাদিত্য (হিউস্টন, টেক্সাস)	74
থেকে যেও নিঃশব্দে	তুহিনা সুলতানা (বর্ধমান, ভারত)	74
ভঙ্গদেশ	রঙ্গনাথ (হিউস্টন, টেক্সাস)	75
আহত সময়	অজয় সাহা (কলকাতা, ভারত)	76
অবিকল তুমি	পৃথা চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	76
পরিণাম	বৈশাখী চক্কোত্তি (কলকাতা, ভারত)	77
সৃজন, জন্মভূমি	পারমিতা বসু (কলকাতা, ভারত)	78
ডাক, সান্ত্বনা, স্তুতিনিন্দা	উদয় চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	79

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা

আশ্বিন ১৪৩৩, অক্টোবর ২০২৬

প্রকাশনায়: প্রবাস বন্ধু পাঠচক্র সভ্যবৃন্দ (হিউস্টন, টেক্সাস)

প্রচ্ছদ চিত্র:

রিতিকা নন্দী

কার্যনির্বাহী সদস্য:

চন্দ্রা দে

শ্যামলী মিত্র

সুজয় দত্ত

মালবিকা চ্যাটার্জী

প্রবাস বন্ধু পত্রিকা কেবলমাত্র

‘প্রবাস বন্ধু’ ওয়েবসাইট-এ প্রকাশিত হয়

https://www.prabashbandhu.org/

সম্পাদকীয়

আমরা সকলেই জানি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে বা সমষ্টিগত জীবনে যত বিপর্যয়ই আসুক না কেন প্রকৃতির মানচিত্রে তার জন্য কোনও হেলদোল হয় না। সূর্য-চন্দ্র, গাছপালা, নদী-সাগর সবই নিয়মমতো আপন খেয়ালে তাদের কর্তব্য পালন করে যায়। এই স্থিতপ্রজ্ঞতা কিন্তু এক শিক্ষণীয় সম্পদ। আমরা পারি কৈ! ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি বিভিন্ন কারণে – ব্যক্তিগত সমস্যাই শুধু নয়, দেশের সম্মান হানি হলে, নেতৃস্থানীয়দের অন্যায় আচরণও আমাদের বিচলিত করে। অথচ বিচলিত না হলেও তো চলে না, সবেরই প্রতিকার প্রয়োজন। হয়তো বলতে পারি উদ্বেগ, উত্তেজনা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে ধীরচিত্তে সমস্যার সমাধানের উপায় খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু উপরওয়ালাই তো আমাদের সবার মধ্যে সেই অটলচিত্ত সমভাবে বন্টন করেননি।
আশা রাখি বর্তমান জগতে যে ডামাডোলের মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি, তার একটা যুৎসই প্রতিকারের উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে অদূর ভবিষ্যতে।

পুজোর আবেশে কিছুদিন মেতে থাকা যাক। এই ব্যাপারে আমরা বাঙালিরা বড্ড অধিকারবোধসম্পন্ন। কোভিডের মতো অতি ভয়ঙ্কর ও সাংঘাতিক সমস্যাও আমাদের পুজো বন্ধ রাখেনি। বিষণ্ণচিত্তে হলেও দুর্গাবাড়িতে অন-লাইন পুজো হয়েছে। গত বছর মহা ধুমধামের সঙ্গে দুর্গাবাড়ির দুর্গাপুজোর ২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন হয়েছে। এই বছরেও সেই উৎসাহে কোনও ঘাটতি নেই। হিউস্টনের বাঙালিরা দলবেঁধে পুজোর বন্দোবস্ত নিয়ে ব্যস্ত। দুর্গাপুজোর আনন্দে আপ্লুত জগতের সকল বাঙালি।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাই আমাদের এই সংগঠন, 'প্রবাস বন্ধু'র প্রবর্তক শ্রী অসিত কুমার সেন গত ২রা মে, ২০২৬ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে অজানা জগতে পাড়ি দিয়েছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।
তাঁর পরিবারের সকলের জন্য আমাদের সহৃদয় সমবেদনা জানাই।

এই সংখ্যার প্রচ্ছদ চিত্রটির শিল্পী রিতিকা নন্দী, বয়স ২০। রিতিকা হিউস্টনবাসী শ্রীমতী শ্রীপর্ণা কুন্ডু এবং শ্রী আশীষ নন্দীর কন্যা। এই শিল্পটি রিতিকার 'ইন ও ইয়াং' (Yin and Yang) ধারণার প্রতিফলন, যা আলো ও অন্ধকারের মতো দুটি পরিপূরক শক্তিকে নির্দেশ করে। বিশেষ করে এই ছবিটিতে দিন ও রাত, সূর্য ও চাঁদ, এবং সমুদ্রসৈকত ও পার্বত্য ভূদৃশ্যের মতো প্রকৃতির বৈপরীত্যগুলো ফুটে উঠেছে। ছবিটিতে ফুলের বিভিন্ন স্তর, যা মূল অংশের রঙগুলোরই প্রতিফলন ঘটায়।
রিতিকা University of Texas at Austin-এ তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী, major in Architectural Engineering and a Certificate in Environment and Sustainability. রিতিকা বই পড়তে, গান শুনতে আর ছবি আঁকতে ভালোবাসে।
আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই রিতিকাকে এবং তার মা ও বাবাকে।

একটি অতীব সুখের খবর – প্রবাস বন্ধু পাঠচক্রের দুজন সদস্য সুরূপা শ এবং অনির্বাণ ভট্টাচার্য সম্প্রতি ১লা অক্টোবরে একটি ফুটফুটে মেয়ের মাতাপিতা পদে উন্নীত হয়েছে। ছোট্ট শিশুটির নাম শোভিতা শ ভট্টাচার্য। শোভিতা, সুরূপা এবং অনির্বাণকে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।
এই প্রথম আমরা কোনো শিশুর জন্মের খবর এই পত্রিকায় প্রকাশ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি।

পত্রিকায় যোগদানকারীদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।
আমাদের পাঠকমন্ডলীকে জানাই শারদ শুভেচ্ছা।
মালবিকা চ্যাটার্জী



{পত্রিকায় ব্যবহৃত অনুল্লিখিত ছবিগুলি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত}

৺শ্রী অসিত কুমার সেন-এর স্মৃতিসঞ্চয়ন



৺ডঃ অসিত কুমার সেন

২৭ নভেম্বর, ১৯২৯ – ২ মে, ২০২৬

শ্রী অসিত কুমার সেন এবং কয়েকজন সাহিত্যপ্রেমী মানুষের যৌথ উদ্যোগে ১৯৯১ সালে গড়ে ওঠে আমাদের আজকের এই ‘প্রবাস বন্ধু’ সংস্থাটি। তাঁর দক্ষ নেতৃত্বে ‘প্রবাস বন্ধু’ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে – তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ। অত্যন্ত বিদগ্ধ এই মানুষটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান (পলিটিক্যাল সায়েন্স) নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেক্সাসের হিউস্টন শহরে আসেন এবং অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, সঙ্গীত ও জীবনদর্শন তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করেছিল। হিউস্টনের বাঙালি সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘টেগোর সোসাইটি অফ হিউস্টন’ সংগঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি এবং ১৯৮০ সালে এর সভাপতির (প্রেসিডেন্ট) দায়িত্ব পালন করেন। জীবনের শেষ দিনগুলি তিনি অস্টিনে তাঁর কন্যা তারা, জামাতা ব্রেট, পুত্র ইন্দ্র এবং নাতি-নাতনিদের স্নেহসান্নিধ্যে অতিবাহিত করেছেন।

আমার চোখে অসিতদা

চন্দ্রা দে

অসিতদাকে যদিও আমি ‘দাদা’ সম্বোধন করতাম, কিন্তু তিনি ছিলেন আমার কাছে পিতৃতুল্য এবং আমারও অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আমি তাঁর কাছ থেকে বরাবর কন্যা স্নেহ পেয়েছি।

১৯৯৪ সালে অসিতদার বাড়িতে এক সাহিত্য সভায় ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। সেই থেকেই ‘প্রবাস বন্ধু’র সাথেও আমার সম্পর্কের শুরু এবং সম্পর্ক প্রবাস বন্ধু পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সাথে।

অসিতদা ছিলেন নানাভাবে সমৃদ্ধ। একাধারে তিনি সাহিত্যপ্রেমী, সঙ্গীতপ্রেমী, স্নেহপ্রবন, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক মনোভাবাপন্ন, আড়ম্বরহীন এবং আরও অনেক ব্যক্তিত্বের সমন্বয় – ইনি আমাদের শ্রদ্ধেয় অসিতদা।

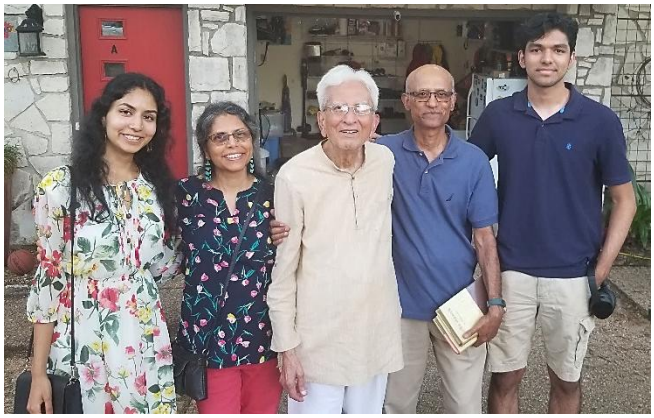
হিউস্টনে অসিতদার সঙ্গে আমাদের নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ হতো। এবং সময়ের সাথে সাথে তিনি আমাদের পরম আত্মীয় হয়ে উঠেছিলেন। উনি এই বিষয়ে একটি চিঠিও লিখেছিলেন আমাকে। সেই চিঠিটি খুব যত্ন করে তুলে রেখেছি। ওঁর স্নেহ ও আশীর্বাদ আমি সব সময় পেয়েছি। ওঁর ভাষায় – “তুমি তোমার মা বাবার সন্তান, সেই মতন তুমি আমার তিন মেয়ের মাঝে একজন সবই ঠাকুরের আশীর্বাদ।” ওঁর অন্তরে সন্তানের স্থান পেয়ে আমি আপ্লুত।

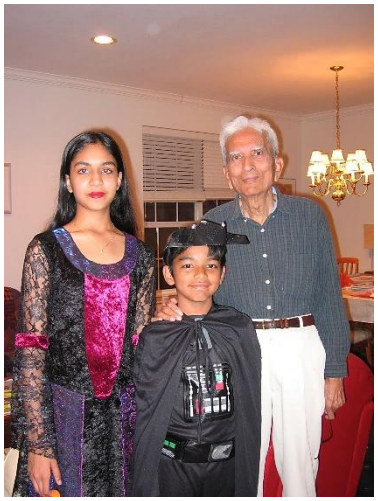
আমাদের দুই সন্তান অনুষা ও প্রমিত ছোটবেলা থেকে ওদের ‘অসিত জ্যেঠু’র কাছে অনেক স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়েছে। একসাথে বই পড়া, দাবা খেলা, Halloween-এ trick or treat-এ যাওয়া, তাদের জীবনপথে এগিয়ে যাবার সদুপদেশ দেওয়া এবং আরও কত সুন্দর স্মৃতি আছে, যেসব আমাদের সন্তানদের পাথেয় হয়ে থাকবে। আত্মীয়বিহীন প্রবাসে তাঁর কাছ থেকে যে আত্মীয়তার স্বাদ আমরা পেয়েছি তা আমাদের পরম সৌভাগ্য।

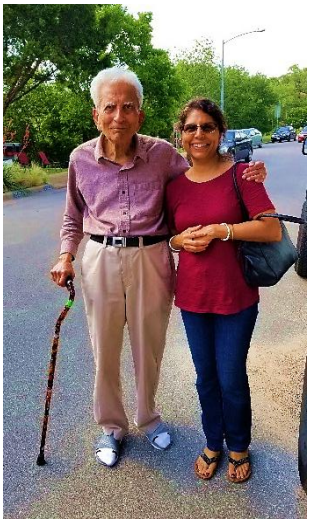
ব্যক্তিগত কারণে অসিতদাকে হিউস্টন ছেড়ে অস্টিনে চলে যেতে হয়েছিল। সুযোগ সুবিধেমতো উনি হিউস্টনে আসতেন প্রবাস বন্ধুর টানে। আমাদের খুব আনন্দ হতো, কারণ সেসময় তিনি আমাদের সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে যেতেন। খুব মনে পড়ে সেসব দিনগুলির কথা। ২০২৩-এ শেষবারের মতো হিউস্টনে এসেছিলেন এবং সাহিত্য সভায়ও যোগ দিয়েছিলেন।

হিউস্টনে থাকাকালীন সাহিত্য সভার আয়োজন ও পরিচালনা অসিতদা করতেন। অস্টিনে যাওয়ার সময় সেই দায়িত্ব উনি আমাদের দিয়ে গিয়েছিলেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও প্রবাস বন্ধুকে ঘিরে ওঁর ভাবনা-চিন্তা অটুট ছিল। আমাকে লেখা ওঁর শেষ মেসেজেও উনি প্রবাস বন্ধুর উল্লেখ করেছেন।

আশা রাখি আমরা সকলে মিলে অসিতদা ও অন্যান্যদের প্রয়াসে তৈরি আমাদের এই ‘প্রবাস বন্ধু’কে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। তাঁদের প্রতি সেটাই হবে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমার অন্তরের প্রণাম জানাই অসিতদার উদ্দেশ্যে।

















রবি ও চন্দ্রার বাড়িতে এক সম্বর্ধনা সভায় সকলে

অসিতদা

মালবিকা চ্যাটার্জী

অসিতদা একজন যথার্থ সজ্জন মানুষ ছিলেন। তাঁর ইহলোক থেকে বিদায় নেওয়ায় আমরা মর্মাহত।
অসিতদা এবং আরো কয়েকজন সাহিত্য অনুরাগী মানুষ আজকের এই 'প্রবাস বন্ধু পাঠচক্র', 'প্রবাস বন্ধু গ্রন্থাগার' ও একাধারে 'প্রবাস বন্ধু পত্রিকা'র প্রবর্তক। তাঁদের মধ্যে অনেকে আজ আর নেই। অসিতদা যতদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন ততদিন তিনি প্রয়োজনমতো প্রবাস বন্ধুর কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

আমরা হিউস্টনে গিয়েছিলাম ২০০৯ সালে; তখন এই পত্রিকা সম্পাদনার কাজে ছিল সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তার আগে ছিল সুজয় দত্ত। ২০১১ সালে প্রবাস বন্ধু সম্পাদনার এই গুরু দায়িত্ব নেবার জন্য অসিতদা আমাকে অনুরোধ জানান। আমার একটু দ্বন্দ্ব ছিল বৈকি, কিন্তু অসিতদা অভয় দিয়েছিলেন তিনি সঙ্গে আছেন। একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বের কাছে আমি নিশ্চিন্তে এবং সসম্ভ্রমে নতি স্বীকার করে নিয়েছিলাম। সেই বছর থেকে আজও আমি এই দায়িত্বে রয়ে গেছি। অসিতদার উপদেশ, সহযোগিতা, সমালোচনা সবটাই আমার সম্পাদনার পথে পাথেয় হয়ে রয়েছে।

অসিতদা আগে থাকতেন হিউস্টনে, বয়সের কারণে এক সময় তিনি অস্টিনে তাঁর মেয়ের কাছে বাসস্থান বদল করে নেন। সেখান থেকেও তিনি বহুবার হিউস্টনে মাসের শেষের পাঠচক্র সমাবেশে এসেছেন। আমাদেরও সৌভাগ্য যে তিনি আমাদের বাড়ির সভায় কয়েকবার আসতে পেরেছিলেন। শেষদিকে গোটা কয়েক বছর তিনি আর আসা-যাওয়ার ধকল সইতে পারতেন না।
অসিতদা আমাদের এই সাহিত্য সম্মিলনের এক বিরাট আশ্রয় ছিলেন। এই সংগঠনটিকে অবিরত রাখার আন্তরিক ইচ্ছা তিনি বার বার প্রকাশ করেছেন। তাঁর অবর্তমানে আমরা তাঁর এই ইচ্ছাকে অটুট রেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারি।
অসিতদার অভাব আমরা অনুভব করব অবশ্যই, কিন্তু চেষ্টা করব প্রবাস বন্ধুকে আমাদের কাজের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার।
অসিতদার কাছে আমি নানাভাবে কৃতজ্ঞ।

অসিতদার আত্মার শান্তি কামনা করি, তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।



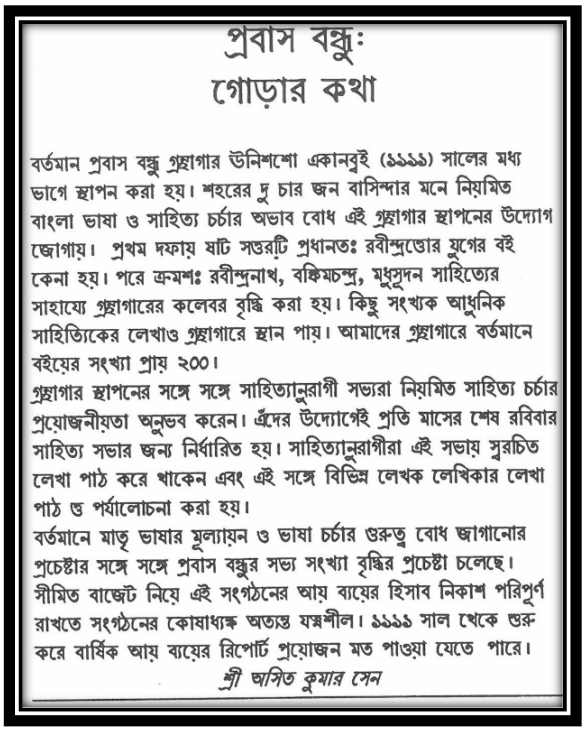


ডঃ অসিত কুমার সেনকে যেভাবে জেনেছি

ভজেন্দ্র বর্মন

আমাদের সবার প্রিয় অসিতদা ২রা মে, ২০২৬-এ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। তাঁর পরিবারের জন্য রাণী এবং আমি আন্তরিক শোক প্রকাশ করি এবং সমবেদনা জানাই।

১৯৯১ সালে অসিতদা এবং অন্যান্য সাহিত্য প্রেমীদের উদ্যোগে 'প্রবাস বন্ধু গ্রন্থাগার' নিয়মিত বাংলাভাষা ও সাহিত্য চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি মাসের শেষ রবিবার যে সাহিত্য সভার সূচনা তাঁরা করেন, তা এখনও চলছে। ১৯৯৯ সালে অসিতদা লিখিত "প্রবাস বন্ধু: গোড়ার কথা"-তে তিনি প্রবাস বন্ধুর উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ড বর্ণনা করেছিলেন (প্রবাস বন্ধু, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৫ জুলাই, ১৯৯৯)।



প্রবাস বন্ধুঃ
গোড়ার কথা

বর্তমান প্রবাস বন্ধু গ্রন্থাগার উনিশশো একানব্বই (১৯৯১) সালের মধ্য ভাগে স্থাপন করা হয়। শহরের দু চার জন বাসিন্দার মনে নিয়মিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার অভাব বোধ ঐই গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ জোগায়। প্রথম দফায় ষাট সত্তরটি প্রধানতঃ রবীন্দ্রত্তোর যুগের বই কেনা হয়। পরে ক্রমশঃ রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন সাহিত্যের সাহায্যে গ্রন্থাগারের কলেবর বৃদ্ধি করা হয়। কিছু সংখ্যক আধুনিক সাহিত্যিকের লেখাও গ্রন্থাগারে স্থান পায়। আমাদের গ্রন্থাগারে বর্তমানে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ২০০।

গ্রন্থাগার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যানুরাগী সভ্যরা নিয়মিত সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এঁদের উদ্যোগেই প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার জন্য নির্ধারিত হয়। সাহিত্যানুরাগীরা ঐই সভায় স্বরচিত লেখা পাঠ করে থাকেন এবং ঐই সঙ্গে বিভিন্ন লেখক লেখিকার লেখা পাঠ ও পর্যালোচনা করা হয়।

বর্তমানে মাতৃ ভাষার মূল্যায়ন ও ভাষা চর্চার গুরুত্ব বোধ জাগানোর প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে প্রবাস বন্ধুর সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলেছে। সীমিত বাজেট নিয়ে ঐই সংগঠনের আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ পরিপূর্ণ রাখতে সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ অত্যন্ত যত্নশীল। ১৯৯১ সাল থেকে শুরু করে বার্ষিক আয় ব্যয়ের রিপোর্ট প্রয়োজন মত পাওয়া যেতে পারে।

শ্রী অসিত কুমার সেন

অসিতদার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ২০০০ সালে, তবে তা প্রবাস বন্ধুর সভায় নয়। তখন দুর্গাবাড়ি মন্দির সবেমাত্র (সেপ্টেম্বর, ২০০০) স্থাপিত হয়েছে। হিউস্টন দুর্গাবাড়ি সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মিঃ দিলীপ কুমার দত্ত সেই বৎসর ডিসেম্বরে সোসাইটির প্রথম নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য অসিতদা, প্রতীকদা (মৌলিক), তরুণদা (তরফদার) ও আমাকে নিয়ে একটি নির্বাচন কমিটির প্রস্তাব দেন। শেষপর্যন্ত, অসিতদা (হয়তো বিশেষ কোন কারণে) একাজ করতে পারেননি। আমরা তিনজন ডিসেম্বরে নির্বাচনটি পরিচালনা করি। পরবর্তীকালে প্রবাস বন্ধুর মাধ্যমে অসিতদার সান্নিধ্যে আসি।

প্রথমদিকে প্রবাস বন্ধু পত্রিকা যখন প্রকাশ করা হতো, তখন আমরা সুভাষদার (দাস) কাছ থেকে কিনে নিয়ে পড়তাম। এরপর ২০০৮ সাল থেকে প্রবাস বন্ধু পাঠচক্রে যোগদান করলাম। সাহিত্য সভায় তখন অসিতদার সাথে নিয়মিত দেখা হচ্ছিল; তিনি আমাদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভাতেও এসেছিলেন। তখন থেকে মাঝে মাঝে প্রবাস বন্ধু পত্রিকাতে স্বরচিত লেখা দিতে শুরু করলাম। ২০১১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধ শতবার্ষিকীতে 'রবীন্দ্র সংখ্যা'র অন্যতম উদ্যোক্তা, অসিতদা এবং আরো অনেকের সাথে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। আমরা সবাই মিলে ১০০ পৃষ্টার সুন্দর একটি পত্রিকা ছাপিয়েছিলাম। এ সময় আমরা অনেকেই অর্থ দিয়ে প্রবাস বন্ধুর জন্য তহবিল করতে চেয়েছিলাম। তহবিল অনেক বেড়ে যাওয়ায় কোষাধ্যক্ষের পরামর্শে আমাদের অর্থদান নেওয়া বন্ধ করতে হয়েছিল। এখন যেহেতু প্রবাস বন্ধু পত্রিকাটি অন-লাইনে প্রকাশ করা হয়, সেক্ষেত্রে আমি যতটুকু অনুমান করতে পারি, এই তহবিল এখনও শূন্য হয়নি।



আমার পক্ষ থেকে বলতে পারি, অসিতদা এবং স্থানীয় সাহিত্যানুরাগীরা হিউস্টনে সাহিত্য চর্চার যে ধারা শুরু করেছিলেন, তা আমাকে (আমার মতো হয়তো অনেককে) লেখার উৎসাহ যুগিয়েছে। বর্তমানে যেভাবে প্রবাস বন্ধু পাঠচক্র এবং পত্রিকার কার্যক্রম চলে, আর সেই সঙ্গে এর সদস্যদের যেমন উদ্যম ও নিষ্ঠা দেখতে পাই, তাতে মনে হয় প্রবাস বন্ধু সুদূর ভবিষ্যতেও প্রবহমান থাকবে, এমন বিশ্বাস আমার রয়েছে।

অসিত কুমার সেন

উদ্দালক ভরদ্বাজ

গত শতাব্দীর আশির দশকে, শ্রী অসিত কুমার সেন, প্রীতিময় ভট্টাচার্য ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী অশোকা ভট্টাচার্যর উৎসাহে সৃষ্টি হয় আমাদের হিউস্টনের প্রবাস বন্ধু সাহিত্যসভা। প্রথম সভা হয় ১৯৯১ সালে। দীর্ঘ ৩৫ বছর আগের নিয়ম অনুযায়ী, এখনও প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাড়ে তিনটের সময় আমরা মিলিত হই কোনও এক সভ্যের বাড়িতে। নিজেদের লেখা বা যে কোন ভালো লাগা লেখা পড়ি, আলোচনা হয় সাহিত্যের নানা বিষয়ে। কখনো অতিথি লেখকরাও আসেন।

প্রতিবছর 'প্রবাস বন্ধু' নামেই আমাদের সাহিত্য পত্রিকার দুটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হয়, নববর্ষ সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা। আমাদের সভ্যদের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নানান দেশের মানুষও লেখেন এই পত্রিকাগুলিতে। আমাদের সাম্প্রতিকতম ২০২৬-এর নববর্ষ সংখ্যার ৭৭ পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে, কলকাতা, মুম্বাই, মেদিনীপুর, পুরুলিয়াসহ, উত্তর আমেরিকার একাধিক রাজ্যের বাঙালি লেখকদের লেখা কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী।

প্রবাস বন্ধুর জন্ম ও এই পথচলার অন্যতম কাণ্ডারি আমাদের সকলের প্রিয় অসিতদা ২রা মে, ২০২৬-এ চলে গেলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬। নভেম্বরে ৯৭ পূর্ণ করার আগেই বিদায় নিলেন চিরতরুণ এই মানুষটি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রবাস বন্ধু ছিল তাঁর ভাবনায়, তাঁর চর্যায়। কী লেখা হচ্ছে, কী হওয়া উচিত, কীভাবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা বিদেশের মাটিতে জিইয়ে রেখে নিজেদের এবং পরবর্তী প্রজন্মের আত্মিক উন্নতিসাধন করা যায় এই লক্ষ্যে তিনি আজীবন স্থিত ছিলেন। তাই তাঁর চলে যাওয়া এক অদ্ভুত শূন্যতা সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু আশাবাদী অসিতদার সদা-ইতিবাচক মনোভাব মনে রেখে আমরা হতাশায় না ভুগে ফিরে দেখতে চাই তাঁর ভাবনাকে, যাতে প্রবাস বন্ধু এগিয়ে যেতে পারে তার লক্ষ্যে। প্রকৃতপক্ষে ভাবনা এবং আচরণ না পাল্টেও, পাল্টে যাওয়া সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে, সংহতি ও সৃষ্টিশীলতার পথে, প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, সহমর্মিতা, পারস্পরিক সহানুভূতি এবং প্রেরণার পথে এগিয়ে চলা অতি অবশ্যই সম্ভব। এই প্রসঙ্গে রইল প্রবাস বন্ধুর একটি সংখ্যায় প্রকাশিত অসিতদার এই পত্রটি। ক্রমশ তাঁর অন্যান্য লেখা একত্রিত করে সকলের গোচরে আনার ইচ্ছা রয়েছে।

ঈশ্বর অসিতদার মেয়ে, তারা ও তার পরিবারকে শক্তি দিন, এই প্রার্থনা জানাই।



যুগ্মসম্পাদক সমীপেষু :

গত চারমাস হইল প্রবাসবন্ধুর রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের তথা পৃথিবীর এক মহান পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন যথোচিতভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। এই রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যার প্রশংসাযোগ্য উপাদান-হিসাবে প্রথমেই প্রবন্ধগুলির (বাংলা ও ইংরাজী) বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও রচনাশৈলীর উৎকর্ষ অনেক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কবিতাকয়টি সংখ্যায় কম, তবুও রসসঞ্চারণের নিরীক্ষায় সেগুলি উত্তীর্ণ হইয়াছে। সর্বশেষে, যাঁহারাই সংখ্যাটি হাতে পাইয়াছেন তাঁহারা একবাক্যে ইহার সর্বাঙ্গসুন্দর কলেবরের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমার প্রশ্ন হইল, যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সুসম্পন্ন হইয়াছে তাহার ফল কি আমরা প্রবাস বন্ধু গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিব, না বৃহত্তর সাহিত্য জগতের সহিত ইহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া আমাদের কর্তব্য? আমার মতে এদেশের কয়েকটি নির্বাচিত সাহিত্যগোষ্ঠী ভিন্ন ভারতের কিছু নির্বাচিত বাংলা পত্রিকার মাধ্যমেও এই সংখ্যাটির প্রচার করা যাইতে পারে। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকগোষ্ঠীর সহিত যোগাযোগ করিয়া জানা গেল তাঁহারা সংখ্যাটি পাইতে ইচ্ছুক। সভ্যবৃন্দের নিকট অনুরোধ, মাসিক সাহিত্যচক্রের কোনো অধিবেশনে যেন তাঁহাদের পরিচিত পত্রপত্রিকা বা সাহিত্যিকের নাম উপস্থাপন করেন।

দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যার প্রচারে যে উদ্দেশ্য, প্রবাসবন্ধুর চলিত দুইটি যান্মাসিক সংখ্যার প্রচারেও সেই একই যুক্তি প্রযোজ্য। অন্ততঃ এই দেশের কয়েকটি সাহিত্যগোষ্ঠীর সহযোগিতায় আমাদের বৈশাখী ও শারদ সংখ্যার কিছু প্রচার নিয়মিত সম্ভবপর। পরিবর্তে আমরা সেইসব সহযোগী গোষ্ঠীর পত্রিকাগুলি পাইবার সুযোগ লইতে পারি। সভ্যদের মধ্যে যাঁহাদের অবসর আছে, তাঁহাদের প্রতি এই অনুরোধ যে অন্ততঃ দুর্গাবাড়ীতে অনুষ্ঠিত দুইটি পূজার দিন তাঁহারা যদি পত্রিকাটি বিক্রয়ের দায়িত্ব দিনের কিছু সময়ের জন্য পালন করেন, তবে প্রবাস বন্ধুর প্রচারই শুধু সম্পন্ন হয় না, সমগ্র সভ্যবৃন্দের প্রশংসা ও ধন্যবাদও তাঁহাদের উপর বর্ষিত হয়। অলমতি বিস্তরেণ,

অসিত কুমার সেন

হিউস্টন প্রবাস বন্ধু ও অসিতদা

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কোনো না কোনো সময় হয়তো একজন 'অসিতদা' এসেছেন, সে আমরা দেশেই থাকি বা অন্য কোনও দেশে। আমরা যখন পুনেতে থাকতাম তখন সেখানে একজন বন্ধু স্থানীয় অসিতদাকে পেয়েছিলাম। সেটা ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৫ সালের কথা। তারপর যখন ২০০৭ সালে হিউস্টন শহরে এলাম, আর সুদীপের হাত ধরে প্রবাস বন্ধু সাহিত্য সভায় যোগ দিলাম, তখন আমাদের জীবনে দ্বিতীয়বার আরেক অসিতদাকে পেলাম। তারপর থেকে অসিতদাকে যতই দেখতাম ততই মুগ্ধ হতে লাগলাম। ওঁর উৎসাহেই হিউস্টনে প্রবাস বন্ধু সাহিত্য সভার গোড়াপত্তন। তখন আমাদের এই মাসিক সাহিত্য সভাতে নিয়মিত তিনজন সদস্যের উপস্থিতি অবশ্যই থাকত – একজন অসিতদা আর অন্য দুজন 'দাসদা' (ডক্টর ফণীন্দ্র মোহন দাস) ও অত্রিদি। অসিতদা ও দাসদা প্রায় সমবয়সী ছিলেন। আমরা প্রথমে অত্রিদি ও দাসদাকে হারিয়েছি অতিমারীর আগেই! আর এবছর – ২রা মে, ২০২৬-এ হারালাম অসিতদাকে!

অসিতদার স্মৃতিচারণ করতে বসে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক মনের মধ্যে ভেসে আসছে। অসম্ভব শান্ত স্বভাবের, ধীর-স্থির, বিচক্ষণ, মিতভাষী, ভোজন-রসিক, রসিক সাহিত্যিক, স্নেহপ্রবণ ও সৌম্য চেহারার মানুষ ছিলেন অসিতদা। তাঁর প্রত্যেকটি লেখাতে সূক্ষ্ম রসবোধ প্রকাশ পেত। সাহিত্য সভায় তাঁর উপস্থিতি অতি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। বয়সোচিত শারীরিক অসুস্থতার কারণে উনি যখন হিউস্টন ছেড়ে অস্টিনে ওঁর মেয়ের কাছে পাকাপাকিভাবে চলে গেলেন, তখন থেকেই সাহিত্য সভাতে অসিতদার উপস্থিতি ভীষণভাবে কমে যায়। রবিদা ও চন্দ্রা ওঁর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত এবং মাঝে মধ্যেই অস্টিনে গিয়ে অসিতদার সাথে দেখা করে আসত। চন্দ্রাকে অসিতদা নিজের 'মেজো মেয়ে' বলেই মানতেন, তার কারণ চন্দ্রাও ওঁকে নিজের মেয়ের মতোই যত্নআত্তি করত সবসময়। মাঝে মধ্যেই অসিতদা বাসে করে অস্টিন থেকে হিউস্টনে চলে আসতেন, রবিদা-চন্দ্রাদের সাথে থাকতেন, আর সাহিত্য সভাতেও উপস্থিত হতেন। সেটা তাঁর কাছে খুবই আকাঙ্ক্ষিত ও পছন্দের বিষয় ছিল। সেইজন্য আমরা, সাহিত্য সভার সদস্যরা, রবিদা ও চন্দ্রার কাছে চিরকৃতজ্ঞ!

আগেও সাহিত্য সভাতে না আসতে পারলে অসিতদা প্রচ্ছন্নভাবে সভাতে উপস্থিত থাকতেন। এখনও সাহিত্য আসরে কোনও আলোচনায় অসিতদার প্রসঙ্গ আসে না, এরকম আমার মনে পড়ে না। এমনই বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী আমাদের অসিতদা! সুস্বাদু খাবার খেতে ও গান শুনতে খুব পছন্দ করতেন তিনি। আর সেই কারণেই হিউস্টন সাহিত্য সভার বৈশাখী সভা ও বিজয়া সম্মিলনী সভাতে প্রথা মেনে সেই দুই রসের আয়োজন করা ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত। প্রয়োজনমতো অসিতদার নির্দেশিত সাহিত্য সভার প্রায় সব নিয়মাবলীই রবিদা ও চন্দ্রা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের সামনে এনে দেয় বরাবর।



আমরা আজ তাঁকে শারীরিকভাবে হারালেও, আমি নিশ্চিত যে আগামী সব সভাতেই আমাদের 'অসিতদা' স্বমহিমায় চির অমর হয়েই বিরাজ করবেন, এমনই তাঁর ব্যক্তিত্বের সাবলীল প্রভাব! অসিতদাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম।



আমাদের অসিতদা

সুমিতা বসু

প্রবাস বন্ধুর জন্মলগ্নে যিনি দীপটুকু জ্বালিয়ে তাকে হিউস্টনে বাংলাচর্চায় এক পাকাপাকি স্থান দিয়েছিলেন, তিনি আমাদের অসিতদা। অসিত কুমার সেন।

২০১২ সালে বস্টন থেকে হিউস্টনে এসে আমরা এই প্রবাস বন্ধু সাহিত্য সভায় যোগ দিই। পাঠচক্র চলতে থাকে প্রতি মাসের শেষ রবিবার, কোনো না কোনো সভ্যর বাড়িতে। স্বরচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ পাঠের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের লেখাও পড়া হয়, নিয়মিত না হলেও মাঝেমাঝে তো বটেই। বাংলার বিশাল রত্নভাণ্ডার থেকে এই সব মণিমুক্তো ছেঁচে এনে পরিবেশন করা সহজ কথা নয়। অসিতদার এই ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। পড়া না হলে লেখার মান বাড়ে না, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন সে কথা। আমাকে অনেকবার বলেছেন, নিজে যেমন পড়ো, তেমনি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নাও। পাঠচক্রের অধিবেশনে সময়াভাবে অনেক সময়ই তাঁর এই অনুরোধ রাখতে পারিনি, কিন্তু আলাপ আলোচনায় প্রবাস বন্ধুর সাহিত্যমনস্ক ও আগ্রহী সভ্যরা সভান্তে সাহিত্য আড্ডায় মেতেছেন বারবার। ২০১২-২০১৩ সালে দেখেছি অসিতদা প্রায় নিয়মিত যোগ দিতেন সভায়, অংশগ্রহণও করতেন।
যোগ দিতেন ফণীদাও।

পাঠচক্রকে স্বতঃপ্রণোদিত অস্তিত্বশীল করার বিষয়ে অসিতদার আগ্রহ যেমন ছিল – তেমনি ছিল কী করলে, কেমনভাবে করলে, বিষয়টি এক চলমান সংস্থা হতে পারে সেই দিকেও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সুনির্দিষ্ট ভাবনা। ইদানীং তিনি থাকতেন অস্টিনে, কন্যা তারার কাছে। সেইজন্য সব মাসে হিউস্টনে এসে পাঠচক্রে যোগ দিতে পারতেন না। কিন্তু আগ্রহভরে পরে দূরাভাষে খবরাখবর নিতেন। আমরা, মানে নীতা, চন্দ্রা ও আমি অস্টিনে গেছি অসিতদার সঙ্গে দেখা করতে। চা খেতে খেতে পড়াও চলেছে। শরীর মাঝে মাঝে অসহযোগিতা করলেও মনের উৎসাহ ছিল অসীম, তাই পড়ার বই সঙ্গে রাখতেই হতো। কোভিডের সময় রবি ও চন্দ্রার উৎসাহে অনলাইন সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যাতে দূরদূরান্তের অনেকেই যোগ দিতে পারেন। অসিতদা কখনো কখনো কম্পিউটারের মাধ্যমেও যোগদান করেছেন। সেইসময় তাঁর চোখে মুখে এক অনাবিল আনন্দ দেখেছি। প্রবাস বন্ধু তাঁর কাছে সত্যিই সন্তানতুল্য ছিল – এর বিস্তৃতি, সাফল্য ও মান উন্নত হওয়ার বিষয়ে তাই বিশেষ আগ্রহ ছিল তাঁর।

পুরোনো কিছু কথা মনে পড়ছে – সেটা কোভিডের সময়, সকলেই গৃহবন্দী। ঠিক হ'ল, অনলাইনেই কিছু করা যাক। ২০২০ সালের অগাস্ট মাসে 'বাইশে শ্রাবণ' উপলক্ষ্যে আমরা অনলাইনে একটি অনুষ্ঠান করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা ও গান নিয়ে প্রায় সকল সভ্যরা এতে যোগদান করেছিলেন। একটু সংক্ষিপ্ত ও সংস্করণ করে 'ডাকঘর' নাটকটি অভিনীত হয়েছিল, আমাদের সকলের প্রিয় সোমা অভিনয় করেছিল অমলের ভূমিকায়। তারপর আমরা সোমাকেও হারিয়েছি। এই অনুষ্ঠানের মুখবন্ধটি পাঠ করেছিলেন অসিতদা। অত্যন্ত আবেগ ও ভালোবাসা দিয়ে তাঁর পাঠটি আজও আমার কানে বাজছে। আমাকে অসিতদা লিখে দিতে বলেছিলেন বলে লেখাটি আমার কাছে আছে, সেটিই এখানে দিলাম।

"প্রবাস বন্ধুর পক্ষ থেকে সকলকে জানাই সুস্বাগতম। আজকের এই সান্ধ্যানুষ্ঠানে প্রবাস বন্ধুর নিয়মিত সভ্য ছাড়াও হিউস্টনেরই বেশ কিছু আমন্ত্রিত অতিথি আমাদের সঙ্গে আছেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে আমরা রবীন্দ্রবিষয়ক আলোচনা করব। আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য নিউ ইয়র্ক থেকে শ্রী সুমিত রায় ও বস্টন থেকে শ্রী সুমিত নাগ যোগদান করেছেন। তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
'বাইশে শ্রাবণ' বাঙালির জীবনে ও বাংলা সাহিত্যের জগতে এক নক্ষত্র পতনের দিন, ৭৯ বছর বয়সে বাংলার 'রবি' সেদিন অস্তমিত হয়েছিলেন। কবি নিজেই লিখেছিলেন,

'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
তখন কে বলে গো এই প্রভাতে নেই আমি,
সকল খেলায় করব খেলা এই আমি...'

দৈহিক অবস্থিতিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্মুখে না পেলেও আমরা দৈনিক সত্তায় প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করি তাঁর অস্তিত্ব। সেদিক দিয়ে আমরা, বাঙালিরা, অত্যন্ত ভাগ্যবান। আমরা তাঁকে নিজের ভাষায় পড়তে পারি, উপলব্ধি করতে পারি, আর তাই প্রতিদিনের প্রতি অভিজ্ঞতার এবং প্রতি অনুভূতির ভাষা-সুর ও ছন্দ পাই তাঁরই বিশাল রত্নভাণ্ডার থেকে। তিনি বিশ্বাস করতেন,

‘তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূর আমি ধাই,
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু কোথাও বিচ্ছেদ নাই।’

মানবজন্মের মুখ্য উদ্দেশ্য সীমার মাঝে অসীমের বাঁশির সুরে সুর মেলানো, প্রাত্যহিক জীবনে অজর-অমর-অবিনশ্বর-অনন্তের সন্ধান করা। উপনিষদের ভাষায়, সেই অমর আত্মা অবিনশ্বর এবং, ‘ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে’, তাই মৃত্যু আনে নবজন্মের সংকেতবার্তা।

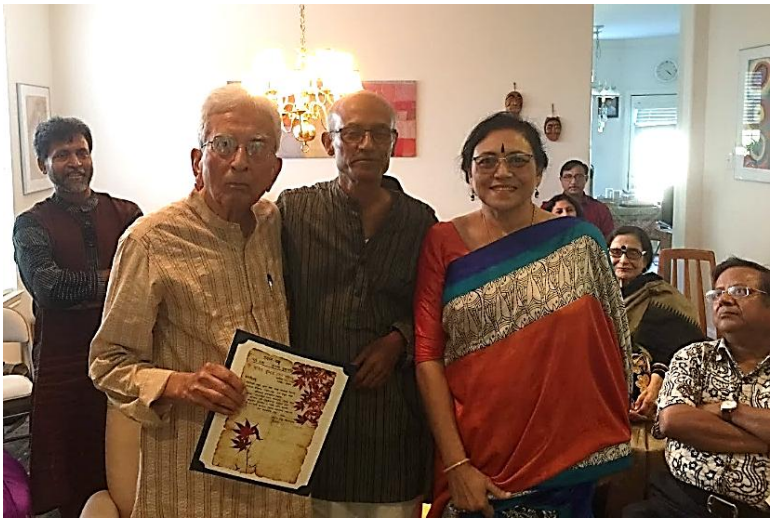
আমাদের আজকের অনুষ্ঠান ও পরিবেশনা সেই দৃষ্টিকোণ থেকে। পরিবেশনায় কিছু গান ও কবিতার সঙ্গে যে নাটকটি থাকবে তাও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে, ‘ডাকঘর’...অমলের কথা। মরণব্যাধির রোগী অমল, কিন্তু স্বপ্ন তার দু’চোখে। আর তার অপেক্ষা রাজার ডাক-হরকরার জন্য – পিসেমশাইকে সে বলে, ‘আমি দেখতে পাচ্ছি, রাজার ডাক-হরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে – বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। ...রাতদিন একলাটি চলে আসছে ...যতই সে আসছে দেখছি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুশি হয়ে হয়ে উঠছে।’

জীবনের পারাপারে মৃত্যু এক অবশ্যম্ভাবী সত্য, প্রবাস বন্ধুর ‘বাইশে শ্রাবণ’ অনুষ্ঠানে আমরা কবিগুরুর উপস্থিতিকে প্রণাম জানিয়ে বলি, ‘জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে।’
আপনারা সকলে উপভোগ করুন, আমাদের এই নতুন প্রয়াস।”

এই পুরোনো লেখাটি পড়তে পড়তে মনে হ’ল, এটি ভাগ করে নিই বর্তমান সকল সভ্যদের সঙ্গে, যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে অসিতদাকে পাননি। সকলের প্রিয় এবং প্রবাস বন্ধুর পরম বন্ধু অসিতদা জীবন মরণের সীমানা পেরিয়ে আমাদের দৃশ্যত জগতে আজ আর নেই। কিন্তু পাঠচক্রের প্রতিটি সভায় তাঁর নীরব উপস্থিতি আছে, সেটা যেন আমরা ভুলে না যাই।







প্রবাস বন্ধু শারদীয়া সংখ্যা



শিল্পী: দেবস্মিতা কর্মকার (বয়স ১১) (ষষ্ঠ শ্রেণী)

সংজ্ঞাবিভ্রমের ধোঁয়াশা যখন ব্যক্তিগত অর্থ শব্দের সঙ্গে রায়ও বহন করতে শুরু করে

আলী তারেক

আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে এমন একজন একদিন বলল, সে 'অ্যান্টি-সায়েন্স'। বিজ্ঞানের কোনো নির্দিষ্ট দাবিকে সন্দেহ করা যায়, কোনো গবেষণার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়, বিজ্ঞানীদের সততা বা কোনো বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নিয়েও সন্দেহ থাকতে পারে। এর কোনোটাই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বিজ্ঞানেরই বিরোধী – সেটা তো ঠিক নয়! তাই আমি প্রশ্ন করতে থাকলাম। কথা যত এগোল, তত বুঝলাম, তার আপত্তি পর্যবেক্ষণ, প্রমাণ, পরীক্ষা, যাচাই কিংবা প্রকৃতির নিয়ম বোঝার চেষ্টার বিরুদ্ধে নয়, তার অভিজ্ঞতার মধ্যে 'বিজ্ঞান' নামের শব্দটায় অনেক কিছু এসে জমেছে।

এমন সব গবেষণা, যেগুলো একসময় খুব নিশ্চয়তার সঙ্গে সত্য বলে ঘোষিত হয়েছিল, পরে টেকেনি; দুর্বল পদ্ধতি, গবেষকের পক্ষপাত, কোথাও অসততা, কোথাও প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা কিংবা অর্থনৈতিক স্বার্থ। আবার তার ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের নামে হাজির হওয়া কিছু দাবির সংঘাতের কথাও সে বলেছে। আমার মনে হতে লাগল, হয়তো সেই সংঘাতও ধীরে ধীরে একই শব্দের মধ্যে গিয়ে জায়গা করে নিয়েছে। অর্থাৎ আমি যখন 'বিজ্ঞান' বলছি, আর সে যখন 'বিজ্ঞান' শুনছে, আমরা হয়তো একই শব্দ উচ্চারণ করছি – কিন্তু একই জিনিস ভাবছি না। আমি যদি বিজ্ঞান বলতে বাস্তবতাকে জানার একটি পদ্ধতি বুঝি – পর্যবেক্ষণ, প্রমাণ, পরীক্ষা, সংশয়, সমালোচনা, সংশোধনের একটা চলমান ব্যবস্থা – আর তার 'বিজ্ঞান' শব্দটির মধ্যে যদি একই সঙ্গে ঢুকে থাকে ব্যর্থ গবেষণা, কিছু বিজ্ঞানীর ঔদ্ধত্য, প্রতারণা, বৈজ্ঞানিক কর্তৃত্ববাদের বাড়াবাড়ি এবং নিজের অন্য বিশ্বাসের সঙ্গে সংঘাত, তাহলে সেই দ্বিতীয় জিনিসটির প্রতি বিরাগ থাকা খুবই স্বাভাবিক হতে পারে।

সমস্যাটা সেখানে নয়। সমস্যা শুরু হয় যখন সেই বিরাগ নিজের জায়গা ছেড়ে শব্দটির সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়ে। যে অভিজ্ঞতাগুলোর তার প্রতি আপত্তি ছিল, তাদের থেকে আপত্তিটা গিয়ে বসে শব্দের গায়ে; তারপর সেই শব্দের ছাতার নিচে নতুন যা কিছু আসে, তার শরীরেও একটু একটু করে সেই পুরোনো রং লেগে যায়। একসময় শব্দটি আর আদি বিষয়টাকে চিহ্নিত করে না। নামটি শোনার আগেই তার সঙ্গে একটি রায় এসে হাজির হয়, একটা পূর্ব-নির্ধারিত বিচার চলে আসে।

আরেক বন্ধু আমাকে বলল, সে মানুষের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের ওপর তার আর বিশ্বাস নেই। একই কথোপকথনে আমাকে বলল, আমি নাকি অন্যরকম – মানুষ সম্পর্কে তার যে সিদ্ধান্ত, সেটা যেন আমার ক্ষেত্রে পুরোপুরি খাটে না। কথাটা শুনে আমার মনে হয়েছিল, কিন্তু আমিও তো মানুষ। তাহলে কোথাও একটা অসামঞ্জস্য আছে। পরে ভাবলাম, হয়তো সে আসলে মানুষের উপর থেকে আস্থা ছাড়েনি। আস্থা ছেড়েছে মানুষের প্রতি নিজের তৈরি একটি প্রত্যাশা থেকে। মানুষ বিশ্বস্ত হবে, সৎ হবে, সংবেদনশীল হবে, উদার হবে, দায়িত্ব নেবে – এইসব প্রত্যাশা হয়তো বারবার আহত হয়েছে। তারপর একসময় প্রত্যাশার ক্ষতটাই 'মানুষ' শব্দটার গায়ে উঠে এসেছে। যদি তার প্রত্যাশিত মানবিক লক্ষণগুলো কারও ভেতর খুঁজে পায়, তাতে করে তার আস্থা ফিরে আসে না। মানুষটিকে সে দেখে ব্যতিক্রম হিসেবে। "মানুষ ভালো না, তুমি আলাদা।" কী আশ্চর্য কার্যকর একটি বাক্য! সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বিপরীত প্রমাণটাকেও স্বীকার করা যায়, অথচ নিজের পুরোনো বিশ্বাসের দেয়ালে একটা ইঁটও নড়াতে হয় না।

এই একই প্রবণতার আরও কঠিন একটা চেহারা দেখেছি অপরাধ ও শাস্তির আলোচনা করতে গিয়ে। ভয়াবহ কোনো অপরাধে অভিযুক্ত কয়েকজনের বিচার বা শাস্তির পদ্ধতি অমানবিক হয়ে যাচ্ছে কিনা – এ নিয়ে একটি মানবাধিকার সংগঠন প্রশ্ন তুলেছিল। তার উত্তরে প্রিয় একজন বয়োজ্যেষ্ঠ বলেছিলেন, ওরা যা করেছে, তারপর ওদের মানুষ বলা যায় না। অমানুষের জন্য আবার মানবতা কী?

যে অপরাধের কথা বলা হচ্ছে সেই প্রসঙ্গের তাঁর ক্ষোভের ব্যাপারটা বোঝা যায়। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, চিন্তার ভেতরে একটা দেয়াল খুব নিঃশব্দে স্থান পরিবর্তন করেছে। একজন মানুষ অমানবিক কাজ করেছে। সেখান থেকে সে হয়ে গেল 'অমানুষ'। আর অমানুষ হয়ে গেলে মানুষের জন্য

তৈরি আইন, অধিকার, সুরক্ষা – এসব তার জন্য কেন থাকবে? একটি বিশেষণ প্রায় অদৃশ্য হাতে বিশেষ্যটাকেই পাল্টে দিল। বিচার ব্যবস্থার সুরক্ষা তো অপরাধীকে ভালোবেসে বানানো হয়নি, হয়েছে এই স্বীকৃতি থেকে যে আমরা ভুল করতে পারি। সাক্ষ্য ভুল হতে পারে, তদন্ত ভুল হতে পারে, রাষ্ট্র তার ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে, জনতার ক্রোধ সত্যের আগে পৌঁছে যেতে পারে। আজ যাকে ঘৃণা করছি, তার ক্ষেত্রে একটা নিয়ম ভাঙা ন্যায়সঙ্গত মনে হতে পারে। কিন্তু আইন একবার যে দরজা খুলে দেয়, কাল সে দরজা দিয়ে কার ঘরে ঢুকবে, সেটা আর আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। তাই 'ও কি মানুষ?' – এই প্রশ্নটি শুনতে নৈতিক মনে হলেও, তার আড়ালে আইন, ন্যায় এবং মানুষের ভুল করার ক্ষমতা – এই তিনটিই চাপা পড়ে যায়।

এই ঘটনাক'টি শেষ পর্যন্ত একই জায়গায় এসে মেশে। আমরা শব্দের সংজ্ঞাগুলোকে অভিধান থেকে এনে মাথার ভেতর কোনো লোহার সিন্দুকে লুকিয়ে রাখি না। শব্দের গায়ে ধুলো জমে, গন্ধ ধরে, দাগ পড়ে। অভিজ্ঞতা এর উপর নানান স্তর যোগ করে, অপমান যুক্ত হয়, ভালোবাসা, ভয়, বিশ্বাস, রাজনীতি, পারিবারিক শিক্ষা, হতাশা, কখনও একটি বিশেষ মানুষের মুখ – সব এসে জায়গা নেয় তার মধ্যে। ফলে একটি শব্দের সামাজিকভাবে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু শব্দটি আমার মনে যে দরজা খুলে দেয়, আরেক জনের মনে সেই একই দরজা খুলবে – এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। সংজ্ঞা আদৌ কোনোদিন সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ হতে পারে কিনা, সে প্রশ্ন এখানে তুলছি না। আমার নিজের সন্দেহ আছে – যথেষ্ট দূর থেকে, যথেষ্ট নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখলে হয়তো সংজ্ঞার মধ্যেও নির্বাচন, সীমারেখা, ইতিহাস আর দৃষ্টিভঙ্গির ছায়া দেখা যাবে। সে অন্য আলোচনার বিষয়।

এখানে আমার আগ্রহ অন্য জায়গায় – একটি সর্বজনীন শব্দের মধ্যে কীভাবে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ / অনুষঙ্গ জমতে জমতে একসময় সেইগুলোই শব্দটির আসল ভার হয়ে দাঁড়ায়। ধরা যাক 'নারীবাদ'। একজনের কাছে শব্দটির অর্থ নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা। আরেকজন হয়তো নারীবাদের নামে এমন কিছু কথা শুনেছে যা তার কাছে পুরুষবিদ্বেষী, অবমাননাকর কিংবা অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়েছে। ধীরে ধীরে সেই অভিজ্ঞতাগুলো 'নারীবাদ' শব্দটির সঙ্গে লেগে গেছে। তাকে যদি শুধু জিজ্ঞেস করা হয়, একই কাজ করলে নারী ও পুরুষের সমান পারিশ্রমিক পাওয়া উচিত কিনা। সে হয়তো তুলনামূলকভাবে সহজেই বলবে, 'অবশ্যই'। কিন্তু পরের মুহূর্তে যদি বলা হয়, "এটি একটি নারীবাদী অবস্থান" – তখন নারীবাদ সম্পর্কে তার যদি বিরুদ্ধ অবস্থান থাকে, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া বদলেও যেতে পারে। যুক্তি বদলায়নি, প্রস্তাবও বদলায়নি; শুধু শব্দটি প্রসঙ্গের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। অথচ সেই শব্দটি একা আসেনি – তার সঙ্গে এসেছে তার পুরোনো পরিচিত ছায়াগুলো।

পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্ম, দেশপ্রেম, লিবারেল, কনজারভেটিভ – এমন অসংখ্য শব্দ আছে যেগুলো নিয়ে দুটি মানুষ দীর্ঘ তর্ক করতে পারে, অথচ তারা হয়তো তর্ক করছে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় নিয়ে। একই শব্দের দুই প্রান্ত ধরে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু মাঝখানের সেতুটি তাদের মাথায় আলাদা। সমস্যা আরও প্রবল হয়, যখন কোনো শব্দ শুধু অর্থ নয়, সঙ্গে রায়ও বহন করতে শুরু করে। ধর্ম মানে নিপীড়ন, সম্পদ মানে লোভ, সরকার মানে জবরদস্তি, প্রাকৃতিক মানেই ভালো। তখন নতুন কোনো ঘটনা আমাদের সামনে আসার আগেই তার জন্য একটা চেয়ার টেনে রাখা আছে – সে কোন আসনে বসবে, শব্দটি যেন আগেই ঠিক করা আছে। এখানে ভাষার একটা অদ্ভুত শক্তি দুর্বলতায় পরিণত হয়। শব্দ বাস্তবতাকে ছোট করে আনার একটা অসাধারণ যন্ত্র। এত বিচিত্র, এত বহুস্তরবিশিষ্ট জগতকে আমরা কয়েকটি ধ্বনি আর চিহ্নের মধ্যে ভাঁজ করে রাখি। 'বিজ্ঞান' বলি – আর তার মধ্যে ঢুকে যায় হাজার বছর, হাজার প্রতিষ্ঠান, লক্ষ গবেষক, অসংখ্য পদ্ধতি, সাফল্য, ব্যর্থতা, প্রতারণা, সততা, সংশোধন। 'মানুষ' বলি – আর পৃথিবীর আটশো কোটিরও বেশি পৃথক জীবনের ওপর একটি মাত্র চাদর বিছিয়ে দিই। ভাষা ছাড়া উপায় নেই; কিন্তু কখনও কখনও চাদরটাকেই আমরা ভেতরের মানুষ বলে ভুল করি।

মানুষের গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই ভুলটা আরও ভয়ংকর হতে পারে। একজন বিদেশির সঙ্গে একটা খারাপ অভিজ্ঞতা হ'ল। প্রথমে মনে হ'ল, লোকটা খারাপ। পরে ওদের লোক-গুলো খারাপ। তারপর বলি ওই দেশের মানুষগুলো খারাপ। তারপর হয়তো ভাবা হ'ল যে অভিবাসীরাই খারাপ। সব শেষে বিদেশিরাই খারাপ। আশ্চর্য ব্যাপার – মূল ঘটনাটা একটুও বড়

হয়নি; একজন মানুষই হয়তো একটি কাজ করেছিল | কিন্তু ঘটনাটির ছায়া ক্রমে লম্বা হতে হতে লাখো-কোটি মানুষকে ঢেকে দিল | প্রমাণ দাঁড়িয়ে রইল এক জায়গায়, শ্রেণী ছুটতে ছুটতে দিগন্তে পৌঁছে গেল | Xenophobia বা অন্য-বিদ্বেষের অনেক শিকড়ের মধ্যে এই প্রবণতাটাও আছে বলে আমার মনে হয় | যাদের আমরা ব্যক্তিগতভাবে কম চিনি, তাদের ক্ষেত্রে মানুষটির চেয়ে তার পরিচয় অনেক বড় হয়ে দেখা দেয় | অমুক জেলার লোক এরকম, অমুক দেশের লোকেরা এমন, এসব আমরা প্রায়ই শুনি, প্রায়ই বলি |

একজন সহিংস মুসলমান ধীরে ধীরে 'মুসলমান' নামের কোটি মানুষের প্রতিনিধি হয়ে যায়; একজন প্রতারক অভিবাসী 'অভিবাসী' শব্দটির ভেতরে সন্দেহ রেখে যায়; একজন উগ্র রাজনৈতিক কর্মী পুরো মতাদর্শের মুখ হয়ে দাঁড়ায় | মানুষটি সামনে আসার আগেই তার দেশ, ধর্ম, জাতি কিংবা মতাদর্শের নাম আমাদের কাছে পৌঁছে যায় | আর সেই নামের মধ্যে যদি পুরোনো কোনো রায় জমা থাকে, নতুন মানুষটিকে সে রায় মাথায় নিয়েই ঘরে ঢুকতে হয় |

একবার যখন বিচারটা সে জায়গায় চলে যায়, তখন উল্টো উদাহরণ আমাদেরকে খুব সহজে বদলায় না | আমরা যদি মনে করি মানুষ স্বার্থপর, একজন স্বার্থপর মানুষকে দেখলেই বলি, "দেখলে, কেমন স্বার্থপর?" একজন নিঃস্বার্থ মানুষ সামনে এলে বলি, "ও একটু আলাদা |" প্রথম মানুষটি হয়ে গেল প্রমাণ, দ্বিতীয়জন ব্যতিক্রম | এইভাবে কোনো ধারণা নিজের চারপাশে এমন নিশ্ছিদ্র বেড়া তুলতে পারে, যার ভেতরে এই ধারণাটিকে ভুল প্রমাণ করার মতো কোনো উপায়ই আর ঢুকতে পারে না | যা ধারণার সঙ্গে মেলে, তা সত্যের সাক্ষী; যা মেলে না, তা ব্যতিক্রমের খাতায় চলে যায় | বিশ্বাস তখন আয়নার মতো থাকে না, জানালাও থাকে না – একটা বন্ধ ঘর হয়ে যায়, যেখানে বাইরের আলো ঢুকলে ঘরের রঙেই রাঙা হয়ে যায় | কিন্তু এরও একটা গভীরতর স্তর আছে | প্রথমে আমি একটি মত পোষণ করি; তারপর একসময় আমি হয়ে উঠি এমন একজন মানুষ, যে ওই মতটি পোষণ করে | দুটোর পার্থক্য সামান্য মনে হলেও আসলে বেশ বড় |

"কিছু বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের ওপর আমার আস্থা নেই" – এটি একটি মত | "আমি অ্যান্টি-সায়েন্স" – এটি একসময় পরিচয় (identity) হয়ে উঠতে পারে | "আমি অনেক মানুষের কাছে হতাশ হয়েছি" – এটি একটি অভিজ্ঞতা | "আমি মানুষের উপর আস্থা ছেড়ে দিয়েছি" – এটি নিজের সম্পর্কে একটি গল্প | "আমি এই রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে একমত নই" – এটি মতভেদ; কিন্তু "আমি ওই ধরনের মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো মানুষ" – এটি নিজের পরিচয়ের একটা ইঁট | আর সেই ইঁট দেয়ালে বসে গেলে তাকে খুলে আনা সহজ নয়, কারণ খুলতে গেলে দেয়ালে ক্ষত সৃষ্টি হয় – তার বেদনা আছে, তার অসৌন্দর্য্য আছে |

বহু বছর যদি আমি নিজেকে বলি – আমি নিজে ভুল করিনি, আমি বুঝেছি | অন্যেরা যা দেখতে পায়নি আমি তা দেখেছি, আমি ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি – তখন কেউ এসে যদি শুধু বলে, "তুমি যে শব্দটির বিরুদ্ধে এতদিন দাঁড়িয়ে আছ, হয়তো সেই শব্দের মধ্যে নিজের অভিজ্ঞতার আরও অনেক কিছু ঢুকিয়ে ফেলেছ," তখন সে আমাকে নিছক একটি সংজ্ঞা সংশোধন করতে বলছে না | আমার কাছে মনে হতে পারে, সে যেন আমার নিজের ইতিহাসের একটি পাতা ছিঁড়ে ফেলতে বলছে | যুক্তির হিসাবে পরিবর্তনটা সামান্য; আত্মপরিচয়ের দৃষ্টিতে সেটা ছোটখাটো একটা ভূমিকম্পও হতে পারে | পুরো প্রক্রিয়াটা তখন বৃত্তের মতো কাজ করে |

কোনো অভিজ্ঞতা থেকে শব্দের ব্যক্তিগত অর্থ তৈরি হয়; সেই অর্থের সঙ্গে একটা আবেগের রায় জুড়ে যায়; রায়টি ধীরে ধীরে পুরো শ্রেণীর ওপর ছড়িয়ে পড়ে; সেই অবস্থান আমার পরিচয়ের অংশ হয়ে যায়; এরপর নতুন কোনো প্রমাণ এলে তাকেও আমি সেই পরিচয়ের জানালা দিয়েই দেখি | শেষ পর্যন্ত নতুন প্রমাণ পুরোনো ধারণাকে ভাঙে না – বদলে তার দেয়ালে আরেকটু প্লাস্টার লাগিয়ে দেয় | তখন আমি আর শুধু শব্দ দিয়ে পৃথিবীর নামকরণ করি না; শব্দও নিঃশব্দে ঠিক করে দেয় পৃথিবীর কোন অংশটুকু আমি কীভাবে দেখতে পাব |

এর একটা খুব সাধারণ পরীক্ষা হয়তো করা যায়: শব্দটাকে কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে রাখি |

"আমি নারীবাদ সমর্থন করি কিনা" – প্রশ্নটা না করে জিজ্ঞেস করি, একই কাজের জন্য নারী ও পুরুষের সমান পারিশ্রমিক হওয়া উচিত কিনা |

"আমি বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করি কিনা" – তার বদলে জিজ্ঞেস করি, প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো দাবি সত্য কিনা সেটা কীভাবে পরীক্ষা,

যাচাই এবং প্রয়োজনে সংশোধন করা উচিত?

"অপরাধীর মানবাধিকার আছে কিনা" – তার বদলে বলি, রাষ্ট্র কাউকে অপরাধী মনে করলেই কোন কোন সুরক্ষা কেড়ে নেওয়ার অধিকার তার থাকা উচিত নয়।

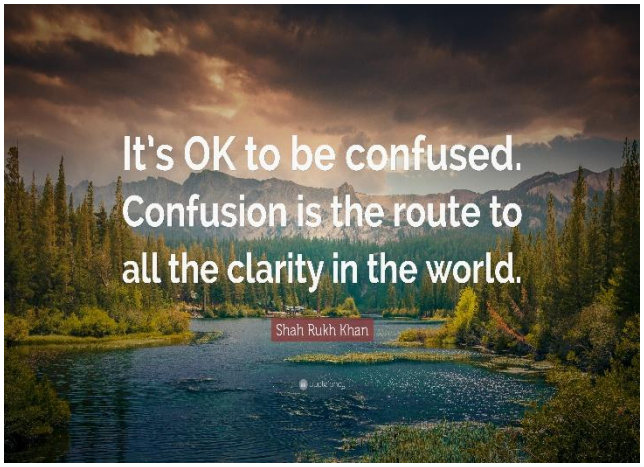
"আমি অভিবাসীদের পছন্দ করি কিনা" – তার বদলে দেখি এই নির্দিষ্ট মানুষটি কী করেছে, এই নির্দিষ্ট নীতি কী ফল আনছে, এই নির্দিষ্ট প্রমাণটি কী বলছে।

হতে পারে শব্দ সরিয়ে রাখার পরেও আমার উত্তর একটুও বদলাল না। খুব ভালো। তাহলে অন্তত বুঝলাম, আমার আপত্তিটা শুধু লেবেলের বিরুদ্ধে নয়; সেখানে সত্যিকারের কোনো মতভেদ আছে। কিন্তু কখনও কখনও আশ্চর্য কিছুও ঘটে। শব্দটি সরিয়ে দিলে রাগ একটু নরম হয়, একই প্রস্তাব এতটা ভয়ংকর মনে হয় না, একই মানুষটিকে এত সহজে ঘৃণা করা যায় না। তখন হয়তো বুঝতে পারি, এতদিন যে জিনিসটিকে বিচার করছি বলে ভেবেছিলাম, তার কিছু অংশ হয়তো আসলে ছিল তার নামের ভেতরে।

শব্দ ছাড়া তো আমরা বাঁচব না। শ্রেণীকরণ ছাড়া চিন্তা করা দুষ্কর। সংজ্ঞা ছাড়া আলোচনা এগোবে না। ভাষা যদি বাস্তবতাকে সঙ্কুচিত না করত, এক একটি শব্দ যদি অনেক কিছুকে একবারে বলে না দিত, তাহলে একটি সাধারণ আলাপও হয়তো সারাজীবন ধরে শেষ করা যেত না। কাজেই সমস্যা শব্দে নয়, সংজ্ঞাতেও নয়। সমস্যাটা হয়তো শুরু হয় যখন নিজের দেওয়া অর্থের ওপর আমাদের দখল আলগা হয়ে যায় – যখন আমরা ভুলে যাই, শব্দটার ভেতরে কিছু জিনিস পৃথিবী রেখেছে, আর কিছু জিনিস আমরাও রেখেছি। তাই মাঝে মাঝে "এই শব্দের অর্থ কী?" – এই প্রশ্নের পাশাপাশি আরও একটি প্রশ্ন করা দরকার: আমি এই শব্দটার সংজ্ঞার ভেতরে কী কী ঢুকিয়ে রেখেছি? তারপর আরও একটু অস্বস্তিকর একটা প্রশ্ন নিজেকে জিজ্ঞেস করা: আমি কি সত্যিই জিনিসটার বিরোধী – নাকি তার নামের চারপাশে এমন একটি অর্থ, স্মৃতি ও আবেগের কুয়াশা জমিয়েছি, যার ভেতর দিয়ে তাকালে তাকে অপছন্দ করা প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়ে?

কারণ কখনও কখনও আমরা মনে করি, আমরা একটি মতাদর্শিক অবস্থানকে রক্ষা করছি। আসলে হয়তো শুধু একটি সংজ্ঞা রক্ষা করছি। আর কখনও কখনও মনে করি, আমরা একটি সংজ্ঞা রক্ষা করছি। হয়তো তখন আমরা রক্ষা করছি নিজের হয়ে ওঠা মানুষটির খুব ছোট একটি অংশ – যে অংশটি ছোট বলেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং বহুদিন ধরে নিজের বলে চিনে এসেছি বলেই তাকে ছেড়ে আসা এত কঠিন।





যুদ্ধের দিনগুলি

অরিন্দম ঘোষ

[২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেশে (মূলতঃ দিল্লিতে) বেশ ধুমধাম করে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পাকিস্তানকে দর্শনীয়ভাবে পর্যুদস্ত করার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব পালিত হ'ল। সে যুদ্ধটা নিয়ে আমার অনেক স্মৃতি মনে এসে গেল। বিভিন্ন কারণে যুদ্ধটা আমার জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যার প্রথমটা হ'ল – সেই যুদ্ধের অধিনায়ক জেনারেল জে এন চৌধুরীর শৌর্যের উত্তাপে বাঙালি হিসেবে অসীম শ্লাঘা অনুভব করা। এই লেখাটি তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি।]

ভালোমতো জ্ঞান হবার পর আমি বেশ কয়েকবার ধুমধামার যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছি। এই যুদ্ধগুলোর মধ্যে একটি ছিল গেরিলা যুদ্ধ, যাতে প্রতিপক্ষ আড়ালে আবডালে থেকে আক্রমণ শানায় আর বাকিগুলো সব প্রথামাফিক যুদ্ধ, (conventional war) যাতে দুটো যুযুধান পক্ষ সৈন্যসামন্ত এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে তাল ঠোকে। এইসব যুদ্ধের প্রথমটা ছিল ১৯৫৬ সালে নাগাল্যান্ডের বৈরী নাগাদের সঙ্গে, যা ছিল গেরিলা যুদ্ধ, পরেরটা ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে, তার পরের দুটো যুদ্ধ ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে যথাক্রমে ১৯৬৫ সালে ও ১৯৭১ সালে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছিল। এই চারবারের যুদ্ধ ছাড়াও আমাদের বাড়িতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও রীতিমতো জীবন্ত বিষয় ছিল, কারণ মায়ের কাছে এবং মামার বাড়িতে সে সময়ের ঘটনাবলির গভীর অভিঘাত প্রায়ই বিভিন্ন কথাবার্তায় এসে পড়ত। এইসব কথাবার্তা থেকে সেই সময়কার কলকাতা শহরের একটা সামগ্রিক ছবি মনে গেঁথে আছে, যেখানে সন্ধ্যে থেকেই ব্ল্যাক আউটের চোটে রাস্তা লোকজনহীন, সর্বত্র থমথমে পরিবেশ, কখনো বিমান হানার সাইরেন, কোথাও বিস্ফোরণের বিকট শব্দে বাড়ি কেঁপে ওঠা...। যুদ্ধকালীন এইসব পরিস্থিতি অনুভব করার অভিজ্ঞতা কলকাতা শহরে থাকার জন্যে ঘটেছিল। অন্য কোনো শহরে থাকলে হতো না, কারণ কলকাতা শহর বেশ কয়েকটা আন্তর্জাতিক সীমারেখার এবং যুদ্ধক্ষেত্রগুলির সমীপবর্তী হওয়ায় যুদ্ধগুলোর সময়ে স্বাভাবিকভাবে প্রকৃত যুদ্ধাঞ্চলের (war zone) অঙ্গীভূত হয়ে উঠত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলি:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গভীর অভিঘাত ঘটেছিল আমার মামার বাড়িতে উত্তর কলকাতার শিব নারায়ণ দাশ লেন, যা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের (এখনকার বিধান সরণি) ওপর শ্রীমানী বাজারের উল্টোদিক থেকে শুরু হয়ে এঁকেবেঁকে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন অবধি বিস্তৃত; যেখানে 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' রচয়িতা মাস্টার মহাশয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তথা 'শ্রীম'-র বাসভবন। এর দেড় কিলোমিটার দূরে উত্তরে হাতিবাগান, পশ্চিমে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট / বড়বাজার। দক্ষিণপশ্চিমে ধর্মতলা / এসপ্ল্যানেড। ১৯৪২-এর ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ১৯৪৩-এর জানুয়ারির মধ্যে জাপানি প্লেন এসে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে দিনেরাতে অনেকবার বোমা ফেলেছিল, যার কয়েকটা ওপরে উল্লিখিত জায়গাগুলোতে পড়েছিল। বোমার বিস্ফোরণে মামার বাড়ি কেঁপে উঠেছিল এবং তিনতলায় ছাদের একটা লোহার রেলিং খুলে গিয়ে সশব্দে একতলার চাতালে পড়েছিল। খুলে যাওয়া রেলিংয়ের পাশাপাশি কয়েকটা রেলিং আলগা হয়ে গিয়েছিল। মামার বাড়িতে গেলে ছাদে উঠে এই জায়গাটা নজরে এলেই জাপানি বোমার স্মৃতি মনে এসে যেত। কল্পনায় ভাসত বোমাটার চেহারা, প্লেন থেকে পড়ার পরে অভিকর্ষের টানে তার বর্ধমান ত্বরণে নিচে নেমে আসা ও বিস্ফোরণ। জাপানি প্লেন থেকে বোমা ফেলার সঙ্গে অজস্র লিফলেটও ছড়িয়ে পড়েছিল, যার বেশকিছু মামার বাড়ির ছাদে এসে পড়েছিল। বড়মামা সেগুলো রেখে দিয়েছিল।

আমি দেখেছি ছ'ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি সাইজের সাদা কাগজে লাল হরফে ইংরেজিতে লেখা 'ILA'-কে সমর্থন করার আহ্বান। বিমান হানার সম্ভাবনা হলেই 'এয়ার রেড' সাইরেন বেজে উঠত। তখন বাড়িশুদ্ধু লোককে একতলায় চলে যেতে হতো। আমার বড়দির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল এসব দেখার। তখন তাঁর চার বছর বয়স। আমাদের প্রমাতামহীর তিরোধানে তখন সকলে মামার বাড়িতে ছিলেন। বড়দি বলেছেন সেই সময় মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে থাকার অভিজ্ঞতা। তাঁর মনে আছে বড়মামা বলছেন ফ্রেমে বাঁধানো ছবিগুলো দেয়াল থেকে নামিয়ে রাখতে যাতে বোমা বিস্ফোরণের তীব্র অভিঘাতে সেগুলোর কাঁচ না ভেঙে যায়।

জাপানি বোমা, লোহার রেলিং খুলে পড়ে যাওয়া... ইত্যাদি মোটেও ভয় উদ্রেককারী বলে মনে হয়নি কখনো | বরং মনে পড়েছে যুদ্ধকালীন সেই বিখ্যাত ছড়া – 'সারেগামাপাধানি / বোম ফেলেছে জাপানি, / বোমের ভেতর কেউটে সাপ / ব্রিটিশ বলে বাপ রে বাপ'|

কলকাতা শহর ও শহরতলীতে জাপানি বোমার কীরকম অভিঘাত হয়েছিল, তার খানিক হদিস এক ইউরোপীয়ান মহিলার আত্মজীবনীতে ধরা আছে – "Men, women and children, cars and lorries of all descriptions, donkeys, goats tethered to carts, parrots in cages on top of lorries, one solid mass of humanity were moving along the (barrackpore) trunk road, all terrified out of their wits trying to reach a place of safety anywhere away from Calcutta." ('এ হোম বাই দ্য হুগলি: এ জুটওয়ালাস ওয়াইফ', ইউজেনি ফ্রেজার, মেনস্ট্রিম পাবলিশিং, এডিনবার্গ, ১৯৮১) |

পরবর্তীতে এই যুদ্ধের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা একমাত্র বাংলা উপন্যাস বরেন বসুর 'রঙরুট' পড়ে মনে হয়েছিল ভিন্ন স্বাদের ব্যতিক্রমী গদ্য, সাহেবরা যেরকম লেখে, যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত | সে বইতেও একটা যুদ্ধকালীন ছড়া ছিল – 'আই আই আ, আ যা রঙরুট / ঘর মে মিলতা ফাটা কাপড়া, কম্পনিমে নয়া স্যুট / আ যা, আ যা, আ যা রঙরুট'|

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলীর মধ্যে এই ছাড়া আর ছিল আমার ঘনিষ্ঠ সুহৃদ বিজনের বাবার রয়াল এয়ারফোর্সের হয়ে মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধ করা | বিজনদের আহিরীটোলা স্ট্রিটের বাড়ির বাইরের ঘরে দেখেছি অনেক সাহেবদের সঙ্গে ওর বাবার একটা গ্রুপ ফটো | সবাই ইউনিফর্ম পরে একটা প্লেনের সামনে দাঁড়িয়ে | বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বোঝা যাচ্ছে এয়ারক্র্যাফ্ট সমেত সকলে 'combat ready'| ওঁকে জিজ্ঞেস করলে শুধু হাসতেন, কখনো তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতেন না |

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এরকম সব স্মৃতি আমার রয়ে গেছে গুরুজনদের কাছে শুনে শুনে | এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরও কিছু স্মৃতি আছে অন্যভাবে | যেমন, সে সময় ব্রিটিশ এবং আমেরিকানরা দেশের বিভিন্ন জায়গাতে বেশ কয়েকটা মিলিটারি এয়ারফিল্ড তথা এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করেছিল সেসবের কিছু কিছু আমি দেখেছি, যা এখন আর তেমন ব্যবহার হয় না বা একেবারেই পরিত্যক্ত | ঋত্বিক ঘটক তাঁর বিখ্যাত সিনেমা 'সুবর্ণরেখা'তে এরকম একটা পরিত্যক্ত এয়ারফিল্ড ব্যবহার করেছেন | প্রখর সূর্যালোকে ভেসে যাওয়া ধূ ধূ চত্বরের খাঁ খাঁ করা বিশালতা ফিল্মটার মূল উপপাদ্য বিষয় 'শূন্যতা'কে অতি মোক্ষমভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে | হাবড়া, অশোকনগর অঞ্চলে ভূগর্ভের জলে আর্সেনিক অনুসন্ধান কাজে গিয়ে আমি এরকম একটা এয়ারফিল্ড দেখেছি | খুব মজবুতভাবে তৈরি রানওয়ে দীর্ঘ অব্যবহারেও একশো ভাগ ভগ্নাবশেষে পরিণত হয়নি, যা অনায়াসে আবার কার্যকর হয়ে উঠতে পারে | রয়াল এয়ার ফোর্সের সেসময়ের কলকাতা ঘাঁটির ওপর সাহেবদের লেখা একটা বই থেকে জানা যায় বর্তমান অশোকনগর, হাবড়া অঞ্চলে এয়ারফিল্ড তৈরি হবার আগে দমদম এয়ারপোর্টেই তাদের ঘাঁটি ছিল | যার ফলে দমদম তখন পৃথিবীর একটি ব্যস্ততম এয়ারপোর্ট হয়ে উঠেছিল | কিন্তু পরে মিলিটারি কাজে দমদমকে ব্যবহার না করে কলকাতার ৪০ কিলোমিটার উত্তরে বেগাছিতে নতুন এয়ারফিল্ড তৈরি হয় | এই বেগাছি পরবর্তীতে অশোকনগর, হাবড়া নামে পরিচিত হয় | আজকাল আর কেউ 'বেগাছি' নামটা উচ্চারণ করে না | যুদ্ধ শেষ হতেই নামটা হারিয়ে গেছে |

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে বাঁকুড়া টাউনের কাছে পিয়ারডোবাতে, ঝাড়গ্রামের কাছে দুধকুণ্ডিতে, বর্ধমান আর দুর্গাপুরের মাঝখানে পানাগড় প্রভৃতি স্থানে এরকম এয়ারফিল্ড তৈরি হয়েছিল | এদের মধ্যে পানাগড়ের এয়ারফিল্ড এখনো ব্যবহার হয় এবং এটি সম্প্রতি নতুন করে বাড়ানো হয়েছে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের 'সি ১৩০ জে সুপার হারকিউলিস' বাহিনীর দ্বিতীয় মূল ঘাঁটি হিসেবে | এইসব এয়ারফিল্ড থেকে বিপুল সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ গোপন বিমান অভিযান চালিয়েছিল আমেরিকান এবং ব্রিটিশরা | নামকরা সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্তর নেতাজিকে নিয়ে লেখা বইয়ে লিখেছেন জাপানের ওপর নিক্ষিপ্ত পারমাণবিক বোমাগুলি আমেরিকান বিমান বহর পানাগড় থেকে নিয়ে উড়েছিল | এইসব এয়ারফিল্ডগুলোর চারধারে এখন জনবসতি গড়ে উঠেছে, কিন্তু এদের রানওয়ে বা কন্ট্রোল রুমের মজবুত

গঠন দেখলে বোঝা যায় একসময় খুব ভারী মিলিটারি বিমান ওঠানামা করত এখানে।

বিভিন্ন সূত্র, যথা যুদ্ধ সংক্রান্ত বই, সে সময়ের বৈমানিকদের লেখা আত্মজীবনী, বা কোনো সংস্থার ওয়েব পোস্টিং থেকে জানা যায় ১৯৪০ দশকে এসব এয়ারফিল্ড থেকে দক্ষিণ চীন, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি জায়গায় সেসময়ের সর্বাধুনিকতম যুদ্ধবিমানগুলি উড়ে যেত, যার সবই 'টার্বোপ্রপ' শ্রেণীর। অতএব তাদের এঞ্জিন থেকে নির্গত কানফাটানো শব্দে নিশ্চয়ই চতুর্দিক চকিত হয়ে উঠত। স্থানীয় শিয়ালরা নির্ঘাৎ রণে ভঙ্গ দিত। হয়তো ঐসব গর্জনকারী অত্যাধুনিক বিমানের রাত্রি-কালীন অপারেশনের সময় কোনো ঘুমন্ত মানুষের কানে আচমকা ঐ বিকট শব্দ বধিরতাও সৃষ্টি করত। এইসব এয়ার-ফিল্ডগুলির জমজমাট কর্মময় দিনগুলির কথা কোনো কালে কোনো লেখায় দেখতে পাইনি, তাই অজানা অপ্রাপ্তির বিষণ্ণতায় মন ভারাক্রান্ত হয়।

১৯৫৬-র যুদ্ধ:

প্রতিপক্ষ: বৈরী নাগা, রণভূমি: নাগাল্যান্ড

১৯৫০ দশকে আমরা সিঁথির মোড়ের কাছে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপর একটা বাড়ির দোতলায় থাকতাম। রাস্তার অপর পারে এই বাড়ির উল্টোদিকের বাড়িতে থাকতেন নাট্যসম্রাট শিশির কুমার ভাদুড়ি। যেহেতু এই রাস্তার শেষপ্রান্তে ব্যারাকপুরের মতন বড় ক্যান্টনমেন্ট ও মিলিটারি এরোড্রোম ছিল, তাই এই বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে দিনরাত ইন্ডিয়ান আর্মি, ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের গাড়ি, সৈন্যসামন্ত, যন্ত্রপাতির বিস্তর আনাগোনা চলত। দোতলার বারান্দা থেকে সেসব দেখতে খুবই আকর্ষণীয় লাগত। এই বাড়ির অদূরেই ছিল ইন্ডিয়ান আর্মির একটা আস্তানা যাকে বলা হতো 'ফিফটি এইট ক্যাম্প'। এই ক্যাম্প থেকে কখনো ইন্ডিয়ান আর্মির জন্যে চাল, ডাল, আটা ইত্যাদি কিনতে আর্মির ট্রাক নিয়ে ইউনিফর্ম পরা লোকজন আমাদের বাড়ির নিচে লালার দোকানে আসত, যা জানতে পারলে আমার মেজদা খুব উৎসাহ নিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় জমে উঠত। মেজদা ছোট থেকেই খুব ডাকাবুকো, রাণী ভবানী স্কুলে এবং স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার সময় গভীর একনিষ্ঠতায় এয়ার উইং এনসিসি করত এবং অনায়াসে সবগুলো সার্টিফিকেট অর্জন করে নিয়েছিল, যা দেখে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে মেজদা সেনাবাহিনীতে যাবেই যাবে। লালার দোকানে ইন্ডিয়ান আর্মির সৈন্যদের সঙ্গে অবলীলাক্রমে মেজদার কথাবার্তা চালানোর সময় আমরা অবাক হয়ে ভাবতাম কী সাহস আমাদের মেজদার!

১৯৫৬ সালে মার্চ বা এপ্রিল মাসের এক সকালে আমাদের এই বাড়ির সামনে সারি সারি মিলিটারি অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়িয়ে গেল। সংখ্যায় প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটা তো হবেই। প্রতিটা অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে জখম সৈন্যরা শুয়ে আছে। কারুর পুরো শরীরে ব্যান্ডেজ বাঁধা, কারুর একটা পা দড়ি দিয়ে ক্রেনের মতো জিনিসে বাঁধা, যাতে জখম সৈন্যটিকে উল্টো ত্রিশংকুর মতো লাগছে। এই ঘটনাতে পাড়ায় হৈচৈ পড়ে গেল – এরা কারা? কোথা থেকে এল? শেষপর্যন্ত জানা গেল এরা নাগাল্যান্ড থেকে এসেছে, যেখানে বৈরী নাগা নেতা ফিজোর নেতৃত্বে একদল বৈরী নাগা ভারতীয় সৈন্যদলের ওপর আচমকা আক্রমণ করেছে। আহত সৈন্যদের নাগাল্যান্ড থেকে এয়ার লিফট করে ব্যারাকপুর এয়ার বেসে আনা হয়েছে। তারপর সেখান থেকে অ্যাম্বুলেন্সে কলকাতার আর্মি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতের প্রতিটি রাজ্যে আজ ভারতবিরোধী শক্তিরা সক্রিয় হয়ে সশস্ত্র চোরাগোপ্তা আক্রমণে ব্যাপৃত রয়েছে। উত্তরপূর্ব ভারতের এই ভারতবিরোধী হাওয়া ১৯৫৬-তে নাগাল্যান্ড থেকেই শুরু হয়েছিল। তখন থেকে খবরের কাগজ পড়ে বা বাবার কাছে শুনে বুঝতে পেরেছিলাম বাইরের কোনো এক বা একাধিক দেশ নাগাল্যান্ডে ভারত বিরোধিতার ধারা জিইয়ে রাখতে সচেষ্ট। তখনকার কাগজে রেভারেন্ড স্কট নামে সাউথ আফ্রিকায় জন্ম কিন্তু ব্রিটিশ পাসপোর্টধারী একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজককে নাগাল্যান্ডে ভারত বিরোধিতার প্রধান উৎস বলে চিহ্নিত করেছিল। শেষে ভারত সরকার রেভারেন্ড স্কটকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি (persona non grata) ঘোষণা করেছিল। সেদিন আমাদের বাড়ির সামনে অ্যাম্বুলেন্সগুলো বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। আমরা খুব জল্পনা করতে লাগলাম – কী হ'ল রে বাবা! শেষে ঘন্টা পাঁচেক পরে তারা অগ্রসর হয়ে গেল। ঐ অ্যাম্বুলেন্সের কনভয় কেন যে সেদিন বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তার কোনো সঠিক উত্তর না পেলেও মনে হয়েছিল যে ওরা হয়তো আর্মির সেই 'ফিফটি এইট ক্যাম্প' থেকে কিছু প্রয়োজনীয় রসদ নিতে

থেমেছিল|

সেদিনটা আমার জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন হয়ে আছে, কেননা সেদিন থেকে আমি (তখন ৫ বছর বয়স) জেনে গেলাম ভারতবর্ষের মধ্যেও ভারত বিরোধীরা থাকে| সেই বয়সে কিছু গোয়েন্দা গল্পে নাগাদের নৃশংসতা নিয়ে লোমহর্ষক বর্ণনা সমূহ আমার দিদিদের কাছে শুনে মুখস্থ ছিল| তাতে জানা ছিল নাগাদের মারামারির ধরণ খুব ক্রূর | বিরাট বড় রামদা দিয়ে মানুষের মুন্ডু কেটে সেই মুন্ডু নিয়ে গেঁড়ুয়া খেলা নাগাল্যান্ডে অতি প্রচলিত ইত্যাদি | আমার মনে হ'ল অমিত পরাক্রমশালী মিলিটারিকে এরকম মেরে শুইয়ে দিয়েছে যে নাগারা তারা না জানি আরও কী কী করে থাকবে! রামদা দিয়ে মুন্ডু নির্ঘাৎ কেটেছে গোটা পঞ্চাশেক! এইসব ভাবনা যখন চলছে তখন কাগজে খবর আসতে শুরু করল ইন্ডিয়ান আর্মির প্রবল প্রতিরোধে বৈরী নাগারা সব দৌড়ে পালাচ্ছে, তাদের নেতা ফিজো তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে ইংল্যান্ডে ভেগেছে, রেভারেন্ড স্কটকে ভারত সরকার অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে, ইত্যাদি| কিন্তু সেই যে উত্তরপূর্ব ভারতের অশান্তি শুরু হ'ল, তা চলতেই থাকল | নাগাল্যান্ড নিয়ে আমার মধ্যে সেই সময় থেকে যে আগ্রহ এবং প্রশ্ন জন্মেছিল তার উত্তর আমি ধীরে ধীরে পরবর্তী চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে পেয়েছি| খনিজ প্রাপ্তিযোগ মূল্যায়নে ব্যাপৃত একটি সংস্থার এক এঞ্জিনিয়ার ১৯৮০-র দশকে আমাকে বলেছিলেন নাগাল্যান্ডে তাদের কয়লা প্রাপ্তিযোগ মূল্যায়নরত একটি ক্যাম্পে একদিন নাগারা সেজেগুজে গিটার বাজাতে বাজাতে দল বেঁধে এসে বলে গেল, "we do not want coal, we want roads. যদি রোড তৈরি করতে পারো করো, নচেৎ এ জমির একটুও খুঁড়তে দেব না|"

আমার জিওলজিস্ট বন্ধুরা বলেছেন ওখানে খুবই বিপদ, কেউ বলতে পারে না কখন কোনদিক থেকে বিপদ আসবে | আমার কিন্তু খুব আশ্চর্য লেগেছে যে এই নাগাল্যান্ড থেকেই ডাঃ টি আও-এর মতন লোক বেরিয়েছেন, যিনি কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে পড়াশুনো করে মোহনবাগানে ফুটবল খেলেছেন এবং ১৯৪৮-এ লন্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়কত্ব করেছেন | পরবর্তীতে আমাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজে উত্তরপূর্ব ভারতে যেতে হয়েছে| নাগাল্যান্ড নিয়ে আমার যা পর্যবেক্ষণ সেসব সামগ্রিকভাবে দারুণ কাজে এসেছে | এর সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৫৬-র মার্চ/এপ্রিলে নাগাল্যান্ড থেকে জখম সৈন্যদের নিয়ে যাওয়া ইন্ডিয়ান আর্মির অ্যাম্বুলেন্স কনভয় দেখতে দেখতে|

১৯৬২-র যুদ্ধ:

চৈনিক আগ্রাসন, রণভূমি: ভারত / চীন সীমান্ত:

১৯৬২-র চৈনিক আগ্রাসন একটা আচমকা ঝটকার মতো এসেছিল | এই আগ্রাসনের আগে 'হিন্দি চিনি ভাই ভাই' স্লোগানে দেশ ভেসে গিয়েছিল| তখন চীনের সঙ্গে দারুণ দহরম মহরম | তখনকার চৈনিক প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই কলকাতায় এসে আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে নিকটবর্তী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্থান ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট এবং ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাট পরিদর্শনে গেলেন একটা কালো রোলস রয়েস গাড়িতে | এই ধরনের ভ্রমণগুলো যখন হতো তার কিছুদিন আগে থেকেই রাস্তায় সাজসজ্জা হতে থাকত | প্রতিটা ল্যাম্পপোস্টের একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় দু'দেশের পতাকা লাগানো হতো, কোনো কোনো বিশেষ মোড়ে বা জায়গাতে তোরণ করা হতো| কোনো কোনো জায়গায় বড় করে ফুল দিয়ে বা ইলেকট্রিক বাল্ব দিয়ে 'স্বাগতম' লেখা থাকত | চৌ এন লাই-এর বেলাতেও সেসবের ব্যাপক আয়োজন ছিল| কিন্তু সেই ১১ বছর বয়সে আমার চীনের প্রধান মন্ত্রী সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ বোধ করিনি, ডাকটিকিট জমানোর সুবাদে | সেসময় আমার কাছে যত জমানো ডাকটিকিট ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে খাজা ছিল চীনের ডাক টিকিটগুলো – যেমন তাদের কাগজ বাজে ছিল তেমনি বাজে ছিল তাদের প্রিন্টিং কোয়ালিটি| আমার বক্তব্য ছিল, যে দেশের ডাকটিকিট এত বাজে, সে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে এত পাত্তা কেন দিচ্ছে রে বাবা!

চৌ এন লাই ভারতে ঘুরে যাবার কিছুকালের মধ্যেই চীনের আগ্রাসন ঘটেছিল | ২০শে অক্টোবর লাদাখ এবং নেফা (বর্তমান অরুণাচল প্রদেশ) দুজায়গা দিয়েই চীন আক্রমণ চালাল | নেফা রণক্ষেত্রে খুব দ্রুত নানান ঘটনা ঘটতে লাগল | তখন খবরের একমাত্র উৎস কাগজ আর রেডিও, বিশেষ কোনো খবর থাকলে বিভিন্ন কাগজের একপাতার বিশেষ সংস্করণ বেরিয়ে যেত সন্ধ্যেতে, তাকে 'টেলিগ্রাম' বলা হতো | চীনের

আগ্রাসনের দিনগুলিতে প্রতি সন্ধ্যেতেই 'টেলিগ্রাম' বেরোতে লাগল | চীনে সৈন্যরা হুড়হুড় করে ইন্ডিয়ান পজিশনগুলো ওভাররান করে আসামের তেজপুর উপকণ্ঠ, বমডিলায় পৌঁছে গেল | এর আগে অবধি মনে হচ্ছিল ভারতীয় সৈন্যরা নিশ্চয়ই পরিস্থিতি সামলে দেবে | কিন্তু তা তো হ'লই না, রোজ খবর আসতে লাগল ভারত হেরে যাচ্ছে | বমডিলার যেদিন পতন হ'ল সেদিন মনে হয়েছিল চীনেরা বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে | কাগজে খবর বেরোল এবার কলকাতাও শত্রু বিমান হানার আওতায় এসে গেছে | এর পর থেকেই কলকাতায় ব্ল্যাক আউট শুরু হ'ল এবং বিভিন্ন কারখানার সাইরেনগুলো সকাল ন'টার সময় একবার বিমান হানার সংকেত আর তার খানিক পরে 'অল ক্লিয়ার' সংকেত দিতে শুরু করল | আর একটা খবর বেরোল, কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বড় বড় কারখানাগুলো, যেমন জেশপ কম্পানি, চিত্তরঞ্জন রেল কারখানা, দুর্গাপুরে স্টিল প্ল্যান্টসহ অন্যান্য কারখানা ইত্যাদির শেড সবুজ রঙ করে দেবার; যাতে শত্রু বিমান চট করে ধরতে না পারে ওগুলো কারখানা | ক্যামোফ্লজ |

যুদ্ধ যত তীব্র হতে লাগল এবং ভারত জমি হারাতে লাগল, কলকাতা শহরে নানান গোলযোগ শুরু হয়ে গেল | মঙ্গলয়েড লোকেরা স্থানীয়দের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠল | বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে চীনেদের জুতোর দোকান সব বন্ধ থাকতে শুরু করল | কলকাতায় পুরুষানুক্রমে বসবাসকারী চীনারা নানান উপায়ে জানান দিতে শুরু করল তারা কুওমিনতাং অর্থাৎ তাইওয়ান সমর্থক | জাপানি দূতাবাসে গাড়ির পেছনের কাঁচের ওপর বাংলায় 'আমরা জাপানি' লেখা কাগজ সেঁটে দিল যার ছবি 'দ্য স্টেটসম্যান' কাগজে তখন বেরিয়েছিল |

মাস খানেক যুদ্ধ চলার পর থেমে গেল, কিন্তু জাতীয় জীবনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে গেল | এই যুদ্ধের পর 'হিন্দি চিনি ভাই ভাই' পরিহাসের মতন শোনায় | চীনের এই আগ্রাসন নিয়ে তারপরে বহু লেখাজোখা বের হতে লাগল, ডিফেন্স মিনিস্টার ভি কৃষ্ণ মেননের পতন শুরু হ'ল, কারণ সে সময় অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে গোলা বারুদের পরিবর্তে বালতি, হ্যারিকেন ইত্যাদি তৈরি হচ্ছিল বলে খবর বেরোল, সেসময়কার ইন্ডিয়ান আর্মি প্রধান বি এম কাউল চিরকালের জন্য অপদার্থতম সেনাপ্রধান বলে চিহ্নিত হলেন | ১৯৬২-র পর তিপ্পান্ন বছর হয়ে গেল, সে যুদ্ধের অনেক তথ্য অজানা রয়ে গেছে | এখনো অবধি সে যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ – 'হেন্ডারসন ব্রুক্স রিপোর্ট' সরকারিভাবে প্রকাশিত হয়নি |

এই যুদ্ধ আমার মনেও গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে গেল | হিউ এন সাং-এর দেশ কী করে আগ্রাসন দেখাতে পারে? সে সময় যুদ্ধের পরেই বিখ্যাত ব্যতিক্রমী সাংবাদিক দেবজ্যোতি বর্মণ তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'যুগবাণী'তে এক অসাধারণ সিরিয়াল আলোচনা লিখলেন – 'তিব্বতে নেহরুর ভুল', যা পরবর্তীতে বই হিসেবে বেরিয়েছিল | চীনকে তিব্বত উপহার দেওয়াটা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলেই বোঝা যায় ভুল হয়েছিল, কারণ তিব্বতী ভাষাটার উৎস হচ্ছে সংস্কৃত | অতএব তিব্বতের সংস্কৃতি মূলতঃ ভারতীয় উপমহাদেশীয় সংস্কৃতিরই অঙ্গ, চৈনিক সংস্কৃতির অঙ্গ নয় |

'খনার বচন' শীর্ষক এক বইতে পড়েছি চীনেদের সম্বন্ধে বলা আছে, তাদের ভাবগতিক বোঝা যায় না | বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় ভারত সরকারের গোয়েন্দারা চীনেদের একদমই বিশ্বাস করেন না | এই কারণেই সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের হাওয়ায় যেখানে যে কোনো দেশ যে কোনো দেশে গিয়ে যে কোনো সিভিল বিজনেসে যোগ দিতে পারে, সেক্ষেত্রে বছর কয়েক আগে তদানীন্তন গোয়েন্দা প্রধান এম কে নারায়ণন (যিনি পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়েছিলেন) চীনে বিজনেস হাউসদের ভারতীয় সমুদ্র বন্দর ও বিমান বন্দর তৈরির কাজে অংশই নিতে দেননি |

১৯৬২-র যুদ্ধের পর আজ ২০১৫ | এত বছর কাটার পরেও সীমান্ত চিহ্নিতকরণ সমস্যা নিয়ে যে যুদ্ধ হয়েছিল তা রয়ে গেছে এবং থেকে থেকেই বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে | দিল্লিতে চীনের দূতাবাস অরুণাচলের অধিবাসীদের চীন ভ্রমণের জন্যে চৈনিক ভিসায় 'stapled visa'-র মতো জটিলতা সৃষ্টি করে রেখেছে | সমস্যার নিশ্চয়ই কোনো সমাধান আছে | কী সেই সমাধান?

১৯৬৫র যুদ্ধ:

প্রতিপক্ষ: পাকিস্তান, রণভূমি: ভারত / পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত:

১৯৬৫-র আগস্ট / সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যে যুদ্ধ হয়েছিল, সেটা আমার জীবনে বিভিন্ন কারণে বিশেষ

স্মরণীয়। যেহেতু যুদ্ধটা ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে এবং কলকাতা শহরটা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বা এখনকার বাংলাদেশের একদম গা ঘেঁষে অবস্থিত তাই যুদ্ধ শুরু হতেই ব্ল্যাক আউট শুরু হয়ে গেল। তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন। তাঁর নেতৃত্বে সরকার সিদ্ধান্ত নিল ৫ই সেপ্টেম্বর সকালে কলকাতা শহরের এয়ার রেড সাইরেনগুলো ঠিক আছে কিনা যাচাই করা হবে একসঙ্গে একই সময়ে চালিয়ে দিয়ে। সকাল ৯টার সময় এই ঘটনা ঘটবে বলে খুব প্রচার হ'ল। সাইরেন চালিয়ে দেওয়া মানেই তা দিয়ে ওঁয়াও...ও... ওঁয়াও...ও... আওয়াজ বেরোতে থাকবে। যদি আওয়াজটা এয়ার রেড-এর আওয়াজ হয় তাতে জনতা ভুল বুঝতে পারে, কারণ যুদ্ধের সময় এয়ার রেড সাইরেন বাজার একটাই মানে, যে শত্রু বিমান হানা দিয়েছে, কিন্তু আসলে এটা তো স্রেফ সাইরেন টেস্টিং হবে। তাই সিভিল ডিফেন্স অথরিটি ঠিক করল ৫ তারিখে সাইরেন টেস্টিংয়ের সময় সাইরেন দিয়ে অল ক্লিয়ার আওয়াজ বার করা হবে। সেদিনটা আমার বেশ মনে আছে। স্কুলে (বরানগর নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দির) ক্লাস টেনের হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার কেমিস্ট্রি পেপার ছিল। ১১ টা থেকে পরীক্ষা হতো। হলে গিয়ে দেখি বিরাট হৈচৈ, ছেলেরা বলছে সকাল ৯টায় যখন সিভিল ডিফেন্স অথরিটির অল ক্লিয়ার সাইরেন বাজিয়ে টেস্টিং চলছিল তখন পাকিস্তান এয়ারফোর্স প্লেন এসে ব্যারাকপুরে মিলিটারি এরোড্রোমে বোমা বর্ষণ করে গেছে। এই এরোড্রোম আমাদের স্কুল থেকে ৬-৭ কিলোমিটার উত্তরে। যেসব ছেলেরা ওদিকে থাকত তারা জানাল সকাল ৯টা নাগাদ তারা বেশ কিছু বিধ্বংসী আওয়াজ শুনেছে ও তাদের বাড়িঘর কেঁপে উঠেছে।

এই বোমা বর্ষণের ঘটনায় সিভিল ডিফেন্স অথরিটির খুব সমালোচনা হ'ল। তারা কিন্তু বিভিন্ন কাগজে নিত্য নতুন পরামর্শের বিজ্ঞাপন দিতেই থাকল। সেসব পরামর্শের মধ্যে একটি ছিল প্রত্যেক বাড়ির জানলার কাঁচে ইংরেজির 'X' আকারে কাগজের পটি লাগানো। তাহলে বোমার বিস্ফোরণ জনিত কম্পনে কাঁচ ভাঙার আশঙ্কা কম হবে। ফলে রাতারাতি শহরের প্রতি বাড়ির জানালার কাঁচে ঐরকম কাগজ লেগে গেল, যা যুদ্ধ শেষ হওয়ার বহু বছর পরও তেমনই রয়ে গেল। এই যুদ্ধের তীব্রতা যত বাড়তে লাগল আমাদের পাড়া দিয়ে কত যে অপরিচিত লোকের আনাগোনা ঘটতে লাগল তার ইয়ত্তা নেই। এরা সবাই শরণার্থী ছিল। ১৯৬৫-র এই যুদ্ধর আগের যুদ্ধে, অর্থাৎ ১৯৬২-র চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ভারত রীতিমতো হেরে গিয়েছিল। তাই ব্যারাকপুরের ওপর পাকিস্তানি প্লেন বোমা ফেলে যাওয়াতে মনে হ'ল এবার বোধহয় আবার ভারত হারতে চলেছে। কিন্তু তা একদমই হ'ল না।

এর পরের ঘটনাগুলো এরকম – পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারত অনেকগুলো ফ্রন্ট খুলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দিয়ে পাকিস্তানকে আক্রমণ চালাল এবং পাকিস্তানের অতি গুরুত্বপূর্ণ সব শহরের দোরগোড়ায় গিয়ে হাজির হ'ল। এই শহরগুলো হ'ল হায়দরাবাদ (এটা পাকিস্তানের 'সিন্ধু' প্রদেশে, আমাদের রাজস্থানের গায়েলাগা), শিয়ালকোট এবং লাহোর (এগুলো আমাদের পাঞ্জাবের গায়েলাগা)। কাশ্মীরেও ভারত উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করল। ছোট থেকে সাঁড়াশি আক্রমণের কথা শুনে এসেছি, ১৯৬৫-র যুদ্ধে ভারত পশ্চিম রণাঙ্গনে পাকিস্তানকে সাঁড়াশি আক্রমণ করে সেই ডি এল রায় কথিত 'গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি'। সেসময় টাইমস অফ ইন্ডিয়া গ্রুপের বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'দ্য ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া'-তে (এখন উধাও) সেই যুদ্ধের ফটো ফিচারে এক অবিস্মরণীয় ছবি ছাপিয়েছিল – আমাদের পাঞ্জাবের 'খেমকারান' গ্রামের জলেভরা ক্ষেতে অজস্র মার্কিন প্যাটন ট্যাংক (বিশ্বের এক নম্বর ট্যাংক) নিজের ওজনের ভারে কাদার মধ্যে গেঁথে রয়েছে। ছবিটার ক্যাপশন ছিল 'খেমকারান – গ্রেভ ইয়ার্ড অফ প্যাটন ট্যাংকস'। ভারত অসংখ্য প্যাটন ট্যাংক দখল করে নিল এবং অসংখ্য প্যাটন ট্যাংক ধ্বংসও করে দিল। সরকার সেসময় দখল করা প্যাটন ট্যাংকগুলো নিয়ে দেশের বিভিন্ন শহরে প্রদর্শনী শুরু করেছিল। কলকাতায় প্রদর্শনীটা শুরু হয়েছিল গড়ের মাঠে ফোর্ট উইলিয়ামের ঠিক উল্টোদিকে। কিন্তু মাত্র একদিন চলার পরে সেই প্রদর্শনী আমেরিকান গভর্নমেন্টের চাপে বন্ধ হয়ে গেল।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধে ভারতীয় সেনা বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল জে এন চৌধুরী, যাঁর পুরো নাম জয়ন্ত নাথ চৌধুরী। তিনি পাবনার সুবিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের সদস্য। তাঁর মা ছিলেন ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেন্ট ডব্লিউ সি বোনার্জির মেয়ে, জ্যাঠামশাই ছিলেন 'সবুজপত্রে'র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে

পড়াশুনো শেষ করে তিনি ইংল্যান্ডের এলিট যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত শিক্ষাসংস্থান স্যান্ডহার্স্ট মিলিটারি অ্যাকাডেমি থেকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন। পরে ব্রিটিশ আর্মিতে কমিশন লাভ করেন ও একের পর এক যুদ্ধে গৌরবময় জয় অর্জন করেন। স্বাধীনতা লাভের সময় তিনি ভারতের হায়দরাবাদের মিলিটারি অভিযান পরিচালনা করেন ও নিজামের পরাজয় নিশ্চিত করে ভারত সরকার কর্তৃক কিছু সময়ের জন্যে (যতদিন না প্রাক্তন নিজামশাহী রাজ্য ভারতের আনুগত্য সম্পূর্ণ স্বীকার করে) হায়দরাবাদের শাসক নিযুক্ত হন। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে এক অনন্য গৌরবময় বিজয় এনে দেন।

দিন পনেরো চলেছিল সে যুদ্ধ। যুদ্ধের শেষদিকে ইন্ডিয়ান আর্মির অপ্রতিরোধ্য চেহারা সারা দেশজুড়ে দারুণ উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। ইন্ডিয়ান আর্মির অধিনায়ক জেনারেল জে এন চৌধুরীর কড়া (tough), পোড় খাওয়া (seasoned), লম্বা চওড়া চেহারা, সাহেবি ধরণ, এবং তার সঙ্গে সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে নিকট আত্মীয়তা কলকাতায় আমাদের কাছে বাঙালি জাতির নতুন পরিচয় তুলে ধরেছিল। সাঁড়াশি আক্রমণের অমন সফল প্রয়োগ তিনি যা দেখিয়ে গেছেন তা যুগ যুগ ধরে স্মরণ করার মতো। জেনারেল চৌধুরীর জীবনগাঁথা (track record) আমাদের কাছে অননুকরণীয় মনে হয়েছিল – কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স, তারপর ইংল্যান্ডের স্যান্ডহার্স্ট মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে যুদ্ধনীতি শিক্ষা, হায়দরাবাদের নিজামশাহীর ভারতভুক্তি অভিযানের নেতৃত্ব ও সেখানকার মিলিটারি শাসক হিসেবে নিয়োগ এবং ক্ষুরধার রণনীতি প্রয়োগে পাজি দেশ পাকিস্তানের নাশ – আমাদের কাছে স্বপ্নের মতো লেগেছিল। মনে হয়েছিল এমন বাঙালিও হয় তাহলে! বস্তুত জেনারেল জে এন চৌধুরী আমার দেখা শ্রেষ্ঠতম বাঙালি। ১৯৬৫-র যুদ্ধ থেকে এটাই আমার সমাহৃত গূঢ় সমাচার।

এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা হয়েছিল। তারা তাদের মুরুব্বিদের ধরে (আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি) অনেক চেষ্টা করেছিল ভারত যাতে দ্রুত অস্ত্র সংবরণ করে। যার ফলে শেষমেশ তখনকার সোভিয়েট রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে উজবেকিস্তানের রাজধানীতে দু'দেশের মধ্যে 'তাশখন্দ চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যার মূল বয়ান ছিল দু'দেশ তাদের সেনাবাহিনীকে যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। যুদ্ধোত্তরকালে ভারত সরকার কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মির এই জয়ধ্বজা উড়াতে মোটেই রাজি ছিল না, যা একটা বড় হেঁয়ালি হয়ে রইল। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য বেশ ধুমধাম করে ১৯৬৫-র যুদ্ধে ভারতের বিজয় লাভের পঞ্চাশ বছর পূর্তি পালন করল।

১৯৬২-র চীনের সঙ্গে যুদ্ধ আর ১৯৬৫-র পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের যে তফাৎটা আমার নজরে এসেছিল তা হ'ল ১৯৬৫-র যুদ্ধে ইন্ডিয়ান আর্মির সাপোর্ট ফোর্স হিসেবে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের ব্যাপক অংশগ্রহণ। তখনকার কাগজে প্রকাশিত ছবি থেকে মনে হয়েছিল সেসময় ভারতীয় বিমান বাহিনীর অধিনায়ক এয়ার মার্শাল অর্জন সিং জেনারেল জে এন চৌধুরীর মুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। পাকিস্তান বরাবরের মতো সেসময়ও আমেরিকার ঘোর লেজুড় ছিল, তার ওপর চীনকেও ভারত বিরোধিতার খাতিরে খুবই ইচ্ছুক দোসর পেয়েছিল। লেজুড় হিসেবে পাকিস্তান আমেরিকা সৃষ্ট মিলিটারি জোট CENTO এবং SEATO-র সদস্য ছিল এবং পুরস্কার হিসেবে আমেরিকা পাকিস্তানকে সব অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান (যথা এফ-৮৬ স্যাবোর জেট, স্টার ফাইটার, বি-৫৭ বোমারু বিমান ইত্যাদি), ট্যাংকসহ (প্যাটন) গন্ডা গন্ডা মারণাস্ত্র জুগিয়েছিল। বিমান বহরের শক্তি হিসেবে ভারতের চেয়ে এগিয়ে ছিল পাকিস্তান। ভারতের কাছে সুপারসনিক বিমান তো ছিলই না, যা ছিল সেসব মান্ধাতা আমলের বিমান – ভ্যাম্পায়ার, হান্টার, মিস্টেয়ার, ইত্যাদি এবং দেশজ ন্যাট ফাইটার ও ক্যানবেরা বমার। যুদ্ধের শুরুতে কাশ্মীরে আখনুর অঞ্চলে পাকিস্তান আর্মির বিরাট একটা ফৌজ মোতায়েন ছিল। জেনারেল চৌধুরী ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সকে বললেন তাদের ওপর বোম ফেলতে। ফলে সেখানে পাকিস্তান আর্মির অগ্রগতি থামিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স যুদ্ধে যোগদান করতেই পাকিস্তান এয়ারফোর্সও ভারতের গোটা পঁয়ত্রিশ বিমান ধ্বংস করে দিয়ে গেল। খড়্গপুরের কাছে কলাইকুন্ডা এয়ার বেসে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় অনেকগুলো বিমান পাকিস্তান এয়ারফোর্সের আক্রমণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এর ভেতরেই ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স তাদের সীমিত ক্ষমতার যথোচিত প্রয়োগ করে বেশকিছু পাকিস্তানি বিমানকে আকাশ যুদ্ধে (dog fight) ঘায়েল করে দিল আর বেশ কিছুকে বিমান বিধ্বংসী গোলায় (anti-aircraft fire) ভূপতিত করল।

তখন ইন্ডিয়ার নিজস্ব ন্যাট ফাইটার আকাশ যুদ্ধে খুব নাম কিনেছিল এবং দুজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভাই (Keelor brothers) ন্যাট বিমান থেকে মিসাইল চালিয়ে বেশকিছু স্যাবোর জেট মাটিতে ফেলেছিল।

এখানে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল – খড়্গপুর IIT-র আকাশে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের ও পাকিস্তান এয়ার-ফোর্সের যুদ্ধে পাকিস্তানের স্যাবোর জেট ভূপতিত হওয়া। এই ঘটনা ঘটার ৯ বছর পরে আমি যখন খড়্গপুর IIT-র কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্র, তখন সেখানকার এক সিনিয়র ছাত্র আমাকে বলেছিল কীভাবে পাকিস্তানের ভূপতিত স্যাবোর জেটটা থেকে IIT-র ছেলেরা বিভিন্ন স্যুভেনির সংগ্রহ করেছিল আর তা অচিরেই ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স ও পুলিস যৌথ অভিযান করে খুঁজে খুঁজে তাদের কাছ থেকে সেসব বার করে নিয়ে গিয়েছিল। IIT-র ছেলেরাই প্রথম ভূপতিত স্যাবোর জেটটার পাইলটের পার্সোনাল ডায়েরি খুঁজে পেয়েছিল এবং দারুণ স্যুভেনির হবে ভেবে তুলে রেখেছিল!

১৯৬৫-র যুদ্ধের সময় আমরা বাড়ির লোকেরা কলকাতা তথা ইস্টার্ন ফ্রন্ট সংলগ্ন এলাকায় ছিলাম, আর আমার বড়দা ছিলেন ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট সংলগ্ন এলাকায় পাঞ্জাবে পাঠানকোটের ২৫-২৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে ইরাবতী নদীর (ইংরেজিতে বলে Ravi) তীরে মাধোপুর গ্রামে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে বড়দা কলকাতায় ফিরে সেখানে ঘটে যাওয়া অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি কলকাতার প্রথম সারির কনস্ট্রাকশন কনগ্লোমারেট বি.বি.জে (ব্রেথওয়েট বার্ন জেশপ) কনস্ট্রাকশন কম্পানির সিভিল এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। যুদ্ধ শুরুর অনেক আগেই তারা তাঁকে ইরাবতী নদীর ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রথম রেল ব্রিজ নির্মাণের অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে মাধোপুরে পোস্টিং দিয়েছিল। এই ব্রিজটি পাঞ্জাবের তথা বাকি দেশের সঙ্গে জম্মুর প্রথম এবং একমাত্র যোগাযোগ রক্ষাকারী রেল ব্রিজ হিসেবে তৈরি হচ্ছিল। রেল ব্রিজটি যখন নির্মীয়মাণ সেই সময়ই যুদ্ধ লেগে গেল। মাধোপুর গ্রামটা পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত থেকে ১৫-২০ কিলোমিটার দূরে, সরাসরি রণাঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। তাই ব্ল্যাক আউট, কারফিউ, আর্মি ও আর্টিলারি মুভমেন্ট নিত্যকার ব্যাপার হয়ে উঠল। ইন্ডিয়ান আর্মি বড়দারও সাহায্য নিল নিকটবর্তী রেল প্ল্যাটফর্মকে তাদের যুদ্ধ সামগ্রী ও সরঞ্জাম নামানোর জন্য রিডিজাইন করে সুবিধাজনকভাবে বাড়িয়ে নিতে। বড়দার বলা সে সময়কার বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে আমার যেটা খুব অভিনব এবং দর্শনীয় বলে মনে হয়েছিল তা হ'ল – ব্রিজ নির্মাণহেতু ইরাবতী নদীর উজানে (upstream) বাঁধ দিয়ে রুদ্ধ জলস্রোত একরাতে ছেড়ে দিয়ে নদী দিয়ে পরিপূর্ণ জলস্রোত বইয়ে দেওয়া। বড়দা বলেছিলেন, "একদিন সকালে উঠে দেখি নদীতে ভর্তি জল।" পরবর্তীতে আমরা জানি এটা জেনারেল চৌধুরীর একটা মাস্টারস্ট্রোক ছিল। ইরাবতী নদীর রুদ্ধ জলস্রোতকে মূল নদী ও সেচের খাল সমূহ দিয়ে বইয়ে দেওয়ার ঠিক আগে পাকিস্তান ট্যাংক বাহিনীকে বিভ্রান্ত করে (foxing and misleading) ভারতীয় ভূমিতে একটা বিস্তীর্ণ ফাঁকা ক্ষেতের মধ্যে ঢুকিয়ে আনা হয়েছিল এবং তারা ভালোমতো ঢুকে এলে ইরাবতী নদীর উজানে বাঁধ বেঁধে রুদ্ধ জলস্রোত ছেড়ে নদী দিয়ে পরিপূর্ণ জলস্রোত বইয়ে সেই ক্ষেতে বেশি করে জল সেচ করে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে সমস্ত পাকিস্তানি ট্যাংক ওখানে কাদামাটির মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। এই জায়গাটাই ছিল খেমকারান, যার ছবির ক্যাপশনে 'দ্য ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া' লিখেছিল – 'গ্রেভ ইয়ার্ড অফ প্যাটন ট্যাংকস'। এ ব্যাপারে সাংবাদিক আর কেরালা থেকে প্রকাশিত নামকরা ইংরেজি সাপ্তাহিক 'দ্য উইক'-এর সাম্প্রতিক এক সংখ্যায় (২৩শে অগাস্ট, ২০১৫) বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

১৯৬৫-র যুদ্ধে ভারতের অধিনায়ক জেনারেল জে এন চৌধুরী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তথা অধিনায়ক জেনারেল আয়ুব খান দুজনেরই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা ছিল ইংল্যান্ডের বিশ্ববিখ্যাত স্যান্ডহার্স্ট মিলিটারি অ্যাকাডেমি থেকে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার মুখেই কলকাতার বনেদি ইংরেজি সংবাদপত্র 'দ্য স্টেটসম্যান' ভারত পাকিস্তানের মিলিটারি শক্তির তুলনামূলক এক বিশ্লেষণে কৌতুক করে লিখেছিল, "এই যুদ্ধের শেষে দেখা যাবে কোনজন স্যান্ডহার্স্ট মিলিটারি অ্যাকাডেমি থেকে বেশি শিখেছেন।" ইতিহাস ঠিক জনকেই বেছে নিয়েছে।

১৯৬২-তে চীনের কাছে ল্যাজে গোবরে হবার পর ১৯৬৫-র যুদ্ধের দর্শনীয় বিজয় আমাদের মনে এই ধারণার বীজ বপন করে গেল যে আমরাও পারি। তবে তার জন্য জেনারেল

জে এন চৌধুরীর মতো অধিনায়কও চাই।

১৯৭১-এর যুদ্ধ – বাংলাদেশের অভ্যুদয়:

প্রতিপক্ষ: পাকিস্তান, রণভূমি: ভারত এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত:

১৯৭১-এ পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের আগে পূর্ব পাকিস্তানে (যা এখন বাংলাদেশ) দারুণ রাজনৈতিক গোলযোগ চলছিল। তখন সারা পাকিস্তানে সবে ভোট হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তাঁর পার্টি, আওয়ামী লীগ এত বিপুল জনমত লাভ করেছিল যে গণতন্ত্রের হিসাব অনুযায়ী সম্পূর্ণ পাকিস্তান সরকার চালানোর ক্ষমতায় এসে গিয়েছিল, যেটা পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা যথা, জুলফিকার আলি ভূট্টো এবং আরো অনেকে হতে দিতে নারাজ ছিলেন। তখন বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি প্রতিদিন আরো বজ্রগর্ভ হয়ে উঠছিল। এমন অবস্থায় যুদ্ধ লেগে গেল।

এই যুদ্ধ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। বহু বইপত্র বেরিয়েছে এবং এখনো বেরিয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান আর্মির সহায়তায় স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল। সরল দৃষ্টিতে ঘটনাটা এরকম হলেও জটিল দৃষ্টিতে এর মধ্যে নানান সমীকরণ ও মেরুকরণ ছিল, যার মধ্যে বিশ্বের বড় বড় দেশগুলি (super powers) জড়িত ছিল। সব মিলিয়ে ঘটনাটা যা ঘটেছিল তা হ'ল ইন্ডিয়ান আর্মি পূর্ব পাকিস্তানে স্থিত পাকিস্তান আর্মির সমস্ত সৈন্যদের (৯৩০০০) বন্দি করেছিল আর বাংলাদেশটিকে সে দেশের নেতৃত্বের হাতে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু এর জন্য ইন্ডিয়ান আর্মিকে শত্রুপক্ষ পাকিস্তান আর্মিকে পরাস্ত করতে হয়েছিল যার ফলে পূর্ব এবং পশ্চিম দুই ফ্রন্টেই ভারতকে বিপুল আয়োজনে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। যেহেতু পূর্ব ফ্রন্টে বাংলাদেশের উদয়ের মতো একটা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছিল, তাই পূর্বপ্রান্তে বিপুলতর সমরের আয়োজন জরুরি ছিল এবং কলকাতা প্রত্যক্ষভাবে সমরাঙ্গনের অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছিল।

আমার সে সময়ের যেসব স্মৃতি রয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে থাকবে ধর্মতলা এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে রাত্রিবেলা ব্ল্যাক আউটের মিশকালো অন্ধকারের ভেতর সঞ্জয়দার (রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটির সাথে যুক্ত আমার বড়মাসির ছেলে) সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখা কতটা ব্ল্যাক আউট হয়েছে। মেট্রো সিনেমার পাশের গলিতে যেসব রেস্ট্যুরান্ট রয়েছে, সন্ধ্যে হতেই যাদের ইলেকট্রিক সজ্জা প্রখর হয়ে ওঠে, তাদের তখন বাইরে থেকে মনে হতো ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে, এমনই নিষ্প্রভ ছিল তখন। কোনো আলোকসজ্জা তো নেই-ই, প্রাণ স্পন্দনও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু সন্তর্পণে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেই যে কে সেই! কোথায় যুদ্ধকালীন উদ্বেগ! হাজার মৌমাছির ভনভনানিতে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়! অনেক হৈচৈ, নরক গুলজার! কিন্তু টিভিতে লাগাতার নিউজ চ্যানেল চলছে। এইরকম এক সন্ধ্যেতে গ্লোব সিনেমা হলে একটা সিনেমা (খুব সম্ভবতঃ মিকেল অ্যাঞ্জেলো অ্যান্তনিওনির বিতর্কিত ফিল্ম 'জ্যাব্রিস্কি পয়েন্ট') দেখতে দেখতে হঠাৎ সিনেমা বন্ধ হয়ে গিয়ে একটা হাতে লেখা স্লাইড দেখা গেল – Jessore has fallen to Indian Army (ইন্ডিয়ান আর্মি যশোর দখল করে নিল)।

এই যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের ত্রাণ বিতরণের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে নানারকম উপহার আসতে শুরু হ'ল; যার মধ্যে কম্বল, বেবিফুড, ওষুধ, জামাকাপড় ছাড়াও ট্রাকের মতো ওজনদার জিনিসও ছিল। পার্ক স্ট্রিট ও চৌরঙ্গীর সংযোগস্থলে গান্ধীমূর্তির (মূর্তিটি তখন অবধি সেখানেই ছিল) সামনে জাপান থেকে পাওয়া অন্ততঃ তিরিশটা ইসুজু ট্রাক রাখা ছিল দীর্ঘদিন। কলকাতায় ইসুজু ট্রাক সেই প্রথম। ঐ অঞ্চল দিয়ে গেলেই তাদের অন্যরকম গঠন নজরে আসত।

রাতারাতি শহরে লোকজন বেড়ে গিয়ে গিজগিজ করছিল। আকাশে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের প্লেন মুহুর্মুহু আনাগোনা করছিল। এসময়ে আমার ছোটভাই, পার্থ বাড়ির ছাদ থেকে একসঙ্গে অন্ততঃ ৩০-৪০টা প্লেন যেতে দেখেছিল। পার্থ এখনো বলে সেই অদ্ভুত দৃশ্যের কথা – দক্ষিণ আকাশ থেকে উত্তর আকাশের দিকে ধাবমান ফরমেশন। পূর্ব আকাশ থেকে পশ্চিম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত প্লেনের বহর। পরবর্তী ঘটনাসমূহ মিলিয়ে এখন মনে হয় পার্থর বর্ণিত প্লেনগুলো প্যারাট্রুপার বহনকারী প্লেন ছিল। ১৯৭১-এর যুদ্ধে পূর্ব রণাঙ্গনে প্যারাট্রুপারদের ব্যাপক ব্যবহার হয়েছিল। যুদ্ধ চলাকালে তখনকার আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নিক্সন ঘোষণা করলেন তিনি প্রশান্ত মহাসাগরে থানা গেড়ে থাকা সপ্তম নৌবহরকে

বঙ্গোপসাগরে পৌঁছাতে বলেছেন | সেইমতো সপ্তম নৌবহর চলতে শুরু করে দিল |

তখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছিলেন, "কুছ পরোয়া নেহি, আমরা ওতে শঙ্কিত নই |" আমি ভেবেছিলাম হয়তো বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহরের আগমনে এবার আমাদের নৌবাহিনী ইন্ডিয়ান নেভিও আসরে অবতীর্ণ হবে | কিন্তু সে রকম কিছু হ'ল না | এখন বোঝা যায় আমেরিকা সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে পাঠিয়ে ইন্ডিয়াকে খানিকটা ভড়কে দিতে চেয়েছিল এবং একই সঙ্গে লেজুড় দেশ পাকিস্তানকে দেখাতে চেয়েছিল তাদের সাপোর্ট করতে ইন্ডিয়াতে আমেরিকান নৌসেনা পাঠানো হ'ল | তবে ইন্ডিয়ান নেভি আসরে অবতীর্ণ হ'ল না বলে আমি খানিকটা নিরুৎসাহই হয়েছিলাম; এই জন্যে যে ইন্ডিয়ান নেভি অংশ নিলে যুদ্ধ একটা নতুন মাত্রা পেত | তাহলে আমরা জানতে পারতাম নেভি কেমন করে যুদ্ধ করে | কোনো দেশের নৌবাহিনী কেমন করে যুদ্ধ করে তা নিয়ে অবশ্য Sergei M. Eisenstein-এর সেই অসাধারণ রাশিয়ান মুভি 'Battleship Potemkin' আমার একাধিকবার দেখা ছিল | এ পর্যন্ত কলকাতা যে যুদ্ধাঞ্চলের (war zone) অঙ্গীভূত সেখানে ইন্ডিয়ান আর্মি ও ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স প্রতিবারই দৃশ্যতঃ অংশ নিলেও কোনকালেই ভারতের তৃতীয় বহরটি অর্থাৎ ইন্ডিয়ান নেভি অংশ নেয়নি | এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেইসব অঞ্চলে সুসমঞ্জস হবে এমন বাহিনীই নজরে আসে, যথা সমুদ্রতটবর্তী মুম্বাই, কোচি, ভাইজ্যাগ, চেন্নাই, ভাস্কো, ম্যাঙ্গালোর প্রভৃতি শহরে ইন্ডিয়ান নেভির উপস্থিতি প্রকট | 'ইন্ডিয়ান নেভি' লেখা গাড়িঘোড়া, ধবধবে সাদা ইউনিফর্মে নাবিকরা এইসব শহরে স্পষ্টভাবে দেখা যায় | কিন্তু উত্তর ও পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ বড় বড় নদীধৌত সমতলভূমি (পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, আসাম) বা মধ্য ভারতের (মধ্য প্রদেশ, ছতিশগড়) মালভূমি অঞ্চল (plateau), যা সমুদ্রতট থেকে বহুদূরে অবস্থিত | তাই স্বাভাবিক কারণেই এই অঞ্চলগুলো ইন্ডিয়ান নেভির ধাত্রীভূমি নয় | এসব জায়গাতে ইন্ডিয়ান আর্মি ও এয়ারফোর্সের উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই | আর হয়তো কোনদিনই ইন্ডিয়ান নেভির যুদ্ধ করা দেখা হবে না ভেবে মন কখনো খিন্ন হয়েছে |

১৯৭১-এর যুদ্ধের তুমুল বিবরণ সারাক্ষণই প্রায় রেডিওতে প্রচার হতো | আমি সেসময় একটা অল ওয়েভ রেডিওতে সেই সব খবর শুনতাম | আকাশবাণী, বিবিসি, ভয়েস অফ আমেরিকা, ডয়চে ওয়ালে, রেডিও মস্কো, রেডিও পিকিং, ইত্যাদির সাথে রেডিও বাংলাদেশ নতুন করে শুরু হয়েছিল | রেডিও পাকিস্তানের বাংলা খবর শোনা যেত না – কথাবার্তা থাকত এমন অশ্লীল |

এই যুদ্ধে কলকাতায় সরাসরি শত্রুপক্ষের গোলাগুলি বা বোমা পড়েনি ঠিকই কিন্তু আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী অঞ্চল-গুলোতে (যেমন বালুরঘাট, মেখলিগঞ্জ) অবিরাম তা ঘটে চলেছিল | বিশেষতঃ এয়ার বেস আছে এমন অঞ্চলে প্রায়ই আকাশে শত্রু বিমানের উপস্থিতি ঘটত, যার মোকাবিলা করতে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের বিমানগুলি সেগুলিকে আকাশ যুদ্ধে ব্যাপৃত করত বা ধাওয়া করত এবং ভূমি থেকে বিমান বিধ্বংসী গোলা নিক্ষেপ করত | কখনো রাত্রিবেলায় বিমান হানা হলে শত্রু বিমান চিহ্নিত করার জন্যে রাতের অন্ধকার আকাশ আলো করে দিতে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স 'ফ্লেয়ার' ছুঁড়ত |

তখন আমি যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পড়ি | ইউনিভার্সিটির মেন হস্টেলে থাকতাম | আমার রুমমেট দেবাশিস গোস্বামীর বাড়ি নর্থ বেঙ্গলে হাসিমারা এয়ার বেসের খুব কাছে ছিল | সে এইসব অনেক দেখেছে | হাসিমারা এয়ার বেস মিগ-২১ বিমানের আড্ডা ছিল | আমি একবার দেবাশিসদের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে দেখেছি মিগ-২১ বিমানগুলো মহড়া দেওয়ার সময় এত নিচ দিয়ে উড়ে যেত মনে হতো এই বুঝি উঁচু উঁচু গাছগুলোতে লেগে গেল | মাঝে মধ্যেই তাদের গতি বাড়িয়ে সুপার সনিক রেঞ্জে নিয়ে গেলেই সনিক বুম আওয়াজ শোনা যেত | এ জিনিস আমি পরবর্তীতে খড়্গপুর IIT-তে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করার সময়ও দেখেছি |

সুতরাং বলা যায় যে ১৯৭১ সাল অবধি ভারত যতবার যুদ্ধ করেছে ততবারই কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ যুদ্ধের প্রত্যক্ষ আঁচ অনুভব করেছে | আমি এসবের মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠতে উঠতে দেখেছি যুদ্ধের দিনগুলি শিক্ষণীয় অনেক জিনিস এনে হাজির করে, যা কঠিন সময়ে মোকাবিলা করার কৌশল শিখিয়ে দেয় এবং সুচারুরূপে পরিণত হয়ে উঠতে সাহায্য করে | যুদ্ধের সময় যে কেমন সেটা যারা দেখেনি, তারা এসব থেকে বঞ্চিত |

যুদ্ধের দিনগুলি: নাগপুরে:

১৯৭৮-এর অক্টোবর থেকে আমি নাগপুরে রয়েছি | নাগপুর প্রকৃত war zone থেকে অনেক দূরে | এখানে বিভিন্ন সেনা-বাহিনীর মুভমেন্ট এবং তাদের সঙ্গে দেশরক্ষার জটিল যন্ত্রপাতির সমারোহ একেবারেই দেখা যায় না | নাগপুরে সাঁইত্রিশ বছরকালে আমি দুবার যুদ্ধের হাওয়া সামান্য অনুভব করেছি | এই দুবারই ইরাক যুদ্ধসংক্রান্ত | প্রথমবার ১৯৯১ সালে যখন চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী তখন ফিলিপাইন্সের ক্লার্ক এয়ার বেস থেকে উড়ে গিয়ে ইরাক যুদ্ধে অংশ নিতে কুয়েত গমনরত ইউ এস এয়ারফোর্সের কয়েকটা প্লেন রিফুয়েলিং করতে নাগপুর এয়ারপোর্টে নেমেছিল | সে নিয়ে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল কাগজওয়ালাদের মধ্যে | একদিন সকালে খবরের কাগজে দেখা গেল বড় করে রিপোর্ট – "American Plane Stops At Nagpur For Refueling", সঙ্গে দূর থেকে তোলা একটা ছবি, যাতে দাঁড়িয়ে থাকা প্লেনের পিঠ একটুখানি দেখা যাচ্ছে | রিপোর্টে লেখা ছিল, 'কোনো অফিসিয়ালকে জিজ্ঞেস করে কিছু জানা যায়নি, অথচ আমাদের ফটোগ্রাফার যে ছবি তুলেছে তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সত্যিই আমেরিকান প্লেন নেমেছে |' ২০০৩ সালে দ্বিতীয়বার যখন ইরাক যুদ্ধ হ'ল তখন আবার প্রায় একই ব্যাপার ঘটল | কেবল এবার বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ প্লেন নামার কথা অস্বীকার করেনি |

ইরাক যুদ্ধ নিয়ে আমার ছোটবোন অরুণিমা দাশগুপ্ত একটা বর্ণনা দিয়েছে | অরুণিমা দিল্লি পাবলিক স্কুলে দীর্ঘদিন উঁচু ক্লাসের অঙ্ক টিচার ছিল | ও দিল্লি পাবলিক স্কুল – কুয়েতের ম্যাথমেটিক্সের ডিপার্টমেন্ট হেড ছিল ৯ বছর | ২০০৩ সালে ওর স্কুলের সামনে দিয়ে আমেরিকান সৈন্যদের ইরাকে যাবার রাস্তা ছিল | যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সেখান দিয়ে অনবরত আমেরিকান সৈন্যদের কনভয় যেত | অরুণিমা জানাল ও দেখেছে আমেরিকান কনভয়ের অনেকগুলোরই মেয়ে ট্রাক-ড্রাইভার ছিল |



সূত্র:-

১) নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য, বরুণ সেনগুপ্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬

২) 'আমরা কি আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছি?' বর্তমান, ৮ই অক্টোবর, ২০১৪ (এই প্রবন্ধে প্রাক্তন বিচারপতি ভগবতী প্রসাদ বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন, "চৌ এন লাই যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন সঙ্গে ছিল সাংস্কৃতিক দূতদের এক বিশাল বাহিনী | কলকাতায় তাঁর দেহরক্ষীদের প্রধান ছিলেন কলকাতা পুলিসের এক তরুণ অফিসার, সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়, যিনি পাঁচ ঘাটি বিষয়ে এমএ হওয়ার পাশাপাশি অনেক ভাষাও শিখেছিলেন | চীনে ভাষায় ডিপ্লোমাও ছিল | তিনি ওদের কথাবার্তায় বুঝে ফেললেন ঐ সাংস্কৃতিক দূতরা আসলে চীনে সেনাবাহিনীর পদস্থ অফিসার, আর চৌ এন লাইয়ের ভারতে আসার কারণ আক্রমণের পরিকল্পনা সফল করা | তিনি এ নিয়ে ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহরুকে এক চিঠি লিখেছিলেন যার উত্তরে দুমাস বাদে পিএমও তাঁকে লিখল – পিএম চিঠি পেয়েছেন কিন্তু এসব কথা বিশ্বাস করেন না | এর কিছুদিন পরে চীন ভারত আক্রমণ করে ও বমডিলা অবধি ঢুকে পড়ে | তখন প্রধান মন্ত্রীর টনক নড়ে | মধ্যরাতে মনে পড়ে এ বিষয়ে কলকাতা পুলিসের এক নিম্নপদস্থ অফিসার তাঁকে চিঠি দিয়ে সতর্ক করেছিলেন | তিনি সেক্রেটারিকে ফোন করে বললেন সকাল ৮টার মধ্যে ঐ চিঠি তাঁর চাই-ই চাই | ঐ চিঠি পেয়ে বাসভবনে জরুরী ক্যাবিনেট বৈঠক ডাকলেন নেহরু | সবাইকে বললেন এই দেখো আমাকে সতর্ক করেছিল | আমি উপেক্ষা করে মস্ত ভুল করেছিলাম | আমাদের এত পুলিস, এত গোয়েন্দা কী করছিল? আমি এই অফিসারকে দেশের গোয়েন্দা বিভাগের সর্বোচ্চ পদে নিয়োগ করতে চাই |... কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দিল্লি থেকে অফিসাররা এসে সমস্ত নিয়মকানুন মিটিয়ে তাঁকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেলেন | সকলকে বলে দেওয়া হ'ল সে যা বলবে সেইমতো কাজ করতে হবে |... তাঁর কৌশলের ঠ্যালায় চীন পিছু হটতে শুরু করে |")

৩) ১৯৬৫-র যুদ্ধের সময় পশ্চিম রণক্ষেত্রে কীরকম পরিস্থিতি ছিল তা আমার বড়দা, অলক মোহন ঘোষের কাছে সম্প্রতি আবার জেনে নিলাম |

৪) ১৯৬৫-র যুদ্ধে ইন্ডিয়ান আর্মির অভূতপূর্ব সাফল্য দেশবাসীকে কীরকম উদ্বেল করেছিল তার এক প্রমাণ – আমার স্কুল, বরানগর নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দিরে সেবছর এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হ'ল; যাতে আমাদের ক্র্যাফট ও সঙ্গীত শিক্ষক বিনয়বাবুর স্বরচিত দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে সারা ব্ল্যাক বোর্ড জুড়ে চক দিয়ে ইউনিফর্ম পরা, বেয়নেট লাগানো রাইফেল কাঁধে সৈন্যের ছবি আঁকতে হবে সাত মিনিটের মধ্যে | ক্লাস সিক্স থেকে টেন অবধি ছেলেরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে | এইসব ক্লাস থেকে একজন করে প্রতিযোগী বাছাই করতে হবে তারপর ফাইনাল প্রতিযোগিতা হবে সেই বাছাই করা ৫ জনের মধ্যে | বিনয়বাবু রচিত গানের প্রথম লাইন ছিল, "চলো চলো হে মুক্তি সেনানী |"

৫) IAF to celebrate 50 years of dogfight over IIT-Kgp soon, Times of India, Kolkata edn., 23 Aug, 2015.

৬) IAF takes a candid look at the 1965 war, Times of India, Kolkata edn., 23 Aug, 2015.

৭) Enemies and Stalemate, The Week, Kochi, 23 Aug, 2015.

সময়ের স্রোতে বিপাশা

আশীষ দত্ত রায়

হিমালয় পর্বতের বুক চিরে বয়ে যাওয়া এক জলধারার নাম বিপাশা, একটি জীবন্ত ইতিহাস, একটি প্রাচীন স্মৃতির ভাণ্ডার। নদীর শরীরে মিশে আছে সভ্যতার পদচিহ্ন, মানুষের হাসি-কান্না, আধ্যাত্মিক সাধকের ধ্যান, সাধনা, কবির কল্পনা আর অগণিত অজানা মানুষের জীবনগাঁথা।

রাঢ় বাংলার কোপাইয়ের হাঁসুলী বাঁক যেমন এক হারিয়ে যাওয়া উপকথার দেশ, তেমনি হিমালয়ের কোলে বয়ে চলা বিপাশা আমার কাছে এক জীবন্ত মহাকাব্য। একটি লালমাটির শান্ত প্রকৃতির মধ্যে সময়ের গল্প বলে, অন্যটি হিমালয়ের কঠিন পাথর ভেঙে নেমে এসে তার অদম্য প্রাণশক্তির পরিচয় দেয়। আজ এই দুই নদীর দিকে তাকালে মনে হয়, তাদের নিয়তি কোথাও যেন একই সুতোয় বাঁধা। দুজনেই মানুষের সভ্যতার জন্ম দেখেছে, মানুষের ভালোবাসা পেয়েছে, আবার বিত্তলোভী স্বার্থান্বেষী মানুষের অদূরদর্শিতার আঘাতও সহ্য করে চলেছে।

বিপাশার তীরে আমার বসবাস খুব দীর্ঘ নয়। তবু অল্প সময়েই এই নদী আমাকে বড় আপন করে নিয়েছে। ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি তার কত রূপ। কখনও সে শান্ত, ধ্যানমগ্ন তপস্বিনীর মতো পাহাড়ের কোলে নীরবে বয়ে যায়। কখনও আবার পাথরের স্তূপ ভেঙে ফেনিল উচ্ছ্বাসে গর্জে ওঠে। কোথাও তার দুই তীর ঘন সবুজে ঢাকা, কোথাও আপেল, নাশপাতি, আখরোট ও নানা ফলের গাছ তারই স্নেহে গড়ে তুলেছে অপরূপ বাগিচা। বসন্তে পাহাড়ি উপত্যকাগুলি যখন নানা ফুলের রঙে সেজে ওঠে, তখন বিপাশার ধারাতেও যেন নতুন জীবনের গান শোনা যায়। শরতে ফলের ভারে নুয়ে পড়া গাছগুলি নদীর কাছে কৃতজ্ঞতার প্রণাম জানায়। ভোরের আলোয় বিপাশা এক শান্ত সাধিকার মতো। আর গভীর রাতে যখন পৃথিবী নিস্তব্ধ হয়ে যায়, তখন তার গুরুগম্ভীর স্রোতের শব্দ শুনলে মনে হয় কোনো প্রাচীন ঋষি অনন্তকাল ধরে মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছেন।

এই নদীর নামের মধ্যেও লুকিয়ে আছে এক অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা। বিপাশা শব্দের অর্থ যে বন্ধন ছিন্ন করে, যে মুক্ত করে নানা মানব বৃত্তির পাশ। যেন তার নামের মধ্যেই রয়েছে মুক্তির এক চিরন্তন আহ্বান। লোককথা বলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ গভীর পুত্রশোকে ব্যাকুল হয়ে নিজের জীবন বিসর্জনের উদ্দেশ্যে নানা লতা-গুল্মে নিজেকে বেঁধে এই নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কিন্তু নদী তাঁর বন্ধন খুলে দিয়ে তাঁকে আবার জীবনের তীরে ফিরিয়ে আনে। সেই পাশ বন্ধন মুক্তির স্মৃতি থেকেই নাকি তার নাম হয় বিপাশা।

ইতিহাসের অন্য ধারায় এই নদী বিয়াস নামেও পরিচিত। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, ব্যাসের স্মৃতির সঙ্গে এই নামের যোগ রয়েছে। ইতিহাসের বহু ব্যাসের মধ্যে এক ব্যাসদেবের তপস্যা, জ্ঞানচর্চা ও আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে এই অঞ্চলের কিছু লোককথা জড়িয়ে আছে। তাই বিপাশা বা বিয়াস হয়ে উঠেছে সংস্কৃতির এক প্রাচীন স্মৃতিবাহী ধারা।

যুগের পর যুগ ধরে এই নদীর দুই তীরে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ছোট ছোট গ্রাম। নদীর জল, পাথর, মাটি ও বনভূমিকে ঘিরেই স্থানীয় মানুষের জীবন তৈরি হয়েছে। কেউ কৃষিকাজ করেছে, কেউ ফলের বাগান করেছে, কেউ পশুপালন ও ছোট ব্যবসার মাধ্যমেও জীবন নির্বাহ করেছে। তাদের লোকগানে, লোকনৃত্য-শৈলীতে, লোকউৎসবে, লোকসংস্কৃতিতে, সামাজিক রীতিতে, অর্থনৈতিক লেনদেনে, লোকবিশ্বাসে ও গ্রামদেবতার আরাধনার মধ্যে এই বিপাশারই ছায়া জড়িয়ে রয়েছে আষ্টেপৃষ্টে।

এই নদীর তীরে মানুষ যুগ যুগ ধরে গড়ে তুলেছে তাদের বসতি, গড়ে তুলেছে তাদের ধর্মবিশ্বাস, সাধনা ও চিন্তা বোধের অধিক্ষেত্রও। বহু আধ্যাত্মিক সাধক, দার্শনিক গবেষক ও জ্ঞানসন্ধানী মানুষ এই অঞ্চলের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে বাস করে নিজেদের অন্বেষণের পথ খুঁজে পেয়েছেন। তাঁদের স্মৃতিকে ধরে রাখতে কোথাও মন্দির, কোথাও গ্রামের নাম, আবার কোথাও লোককথার ভিতরে আজও বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে তাঁদের পুণ্য উপস্থিতি।

কিন্তু সময়ের স্রোত সবসময় মঙ্গল বয়ে আনে না। গত কয়েক দশকে উন্নয়নের নামে বিপাশার দুই তীরেও শুরু হয়েছে এক অস্থির ও নেতিবাচক পরিবর্তন। পাহাড় কেটে, স্থানীয় কিছু মানুষের চরম লোভে মূল্যবান কাঠের বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নদীর দুপাড়ের প্রাচীন বড় বড় গাছ ও জঙ্গল নির্মমভাবে সাফ করে

দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছেও | ফলে মাটির স্বাভাবিক বাঁধন যাচ্ছে আলগা হয়ে | অন্যদিকে নদীর স্বাভাবিক শ্বাসরোধ করে দুপাড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠছে অপরিকল্পিত কংক্রিটের সারি | লোভী ব্যবসায়ী ও স্থানীয় স্বার্থান্বেষী মহলের তৈরি হোটেল, রেস্তোরাঁ ও কার পার্কিংয়ের বেনিয়ম বিস্তার নদীর আদিম সৌন্দর্যকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে |

যে গাছগুলি একসময় পাহাড়ের মাটি আঁকড়ে ধরে রেখে নদীর প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করত, সেগুলি হারিয়ে যাওয়ায় ভূমিধস বাড়ছে | চরম অসচেতনতায় সমতলের পর্যটকদের ফেলে যাওয়া প্লাস্টিকসহ নানা আবর্জনা ও বর্জ্য, নদীপাড়ের হোটেল, রেস্তোরাঁগুলির দূষিত অবশেষের বোঝা সরাসরি গিয়ে পড়ছে নদীর নির্মল গর্ভে | মনে হয়, যে নদী যুগ যুগ ধরে মানুষকে অমৃতধারায় বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই নদীকেই মানুষ আজ নিজের অনিয়ন্ত্রিত লোভের বশে ক্লান্ত ও কলুষিত করে তুলছে?

তবে বিপাশা সবসময় নীরব ও সহনশীল থাকে না | কখনও কখনও তার উন্মত্ত স্রোতে সে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে নিজের আদিম শক্তির কথা মনে করিয়ে দেয় | তখন মানুষের তৈরি জাগতিক অহংকার, নদীর পথ আটকে রাখা অবৈধ নির্মাণ ও প্রকৃতির নিয়ম অমান্য করা সমস্ত আধুনিকতা তার সামনে খড়কুটোর মতো অসহায় হয়ে পড়ে | মনে হয়, এই ভয়াবহ ধ্বংসের চপেটাঘাত দিয়েই নদী ও প্রকৃতি তার নিজের হারিয়ে যাওয়া ভারসাম্য পুনরায় ফিরিয়ে নিতে চায় |

তবু সব আশা শেষ হয়ে যায়নি | কোনো এক পড়ন্ত বিকেলে যখন দেখি কিছু আদর্শবাদী তরুণ-তরুণী নদীর তীর পরিষ্কার করার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছে, যখন দেখি কোনো নবীন হৃদয় বিপাশাকে পর্যটনের বাণিজ্যিক জায়গা না ভেবে, বরং এক জীবন্ত সত্তা হিসেবে ভালোবাসতে শিখছে, তখন মনে হয় মানুষের হৃদয়ের আলো ও মানবিকতা আজও নিভে যায়নি | প্রকৃতি প্রেম এখনও বেঁচে আছে |

কোনো সন্ধ্যায় নদীপাড় থেকে পাহাড়ি পথ ধরে ঘরে ফিরে আসার সময় দেখি চাঁদের আলোয় বিপাশার রুপোলি রেখা ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে | তখন মনে হয়, নদীকে আমরা দেখতে যাই, অথচ সত্যি বলতে নদীই আমাদের ভেতরটা দেখে নেয় | সে আমাদের সভ্যতা, আমাদের লোভ, আমাদের ভালোবাসা ও সমস্ত স্মৃতির নীরব সাক্ষী হয়ে বয়ে চলে |

বিপাশা এক প্রাচীন স্মৃতি, এক প্রবহমান ইতিহাস, এক পরম সাধিকা | তার স্রোতের মধ্যে আছে মুক্তির ডাক, তার পাথরের মধ্যে আছে বহু যুগের ধ্যান, আর তার ঢেউয়ের মধ্যে আছে মানুষের জীবনগাঁথা | ঘরে ফিরে আসার পরও মনে হয়, বিপাশার কাছ থেকে পুরোপুরি ফিরে আসা যায় না | সে মনের মণিকোঠায় বারবার ডেকে বলে যায় আবার আসতে | এই নদীর সঙ্গে সম্পর্ক শুধু চোখের দেখার নয়, হৃদয়ের অতল বন্ধনে বাঁধা পড়ে | আর যে নদী মানুষকে মুক্তির আসল অর্থ শেখায়, তাকে কখনও সত্যিই হারিয়ে ফেলা যায় না |

তবু এক গভীর প্রশ্ন মনের ভেতর চাবুক মারে | উন্নয়ন অবশ্যই প্রয়োজন, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিকাশও সত্য | কিন্তু সেই ছদ্মবেশী উন্নয়নের বিনিময়ে যদি চিরতরে হারিয়ে যায় নদীর প্রাচীন আত্মা, পাহাড়ের আদিম রূপ আর প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে চলা মানুষের চিরায়ত জীবনধারা, তবে সেই আত্মঘাতী উন্নয়নের আসল মূল্য কতখানি?
বিপাশা কি আজ সভ্যতার এই ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে আমাদের বিবেককে প্রতিনিয়ত সেই প্রশ্নই করে চলেছে?



The Beas River (known as Vipasha in ancient texts) in Himachal Pradesh

পরের পৃষ্ঠা

সুমিতা বসু

এখনো চারদিকে হালকা অন্ধকার – উত্তর আকাশের ছোট্ট তারাটি নিঃসঙ্গতার প্রতীক হয়ে টিপটিপ করে জ্বলছে। পুবে উষা আসতে আর বেশি দেরি নেই। সম্রাট শাহজাহানের তৈরি দিল্লির বিশাল লালকেল্লাটিও এখন যেন ওই একলা তারাটির মতো! কথাটা ভাবতেই বুকে একটা মোচড় দিল বাদশাহের। বাহাদুর



শাহ জাফর, বর্তমান মুঘল সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্যহীন সম্রাট। ভোররাতে পুবমুখী বারান্দার উঁচু কেদারায় বসে হাত বাড়িয়ে কালির দোয়াতে কলমটি ডুবিয়ে সারারাতের গুনগুন করা শায়েরিটা এখনই লিখে ফেলতে চান তিনি।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই হয়েছে; শায়েরিগুলো উড়ন্ত রঙিন ঝলমলে প্রজাপতির মতো মাথায় ঝিলিক দিয়েই হারিয়ে যায়। তক্ষুণি লিপিবদ্ধ না করলে আর ধরা দেবে না। একটা ফিকে হাসি খেলে গেল বাদশাহের ঠোঁটে, নয় নয় করে বয়স বিরাশি তো ছুঁলো, প্রকৃতির নিয়মে এটাই বুঝি স্বাভাবিক! প্রদীপের টিমটিমে আলোটাকে আরো কাছে টেনে এনে লিখতে শুরু করলেন। বাহ্, এই তো বেশ দাঁড়াচ্ছে –

আমি কী চেয়েছি
পেয়েছি বা কী
চাওয়া-পাওয়ার মাঝে
সেতু বাঁধিনি...

কাগজ ও কলমের খসখস আওয়াজে বারান্দায় শোওয়া খানসামাটির ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি চোখ রগড়ে উঠে বসে সে। অসময়ে বাদশাহকে নিমগ্ন হয়ে লিখতে দেখে নতজানু হয়ে বলে, "আমায় ডাকলেন না কেন জাঁহাপনা?" বাদশাহ হাসলেন। সেই স্মিতচোখে তাঁর পূর্বপুরুষের বিপুল শৌর্য, বীর্য বা দাম্ভিকতা নেই – বরং আছে ফকিরের ঔদাসীন্য, কবির সৃষ্টিসুখের গভীরতা। এখন সাম্রাজ্য তো না থাকারই মতো, তাই সম্রাটেরও অবস্থা প্রতীকী। তবু শরীরে তো বইছে বাবরের রক্ত। আকবর, শাহজাহান অনেক পূর্বপুরুষই স্বপ্নে দেখা দেন মাঝে মাঝে। দিনঘুম ঝেড়ে হাতে তরবারি তুলে নিতে বলেন। কিন্তু মন মানে না, বাহাদুর শাহ জাফরের হাত শুধু খোঁজে কলম, অস্ত্রের ঝনঝনানি ছাপিয়ে তালে ছন্দে ভেসে আসে কত সুফি গান, কত শায়েরি। লিখতে লিখতেই খানসামাকে বললেন, "আরে বেটা, কোই বাত নেহি... হম তো সির্ফ লিখ রহে হ্যাঁয়।" তারপর কলম নামিয়ে পুব আকাশের দিকে আঙুল তুলে বললেন, "আরে দেখো দেখো, সুরজ উঠ রহা... আব্দুল, ক্যায়া মালুম – মুঘল কা সুরজ ভি হামেশা উঠতে রহেগা, সহি হ্যায় না!" আব্দুল খুব যে কিছু বুঝল, তা নয়, কিন্তু সজোরে মাথা নাড়ল। বাদশাহ আপনমনে লিখতে লিখতে শায়েরিগুলো আউড়ে যাচ্ছেন। আবার তাঁর চোখ পড়ল ভোরের আকাশের দিকে।



মুগ্ধ হয়ে বললেন, "ম্যায় সির্ফ কালা রংগ সে লিখ রহা হুঁ আব্দুল, অওর দেখো, আল্লাহ কা শায়েরি কিতনা বেহতর রংগ সে আসমানমে লিখা যা রহা হ্যায়।" তারপর কী মনে করে বললেন, "আব্দুল, তুম পড় সকতে হো?" হতভম্ব আব্দুল মাথা নাড়ালো। মনে মনে বারবার নসিবকে সেলাম জানালো – এই আমার মনিব, আমার প্রভু! এই মানুষটার কাছাকাছি থাকলেই মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। আব্দুল মুগ্ধ! সকলেই এককথায় বলে পূর্বপুরুষদের মতো এঁর লোভ, লালসা, আকাঙ্ক্ষা, ক্রূরতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা কিছুই নেই। বিশাল এই লালকেল্লার মাত্র খানিকটা অংশ নিয়ে এঁর সংসার।



গজল, শায়েরির চর্চায় কত সংস্কৃতিবান লোকজনের যাতায়াত এখানে। ঘরে-বাইরের সকলেরই প্রাসাদে অবাধ প্রবেশাধিকার।

আব্দুল ও অন্য খানসামারা বিহ্বল হয়ে শুনত, বিশেষত যখন জাঁহাপনা পড়তেন, তাঁর গমগমে গলার আওয়াজ লালকেল্লা প্রাসাদের আনাচে কানাচে পৌঁছে যেত। ঠিক অর্থটা ধরতে না পারলেও একটা শায়েরি তো আব্দুলের মুখস্থ হয়ে গেছে –

চারদিনের এক সুদীর্ঘ জীবন ছিল আমার কামনায়
দুটি কেটেছে আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনায়,
আর বাকি দুটি শুধুই অপেক্ষায়...

একেকদিন রাত ভোর হয়ে যায় – কবিতার জাদুতে, গানের সুরে সুরে।

আদ্যন্ত এক মায়াময় প্রজাবৎসল পুরুষ। এবার আব্দুলের নিজেরই হাসি পেল। প্রজা কোথায় যে প্রজাবৎসল? আছে আছে। তারা প্রকাশ্যে না এলেও মাঝে মাঝে এদিক ওদিক দিয়ে 'জাঁহাপনা' বলতে বলতে চলে আসে এখানে। ইদানীং কিছু কিছু লোক আসে সন্ধ্যের আড়ালে, ফিসফিস করে কীসব আলোচনা হয় জাঁহাপনার সঙ্গে। কানাঘুষোয় শুনেছে সে East India Company-র তান্ডব। নিজে দেখেওছে সাদা চামড়ার নেকড়েমুখো লোকজন কেমন দাপিয়ে বেড়ায়। সকলে সসম্ভ্রমে রাস্তা থেকে সরে দাঁড়ায়। বাপ্ রে কী তেজ! এরা নাকি বাইরে থেকে এসে হিন্দুস্তানের সব কর নিয়ে নেয়, এছাড়া মারধোর, কামান দাগা, কারো কারো কাঁধে আবার ইয়া বড় বড় বন্দুক। কিছুদিন আগে মে মাসের ১৬ তারিখে লালকেল্লার কাছেই এক পিপল গাছের নিচে প্রাসাদের কিছু খানসামা আর স্থানীয় বিদ্রোহীরা প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশজন ইউরোপিয়ান সাদা চামড়ার লোকজনকে মেরে ফেলেছে। ব্রিটিশরা কিছুতেই এর বদলা না নিয়ে ছাড়বে না। একটা চাপা উত্তেজনা চলছে দু'তরফেই, যে কোনো মুহূর্তে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত অবশ্যম্ভাবী। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্থানে স্থানে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। এই তো দিনকয়েক আগেই কয়েকজন এসেছিল লালকেল্লায়, আব্দুল তাদের আপ্যায়ন করে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল। এরা নাকি সব সিপাই বিদ্রোহী। এরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের ঐক্য ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে বর্তমান মুঘল সম্রাটকেই তাদের নেতা হিসেবে ঘোষণা করেছিল।

আব্দুল নিজের কানে শুনেছে, ওরা একজোটে জাঁহাপনাকে বলছিল, "আপনাকেই আমরা নবাব বলে মানব... আপনি আমাদের নেতৃত্ব দিন, আমরা আপনার প্রজা।" বাদশাহ অনেক বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন, "আমার না আছে লোকজন, না আছে অর্থ, না আছে সৈন্য-সামন্ত। আমি রাজনীতি বুঝি না। যুদ্ধনীতি কিছু বুঝলেও, আমার বয়স হয়েছে – এই বিশাল ব্রিটিশ সৈন্যদের কাছে আমরা অতি তুচ্ছ। তোমরা বরং অন্যভাবে ভাবো।" কিন্তু ওরা নারাজ। ওরা মানল না। অনেক সাধ্যসাধনার পর মনে হয় জাঁহাপনা বোধহয় রাজি হয়েছেন। সত্যিই কিন্তু পক্ষদুটি সাংঘাতিক অসম। একথা আব্দুলের মতো সাধারণ খানসামাও বোঝে।

এই বাহাদুর শাহ জাফর দ্বিতীয় আকবর শাহের দ্বিতীয় পুত্র। শৈশব থেকেই তাঁর কবি মন। তাই বাবা তাঁকে খুব যত্ন করে নানান ভাষা ও সংস্কৃতি শিখতে উৎসাহ দিয়েছিলেন বারবার। আরবি, ফার্সি, উর্দু সবেতেই তিনি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। তবে ব্রিটিশদের ভাষা তিনি একেবারেই বোঝেন না। বন্দুক তো দূরে থাক, আজকাল লাঠি ওঠাতেও তাঁর মন মানে না – কিন্তু কলম ধরলেই শায়েরিরা ভিড় জমায়। সুর ও ছন্দের অপূর্ব মাদকতা!

বাদশাহ আব্দুলের দিকে চেয়ে বললেন, "আজ কত তারিখ আব্দুল?" আব্দুল একটু ধন্দে পড়ে গেল। ইংরেজি এই সব তারিখ, মাস বা সময় তার মাথায় খেলে না একেবারে। বাদশাহ নিজেই বললেন, "আজ ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭। যাই, আরো একটু শুয়ে নিই। পরে নাস্তা নিয়ে ডেকো আমায়।" আব্দুল মাথা নাড়ল।

শোওয়া বিশেষ হ'ল না। বাইরে খুব গোলমাল। কয়েকজন ছুটতে ছুটতে কেল্লার মধ্যে ঢুকে পড়ে চিৎকার করতে লাগল, "কোথায়... কোথায় জাঁহাপনা? হুজুর কোথায়?" আব্দুল আর অন্য খানসামারা অনেক চেষ্টা করেও তাদের আটকাতে পারল না। কাঁচা ঘুম থেকে ধড়মড় করে উঠে বসে বাহাদুর শাহ জাফর, মুঘল সম্রাট, জানতে পারলেন তাঁকে এক্ষুণি যুদ্ধে যেতে হবে। সম্রাটের মুকুট পরে দেশ ও দেশবাসীকে রক্ষা করতে হবে। General John Nicholson অতর্কিতে দিল্লিতে ঢুকে পড়ে, সব চলতি বিধিনিষেধ শাসন লঙ্ঘন করে, ব্রিটিশ দাবী কায়েম করছে। প্রজারা তাই ১৫২৬-এর মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের বর্তমান প্রাণপুরুষের কাছেই সুরক্ষা চাইছে।

- "কিন্তু আমি কী করব? আমার তো কিছু নেই, লোকলস্কর

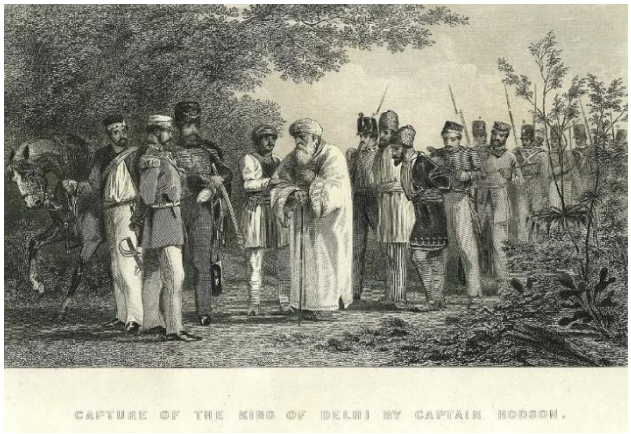
এমনকী যুদ্ধের সামগ্রীও নেই!"

- "আমরা লড়ব আপনার সাথে, আমাদের হাতে লাঠি আর কিছু বন্দুকও আছে। আপনি হুজুর শুধু নেতৃত্ব দিন।"

বাহাদুর শাহ আলস্য ঝেড়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে রাজবেশ পরে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। বাকি সকলেও সামনাসামনি লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত। কিন্তু এই প্রস্তুতি শুরু হতেই আবার শোনা গেল বিশাল হট্টগোল। দূত খবর এনেছে, Major General William Hodson সদলবলে আসছে লালকেল্লা দখল করতে। দেশ বাঁচানোর সুরক্ষার জন্য যারা জাঁহাপনাকে নিয়ে সম্মুখ সমরে যাচ্ছিল, এবার তারাই নবাবের প্রাণসংশয় রোধ করতে সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শ করে নবাব ও তাঁর নিকট পরিবারকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গোপন পথে হুমায়ুন কবর প্রাসাদে আত্মগোপন করালো।

সূর্য তখন মাঝ গগনে। দিল্লির আকাশে রণনিনাদ, বাতাসে বিদেশি জল্লাদের উদ্দাম হুল্লোড়। ব্রিটিশরা তৈরি হয়েই এসেছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তারা আঁতিপাতি করে নবাবকেই খুঁজছে। Major Hodson কিছুক্ষণের মধ্যেই হুমায়ুন কবরের গুপ্ত জায়গা থেকে সকলকে পাকড়াও করে ফেলল। সর্বসমক্ষে বাধ্য করল নবাবকে আত্মসমর্পণ করতে আর নিমেষে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের ওপরে যবনিকা টেনে দিতে।

হিন্দুস্তান রক্ষা করতে চেয়েও বাহাদুর শাহ জাফর পারলেন না। প্রজাদের সুরক্ষাও দিতে পারলেন না। দিল্লির তথা ভারতবর্ষের পালাবদল দেখলেন চোখের সামনে, আর অসহায়ভাবে দেখলেন তাঁর নিজের হাতদুটিতে তখন শিকল



বাঁধা। বন্দী তিনি। ক্ষমতাচ্যুত। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল জল। এই কয়েক ফোঁটা জল গঙ্গা-যমুনার সম্মিলিত জলরাশির থেকেও অনেক বেশি। মুঘল বাদশাহের মনে হ'ল শৃঙ্খলযুক্ত হাতে ইতিহাসের বা শায়েরির পরের পৃষ্ঠাটাও ওল্টাতে পারবেন না কোনোদিন।

বাদশাহকে বন্দী ও আত্মসমর্পণ করানোর উল্লাসে ব্রিটিশরা আত্মহারা। বিজয়ের আনন্দে সঙ্গে সঙ্গে পথেঘাটে রক্তগঙ্গা বইতে লাগল। ধরা পড়ল জাফরের পুত্র, পৌত্ররা। নৃশংসভাবে হত্যা করে তাদের নিরাবরণ ও নিরাভরণ দেহগুলি সাধারণ লোকেদের ভয় দেখানোর জন্য শায়িত রাখা হ'ল প্রকাশ্যে 'Khooni Darwaza'-র সামনে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত-ভাবেই এই ব্যবস্থা। প্রতীকী সম্রাটের দিন শেষ, ভারতবর্ষে এখন থেকে পুরোপুরি চলবে কম্পানি শাসন – নিথর, নগ্ন মৃতদেহগুলি যেন দিবারাত্র সেই ঘোষণাই করতে থাকবে।

শিউরে শিউরে উঠতে লাগল পথচারী। বিদ্রোহের পরিণতি শুধু পরাজয় নয়, নৃশংস হত্যা এটা বুঝতে কারোর আর দেরি হ'ল না। ব্রিটিশরা অন্দরমহলও ছাড়ল না। চলতে লাগল অকথ্য অত্যাচার। হত্যা যাদের করল না, তাদের রাজপ্রাসাদ থেকে টেনে পথে নামিয়ে ভিখারি করে ছেড়ে দিল তারা। অক্ষম অসহায় বন্দী বাদশাহের অশ্রুও বুঝি নিঃশেষ। শুধু জ্বালা, মনে-বুকে-চোখে। শায়েরিটা গলার কাছে আটকে আছে, কিন্তু লেখার কলমটা কই?

খোয়াব টুট গ্যয়া
নিদ্ ছুট গ্যয়া
হিন্দুস্তান খো গ্যয়া
আন্ধেরা ছা গ্যয়া...

বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেবার অপরাধে বাহাদুর শাহ জাফরের বিচার হবে ব্রিটিশের বিচারশালায়। Trial at Diwan-i-Khash – প্রকাশ্য দিবালোকে সর্বসমক্ষে বিচার শুরু হ'ল মুঘল বংশের শেষ নবাবের, চলল টানা ২১ দিন। সবই ইংরেজিতে, এ ভাষা শাহেনশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের জানা নেই। তাই অপরাধীর ভূমিকায় কিছু না বুঝে, না বলে নীরবে সবটা মেনে নিলেন।

বিচারের পর আদালত হুকুম দিল নির্বাসন – যেতে হবে বার্মায়। যে জাঁহাপনা হাতির পিঠে চেপে প্রাসাদের বিশাল দরজা দিয়ে যাওয়া-আসা করতেন, নব রাজত্ব হিন্দুস্তান করায়ত্ত

করে East India Company বিধান দিল – স্ত্রী ও দুই পুত্রসহ নির্বাসিত শেষ সম্রাট গরুর গাড়িতে চেপে রওনা দেবেন পুবমুখে | পথে নদী পড়লে এপার-ওপার করার জন্য নৌকো থাকবে, পরে আবার একটা গরুর গাড়ি | রেঙ্গুনের পথ বহু দূর – বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেবার এটাই সাজা, এটাই বিধান, এটাই রাজার আদেশ |

তিনশো একত্রিশ বছরের মুঘল শাসনের ইতি টেনে, গরুর গাড়ির তালে দুলে দুলে হতশ্রী সম্রাট নতমস্তকে দিল্লি



ছাড়লেন – আলো, রোশনাই, প্রাসাদ, কেল্লা, ঘোড়া, হাতি, লোক-লস্কর, শৌর্য-বীর্য-প্রাচুর্য সব পড়ে রইল পিছনে | আব্দুল ও বাকি সব খানসামার দল ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল তাদের প্রিয় হুজুরের জন্য | হয়তো মনে মনে দোয়া করছিল | অপমানে, যন্ত্রণায়, লজ্জায় নিঃসহায় বাহাদুর শাহ জাফর তাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারলেন না | গরুর গাড়ির চালক অসহিষ্ণু হয়ে তাদের, "এই হট হট, ভাগ যা" বলে সরিয়ে দিয়ে চলতে লাগল | যাবার আগে বাহাদুর শাহ জাফর তাঁর দোয়াত ও কলমটা তুলে নিলেন ছোট্ট পুঁটলিতে | পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, সূর্যাস্ত নয় হিন্দুস্তানের সূর্যোদয় হচ্ছে এবার পশ্চিম দিক থেকে |

পথের দোলায় শুধু ঝাঁকুনি | আগে যে শায়েরিরা ভিড় করে আসত, এখন তারাও বুঝি পলাতক | খাতার পাতা খুলে যেই পরের পৃষ্ঠাটা উল্টোতে যাবেন, কালির আঁচড় নয়, অশ্রুধারায় নতুন অধ্যায় লেখা হয়ে গেল – ভারতবর্ষের নতুন ইতিহাস! গলার কাছে দলা পাকিয়ে আটকে রইল আরেকটি অব্যক্ত শায়েরি –

ঊষর ভূমিতে এই মন তো আমার নয় সুখী
মরণশীল জগতে পূর্ণতা কই, সবই রইল বাকি...

গল্প এবং ইতিহাস

শেলী শাহাবুদ্দিন

এক রাজার কোন সন্তান হয় না | অনেক চেষ্টার পর দেবতার বরে রানী অন্তঃসত্ত্বা হলেন | রাজ্যে আনন্দ উৎসব শুরু হ'ল | যথাসময়ে একদিন রানীর প্রসব বেদনা শুরু হ'ল | রাজা থেকে প্রজারা সকলেই অধীর আগ্রহে সুখবরের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল | এক সময় রাজধাত্রী রাজকীয় আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়ে রাজাকে সুখবরটি দিলেন | বললেন, "মহারাজ, আনন্দ করুন, আপনার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে | অবশ্য তার গায়ের রং একটু চাপা |"

মহারাজ তো আনন্দে আটখানা! গায়ের রং চাপা তো কী হয়েছে? রাজপুত্র তো বটে! তাঁর বংশধর, উত্তরাধিকারী! মহারাজ সহর্ষে মন্ত্রীকে বললেন, "রানীর ছেলে হয়েছে | সামান্য কালো | তাতে কী? তোমরা সকলে আনন্দ করো |"

মন্ত্রী প্রধান অমাত্যকে বললেন, "সুখবর, আমারা একটি রাজপুত্র পেয়েছি | গায়ের রং কালো | তবু মহারাজ খুশি | তোমরা সকলে আনন্দ করো |"

প্রধান অমাত্য সেনাপতিকে বললেন, "সবাই আনন্দ করো | মহারাজের পুত্রসন্তান হয়েছে | যদিও রাজপুত্রের গায়ের রং খুবই কালো |"

সেনাপতি কোটালকে বললেন, "মহারাজার পুত্রসন্তান হয়েছে, যদিও তার গায়ের রং কাকের মতো কালো | কিন্তু এ তো মহা সুখবর! রাজ্যে আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থা করো |"

এইভাবে কথাটা যখন প্রজাদের কাছে পৌঁছাল, তখন সবাই শুনল, "রানী একটি কাক প্রসব করেছেন |"

ছেলেবেলায় স্কুলের বইতে বখতিয়ার খিলজীর যে ইতিহাস আমরা পড়েছিলাম, তার সাথে এই গল্পের একটা মিল আছে | পাকিস্তান সরকারের বানানো সেই ইতিহাস বইতে পড়েছি বখতিয়ার খিলজী মাত্র সতেরোজন অশ্বারোহী নিয়ে বাংলা আক্রমণ করেছিলেন এবং তাই দেখে লক্ষণ সেন ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন | আমরা শিশুরা তা বিশ্বাস করেছিলাম, গর্বিতও বোধ করেছিলাম | ফলে আমাদের জাতীয় স্মৃতিতে গল্পটা এমনভাবে গেঁথে গেছে, যে এই গল্পটা এখনও অধিকাংশ বাংলাদেশের মানুষ বিনাবাক্যে বিশ্বাস করে | অল্পসংখ্যক

চিন্তাশীল মানুষ হয়তো ভাবে যে এটা আদৌ বাস্তব কিনা। একটু চিন্তা করলেই যে কোন মানুষ বুঝতে পারে যে এটা একেবারেই সম্ভব নয়, একটা অবান্তর গল্প মাত্র। আজকের বাংলাদেশের 'মব-শাসনের' কালে হয়তো এটা সম্ভব, কিন্তু অন্য কোনও কালেই এটা সম্ভব ছিল না।

বাস্তবে কী ঘটেছিল? দেখা যাক ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের কী জানায়।

আমেরিকার অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক রিচার্ড ইটন লিখেছেন, "আনুমানিক ১২৪৩-৪৪ সালের কোন একসময় উত্তর পশ্চিম বাংলার লখনউ (গৌড়) নগরের বাসিন্দারা একজন পরিব্রাজক ঐতিহাসিককে তখন থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগের এক নাটকীয় ঘটনার ইতিহাস জানিয়েছিল। তারা জানিয়েছিল যে সেসময় কয়েকশত তুর্কি অশ্বারোহী সৈন্যের একটি দল অতি দ্রুত গাঙ্গেয় সমভূমি অতিক্রম করে বঙ্গীয় বদ্বীপের দিকে অগ্রসর হয়। বখতিয়ার খিলজী নামে তাদের এক সাহসী দলপতি ছিলেন। এই বদ্বীপের দিকে অগ্রসর হওয়ার আগে তারা বিহার অঞ্চলের কতকগুলি বৌদ্ধ মঠ দখল করেছিল। বদ্বীপের উত্তরপশ্চিম অংশে তখন রাজা ছিলেন উদার ও কোমল স্বভাবের হিন্দু ধর্মাবলম্বী একজন মানুষ। বখতিয়ার এবং তাঁর দলের লোকেরা ঘোড়া ব্যবসায়ী সেজে নুদিয়া বা নদীয়া শহরে (১) প্রবেশ করে। তারপর তারা দ্রুত রাজপ্রাসাদে ঢুকে গিয়ে তাদের তরবারি বের করে এবং রাজার প্রহরীদের ঘিরে ফেলে। রাজা তখন সবে খেতে বসেছেন, উপায়ান্তর না দেখে তিনি তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে পেছন দরজা দিয়ে পালিয়ে যান এবং পূর্ব বাংলার অরণ্যভূমিতে আশ্রয় নেন। এভাবেই বাংলায় পরবর্তী পাঁচশত বছর মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়।"

অধ্যাপক ইটনের মতে ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দিনের লেখা ইতিহাস গ্রন্থে এই বর্ননা বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের সব চাইতে পুরোনো দলিল। এটি স্বাভাবিক যে বর্ণনাকারীদের কেউ কেউ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং হয়তো কেউ কেউ এই ঘটনায় অংশগ্রহণও করেছিলেন (২)।

বখতিয়ার খিলজী যে সাহসী সেনাপতি ছিলেন, সে-কথা এই বর্ণনাতেই আছে। তিনি মেধাবী এবং সুকৌশলীও ছিলেন। সর্বকালেই যুদ্ধের সর্বস্বীকৃত প্রধান এবং অন্যতম কৌশল হ'ল প্রতিপক্ষকে surprise বা আশ্চর্য করে দেওয়া। বখতিয়ার খিলজী সাহসের সাথে সেই কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর দলে ১৭ জন নয়, কয়েকশত অশ্বারোহী সৈনিক ছিল। পেছনে ছিল দশ সহস্র সৈন্যের একটি দল। তাদের ফেলে বখতিয়ার খিলজী এগিয়ে গিয়েছিলেন (৩)।

লক্ষণ সেনের পূর্বপুরুষ ছিল দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটকের এক যোদ্ধা জাতি। একাদশ শতাব্দীতে তারা সেখান থেকে এসে বাংলায় বসতি স্থাপন করে এবং পাল রাজাদের অধীনে চাকরিতে নিয়োজিত হয়। পরবর্তীতে পালবংশ দুর্বল হয়ে পড়লে সেন বংশের উত্থান ঘটে এবং সেনবংশ (১০৯৭-১২২৩) বাংলায় রাজত্ব শুরু করে (৪)। অর্থাৎ লক্ষণ সেন কাপুরুষ ছিলেন এমন মনে করার কোন কারণ নেই। তিনি শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন। মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিনের ইতিহাসের ইংরেজি অনুবাদে লক্ষণ সেনকে বর্ণনা করা হয়েছে 'A mild and generous Hindu Monarch' হিসাবে।

ঐতিহাসিক কারণটা অধ্যাপক ইটন ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে – "Militarily Muhammad Bakhtiyar's conquest was a blitzkrieg; his cavalry of some ten thousand horsemen had utterly overwhelmed a local population unaccustomed to mounted warfare. Bakhtiyar's band of some two hundred cavalrymen, with which he surprised Lakshmana Sena of Nudiya, was but an advanced detachment from his main force of ten thousand" (৩)।

অর্থাৎ, বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয় ছিল হিটলারের ব্লিৎজক্রিগ আক্রমণের মতো। বখতিয়ার খিলজীর সঙ্গের দুইশত অশ্বারোহী ছিল আসলে তাঁর দশ হাজার অশ্বারোহী বাহিনীর অগ্রবর্তী একটি দল। বাংলার মানুষ তখন অশ্বারোহী যুদ্ধের সাথে পরিচিত ছিল না। খিলজীর দশ হাজার অশ্বারোহী বাহিনী তাদের স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।

যুদ্ধের এই মনস্তাত্ত্বিক কৌশলটিকে এরপর ক্ষমতা ধরে রাখার জন্যেও বখতিয়ার খিলজী ব্যবহার করেছিলেন। সে বিষয়ে অধ্যাপক ইটন আরো লিখেছেন, "After the conquest, Bakhtiyar and his successors continued to hold a constant and vivid symbol of their power –

their cavalry – before the defeated Bengalis" (৩) |
অর্থাৎ, বিজয়ের পরেও বখতিয়ার এবং তাঁর উত্তরসূরিরা শক্তির প্রতীক হিসাবে তাদের এই অশ্বারোহী বাহিনীকে সবসময় পরাজিত বাঙালিদের চোখের সামনে রাখত |
মনে হয়, অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে অপরিচিত সেকালের বাংলায় এই অশ্বারোহী বাহিনী ছিল একালের ট্যাঙ্ক বাহিনীর মতোই সাধারণ মানুষের মনোবল দুর্বল করার পদ্ধতি | যে পদ্ধতি আমারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই দেখে আসছি পৃথিবীর সর্বত্র |

লক্ষণ সেনের রাজধানী ছিল প্রকৃতপক্ষে বিক্রমপুরে | সে সময় লক্ষণ সেন নুদিয়া বা নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন | বখতিয়ার খিলজী বিহারে বৌদ্ধ বিহারগুলি দখল বা ধ্বংস করে বাংলার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন | লক্ষণ সেন সেজন্য নদীয়ার প্রবেশপথ রাজমহল এবং তেলিয়াগড়ের নিরাপত্তা জোরদার করেছিলেন | লক্ষণ সেনের ধারণা ছিল যে ঝাড়খণ্ডের শ্বাপদসংকুল অরণ্য দিয়ে কোন আক্রমণ সম্ভব নয় | কিন্তু বখতিয়ার খিলজী বুদ্ধি করে সেই পথেই দ্রুত আক্রমণ করে লক্ষণ সেনকে অবাক করে দেন |

সাম্প্রতিক কালের আরো কিছু লেখক ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দিনের লেখা উল্লেখ করে ওই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন | কিন্তু তাঁরা সকলেই খিলজীর সঙ্গের অশ্বারোহীর সংখ্যা বিষয়ে মিনহাজ উদ্দিনের দেওয়া তথ্য এড়িয়ে গেছেন |

এশিয়ান এইজ পত্রিকাও লিখেছে – লক্ষণ সেন যে দিকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা রেখেছেন, সেদিকে আক্রমণ না করে বখতিয়ার খিলজী ভিন্ন পথে অরণ্যের ভেতর দিয়ে আকস্মিক আক্রমণ করেছিলেন (৫) |

অধ্যাপক ইয়াকুব আলী লিখেছেন, "He started from South Bihar with an army divided into several small detachments for strategic reasons, and crossing the way through Jharkhand appeared before the gate of Nadiya at noon time with a band of eighteen horsemen, apparently seemed to be horse-dealers and the rest of the army was to follow him. Nadiya was conquered almost without any fighting, as possibly the troops of the King were posted at Teliagarh. Lakshmana Sena fled towards Vikrampur in Bango" (৬) |
অর্থাৎ, তিনি (বখতিয়ার খিলজী) কৌশল হিসাবে তাঁর সৈনিকদের কয়েকটি ছোট ছোট দলে ভাগ করে দক্ষিণ বিহার থেকে যাত্রা করেন এবং ঝাড়খণ্ডের ভেতর দিয়ে এসে দুপুরবেলা ১৮ জন অশ্বারোহীর একটি দল নিয়ে নদীয়ার ফটকে হাজির হন | এই দলটিকে ঘোড়া ব্যবসায়ী মনে হয়েছিল, এবং বাকি দলগুলি তাদের অনুসরণ করছিল | তারা প্রায় বিনাযুদ্ধে নদীয়া দখল করে, কারণ সম্ভবত রাজার সৈন্যবাহিনী তেলিয়াগড়ে নিয়োজিত ছিল | লক্ষণ সেন বঙ্গের বিক্রমপুরে পালিয়ে যান |

রুবাইয়াৎ আমিন নামক এক লেখক প্রায় একই কথা লিখেছেন, "রাজা লক্ষণ সেনের রাজধানী ছিল ঢাকার বিক্রমপুরে | তিনি বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাপাড়ের পবিত্র তীর্থস্থান নদীয়ায় বাস করছিলেন | তিনি একজন সাহসী যোদ্ধা এবং সুশাসক ছিলেন | নিজ রাজ্য রক্ষার কোনো পূর্ব প্রস্তুতি তিনি নেননি এমনটা ধরা যায় না | ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, তিনি রাজ্যের মূল প্রবেশপথ তেলিয়াগড় গিরিপথে প্রহরার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু সুকৌশলী বখতিয়ার খিলজী সেই পথে না গিয়ে দক্ষিণ দিকের জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা ঝাড়খন্ডের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হন | তিনি তাঁর বাহিনীকে ছোট ছোট দলে ভাগ করেন এবং নিজে এরকম একটি দলের অগ্রভাগে ছিলেন | ফলে যখন তিনি নদীয়া পৌঁছান, কেউ ভাবতেও পারেননি যে তুর্কি বীর বখতিয়ার খিলজী বাংলা জয় করতে এসেছেন | সবাই তাকে সাধারণ ঘোড়া ব্যবসায়ী ধরে নেয় | খিলজী সোজা রাজা লক্ষণ সেনের প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হন এবং দ্বাররক্ষীদের হত্যা করেন | রাজা তখন মধ্যাহ্নভোজে লিপ্ত ছিলেন | খবর শুনে তিনি নগ্নপদে প্রাসাদের পশ্চাৎদ্বার দিয়ে পলায়ন করেন এবং বিক্রমপুরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন (৭, ৮) |"

আশ্চর্য বিষয় এই যে, এইসব লেখকরা সকলেই মিনহাজ উদ্দিনের ইতিহাস বই 'তাবাকাত-ই-নাসিরী' থেকে অধিকাংশ তথ্য দিয়েছেন | কিন্তু তাঁরা ১৭ বা ১৮ ঘোড়া থেকে একচুল সরেন নাই, এবং মিনহাজ উদ্দিনের কয়েক শত ঘোড়ার কথা বেমালুম চেপে গেছেন |
আমাদের, মানে বাঙালি মুসলমানদের এই মানসিকতার কী

ব্যাখ্যা হতে পারে?

মনে হয় Ostrich Phenomenon বা উটপাখি মনস্তত্ত্বের এক ভিন্ন রূপ এই মানসিকতা | অর্থাৎ এই ইতিহাসগুলি কোন চিন্তাশীল মানুষ লেখেন না | যাঁরা লেখেন, তাঁরা জেনে শুনে মিথ্যা বা ভুল ইতিহাস লেখার পরিণাম নিয়ে চিন্তা করেন না | চিন্তাশীল মানুষ হলে তাঁরা চিন্তা করতেন যে এই মিথ্যাচার বা ভুল ইতিহাস পড়ে বাঙালি মুসলমান ছেলেমেয়েদের কী লাভ হচ্ছে? লাভ হয়তো এই, যে তারা মিথ্যাকে সত্য জেনে সুখে মৃত্যু বরণ করছে | ইংরেজিতে বলে, 'Bliss of Ignorance' অজ্ঞতার সুখ | ক্ষতি এই যে সে নিজের প্রকৃত শক্তিগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ, উদাসীন রয়ে যায় |

শিক্ষা, সংস্কৃতি, মানবিক মূল্যবোধ, নদীমাতৃক বদ্বীপ অঞ্চলজাত অসাধারণ প্রাকৃতিক গুণাবলী, যা জন্ম থেকেই বাংলার জলসিক্ত মৃত্তিকা, উদ্ভিদ ও তার পত্র-পুষ্পের মতো রসময়, রমণীয়, কমনীয়, সঙ্গীত ও কাব্যমনস্ক; তবুও মৃত্যুহীন অজেয় করে তোলে, তার সাথে তার কোন পরিচয় হয় না |

সে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে প্রচন্ড লাফ দিয়ে হুঙ্কার দেয়, 'আমরা সতেরো অশ্বারোহী মুসলমান এই পৃথিবীর সব দখল করে ফেলব |' ক্রমাগত এইভাবে লাফাতে লাফাতে সে এত ওপরে ওঠে যে কালক্রমে একসময় সে সেখান থেকে ধপাস করে মাটিতে আছড়ে পড়ে মরে যায়, নিভে যায় | যেমন নিভে গিয়েছিল অস্কার ওয়াইল্ডের 'হাউই'|

তথ্যসূত্র –

(১). Nudiya is probably identifiable with Naudah, a village several miles northeast of Rohanpur rail station in western Rajrashi district (পশ্চিম রাজশাহী জেলার রোহনপুর রেল স্টেশন থেকে কয়েক মাইল উত্তরপূর্বে সম্ভবত নৌদহ গ্রাম). See "Mohammad Bokhtiyar's Conquest of Nudiah." Journal of the Varendra Research Museum 6 (1980–81): 57 – 72. Abul Kalam Mohammad Zakaria).

(২). Moulana-Minhaj-ud-Din Abul-Umor-i-Usman. Tabakat-i-Nasiri. A General History of the Muhammadan Dynasties of Asia, Including Hindustan (810–1260) trans HG Raverty (Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1881; Reprint, New Delhi: Oriental Book Reprint, 1970), 1:557–8).

(৩). The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204 –1760. Richard M Eaton. University of California Press. Berkeley and Los Angeles, California, 1996. (p 33).

(8). HC Ray. The Dynastic History of Northern India. (Early Medieval Period) 2d ed. (New Delhi: Munshiral Monohorlal, 1973), 1: 354–58.

(৫). Horses of Bokhtiyar. Asian Age Online. 16 October 2020.

(৬). The Muslim Conquest of Bengal. By Professor Emeritus Dr. AKM Yakub Ali. https://www.bmri.org.uk/book_reviews/Muslim_Conquest_ofBengal.pdf Downloaded on 5/24/26.

(৭). মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী | উইকিপিডিয়া | মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজী – উইকিপিডিয়া

Downloaded on 5/24/26.

(৮). বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয় | রুবাইয়াৎ আমিন | ইতিহাস | Roar বাংলা, মার্চ ৪, ২০১৭ |

Roar বাংলা – বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয় Downloaded on 5/26/26.



কৈলাস থেকে কলকাতা:
মা দুগ্গার সোশ্যাল মিডিয়া পরিবার

অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস

আশ্বিন মাস পড়তেই কৈলাসে হৈহৈ রৈরৈ ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। আগেও বছরকার এই সময়ে দেবলোকে যুদ্ধের প্রস্তুতি, বাহনদের ট্রেনিং, অস্ত্র পরিষ্কার, সিংহের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, অসুর গোয়েন্দাদের রিপোর্ট – এসব চলত। এখনও চলে। তবে তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আরেকটি বিষয়। Content Planning – অর্থাৎ কিনা, সমাজ মাধ্যমের জন্য বিশেষ বিষয়ের পরিকল্পনা। কারণ মা দুর্গা এখন শুধুই পূজ্য দেবী বা ঘরের মেয়ে নন। তিনি একজন verified আন্তর্জাতিক ইনফ্লুয়েন্সার! বায়ো দশভুজা। অসুরবধ স্পেশালিস্ট, জগৎজননী, কৈলাশ ও পৃথিবী 'শক্তির উৎস, শান্তির ঠিকানা'। ইনস্টাগ্রামে তাঁর ফলোয়ার সংখ্যা ১৮৭ কোটি। আর দেবীপক্ষ এসে পড়লে ফলোয়ার বেড়ে ২৫০ কোটিতে পৌঁছে যায়। তাঁর সমাজপ্রভাবী স্ট্যাটাস এখন ব্লু-টিক সমৃদ্ধ। সেই সঙ্গে তাঁর চার ছেলে মেয়েদেরও নিজস্ব প্রোফাইলে কোটি ফলোয়ার কবেই ছাড়িয়েছে। প্রত্যেকেই যে যার niche জগতে ভীষণভাবেই সুদক্ষ ও জনপ্রিয়।

বাৎসরিক কনটেন্ট মিটিং –

মহালয়ার এক মাস আগে জরুরী পারিবারিক বৈঠক বসল। মা দুর্গা টেবিলে iPad রেখে বললেন – "এই বছর কনটেন্ট স্ট্র্যাটেজি কী?"

নারদমুনি – অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার, উনি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেসেন্টেশন খুললেন। স্লাইড-১: পুজো ২০২৬ গ্রোথ প্ল্যান; টার্গেট: ২০% ফলোয়ার বৃদ্ধি, ৩০% বেশি রীল engagement, মহিষাসুর সংক্রান্ত নেগেটিভ PR কন্ট্রোল।

গণেশ অধৈর্য্যভাবে হাত তুলল – "আগে খাবারের বাজেট বলো; গতবার ডায়েট লাড্ডুর চক্করে আমার ২৫০ গ্রাম ওজন কমে গিয়েছিল, তারপরে স্বর্গে ফিরে আর লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছিলাম না।"

কার্তিক কায়দা করে মাথার চুল ঠিক করতে করতে বলল, "আমার কভার ফটো কে তুলবে? এবার কিন্তু প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার চাই।"

সরস্বতী গম্ভীর মুখে বলল, "আমরা কি এবার কিছু শিক্ষামূলক কনটেন্ট করতে পারি?" আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিভাবে অর্গানিক চিন্তাভাবনা ও সৃষ্টিশীলতার উপর প্রভাব বিস্তার করছে, এ এখন তার ভারী চিন্তার বিষয়।

লক্ষ্মী শেয়ার বাজারের ব্যালান্স শিটের দিকে তাকিয়ে একখান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "মর্ত্যে অনর্থক যুদ্ধ আর লড়াইয়ে তেল আর সোনার দাম আকাশ ছোঁয়া – এমন অবস্থায় সাধারণ মানুষকে বিশেষভাবে বৈষয়িক শিক্ষার কনটেন্ট দিতেই হবে, নইলে তারা যে বড্ড ঝামেলায় পড়ে যাবে।"

ঘরে পাঁচ সেকেন্ড নীরবতা। সবাই এর ওর দিকে তাকাল। মা দুর্গা চিন্তিত মুখে ফাইনাল খসড়া তৈরিতে মগ্ন হলেন।

পৃথিবীতে পদার্পন ব্লগ –

আগে মা দুর্গা আসতেন নৌকায়, ঘোড়ায়, দোলায়।



শিল্পী: অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস

এখন? ইনস্টাগ্রাম রীল আর ইউটিউব শর্টসে। মহালয়ার দিন ট্রেলার রিলিজ হয়। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক: ঢাক+সিনেম্যাটিক beats; ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে – পেঁজা তুলো মেঘের ভেতর দিয়ে সিংহ কেশর ফুলিয়ে ছুটছে। কার্তিক নতুন 'সব্যসাচী' ডিজাইনার ধুতি পরে স্লো-মোশনে হাঁটছে। গণেশ রাস্তার ধারে ফুচকা, মোমো, জিলিপি থেকে শুরু করে ক্যাফের ফ্র্যাপেচিনো সব কিছুই চেখে দেখছে। লক্ষ্মী ড্রোন ক্যামেরায় মিষ্টি হেসে সোনা কিনতে বারণ করছে। সরস্বতী এক হাতে ল্যাপটপ ও অন্য হাতে বীণা নিয়ে confused মুখে দাঁড়িয়ে আছে। শেষে মা দুর্গা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলছেন – "হাই কলকাতা...

শুভ শারদীয়া! We are back!" ২ ঘন্টার মধ্যেই ভিউ ৪২ কোটি।

শুটিং লোকেশন না প্যান্ডেল –

কলকাতায় নামার পর দেবী পরিবার অবাক। আগে মর্ত্যে আসলেই মানুষ প্রণাম করত। এখন প্রথমেই প্রশ্ন আসে – "মা, একটা সেলফি হবে?" একজন বলল, "মা, ক্যামেরার দিকে রাইট অ্যাঙ্গেলে একটু তাকান।" আরেকজন – "মা, আমার ব্লগের জন্য একটা bite দিন প্লিজ।" তৃতীয়জন – "মা, একটা ট্রানজিশন রীল বানালে ভাইরাল হয়ে যাবে।" মা দুর্গা গতিক দেখে ভাবলেন, 'অসুররা জ্বালাত বটে কিন্তু এত্তো ছবি ছবি করে মাথাখারাপ করত না অন্তত।'

কার্তিক পুজোর ফ্যাশন আইকন –

পুজো শুরু হতেই কার্তিক কলকাতার যুবসমাজের স্টাইল গুরু হয়ে উঠল। প্রতিদিনের পোস্ট: সপ্তমী লুক – ক্যাপশন: 'ট্র্যাডিশনাল কিন্তু কিলার', অষ্টমী লুক – ক্যাপশন: 'এথনিক vibes ওনলি।', নবমী লুক – ক্যাপশন: 'নবমী সর্টেড', কমেন্ট: "দাদা পাঞ্জাবিটা কোথা থেকে?" "হেয়ার কেয়ার রুটিন শেয়ার করো প্লিজ।" "আচ্ছা ময়ূরের স্কিন কেয়ার কীরকম?" কার্তিকের DM-এ ৩২ লাখ মেসেজ। সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন – "Are you single?"

গনেশ বেস্ট ফুড ব্লগার –

পুজোর দ্বিতীয় দিন থেকেই গণেশ নিখোঁজ।



শিল্পী: অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস

মা ফোন করলেন, "কোথায়?"

গণেশ: "শ্যামবাজারে।"

একঘন্টা পরে – "কোথায়?"

- "বিবেকানন্দ পার্কে।"

দুইঘন্টা পরে – "এবার কোথায়?"

- "বালিগঞ্জ প্লেসে বিরিয়ানি রিভিউ করছি।"

গণেশের চ্যানেল: রসনাবিলাসী পুজো পরিক্রমা feat. সিদ্ধিদাতা গনেশ –

এপিসোড ১: বিরিয়ানি ব্লাস্ট

এপিসোড ২: বেস্ট রোল অ্যান্ড ফুচকা

এপিসোড ৩: ইন্দোচাইনিস ক্যাফে

এপিসোড ৪: পাইস হোটেল – মাছে ভাতে

এপিসোড ৫: শেষ পাতে মিষ্টি মুখ

ভিউ: পাঁচটা এপিসোডেই আড়াই লক্ষ সাবস্ক্রাইবার, মানিটাইজেশন অন। বলাই বাহুল্য জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া।

লক্ষ্মী এবং স্পন্সরড কনটেন্ট –

মর্ত্যে পা দিতে না দিতেই লক্ষ্মীর কাছে ব্র্যান্ডের লাইন লেগে গেল। ব্যাংক, ফিন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশন, মিউচুয়াল ফান্ড, ইনশিওরেন্স কম্পানি। সবাই চাইছে স্পেশাল collaboration! কমেন্ট সেকশন ভরে যাচ্ছে: "মা, Bitcoin কিনব?", "মা, SIP না FD?", "মা, শেয়ার বাজার উঠবে না নামবে?" লক্ষ্মী বিরক্ত হয়ে লিখলেন, "আমি দেবী, SEBI রেজিস্টার্ড অ্যাডভাইজার নই।" একদিন লক্ষ্মী ইন্সটা স্টোরি দিলে – 'আজকের ভিডিও, ইন পার্টনারশিপ উইথ নবযুগ মানি গ্রোথ ফান্ড।' সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেট উত্তাল!

কার্তিক নাক সিঁটকে বলল, "এত স্পনসরশিপ নিয়েছিস, তা মানুষের কি কাজে লাগছে দিদি?"

লক্ষ্মী ঝটতি জবাব দিল, "ভাই, এখন এই জোর জবরদস্তি যুদ্ধের বাজারে টোটাল ক্রাইসিস ইন ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স, আমাকে শুধু বাংলা নয় পুরো পৃথিবীর মানুষের কথাই ভাবতে হয়! আমার সমস্ত রোজগার আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো উন্নয়নের স্বার্থে! সারাক্ষণ ফ্যাশন আর ট্রেন্ডস নিয়ে থাকিস তুই, এসবের আর কী বুঝবি!"

সরস্বতীর সাংস্কৃতিক ক্রাইসিস –

সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে টেড টক সিরিজ শুরু করল; বিষয়: 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন'। আজকাল কোনটা সত্যিকারের প্রতিভা আর কেই বা নকল প্রযুক্তির

সাহায্যে সকলকে ভাঁওতা দিচ্ছে তা বোঝা মুশকিল | লেখালেখি থেকে শুরু করে ফোটোগ্রাফি, গানবাজনা সবেতেই আজকাল বেনোজলের মতো যান্ত্রিকতা ঢুকে পড়েছে | ভেজালবিহীন বিশুদ্ধ মেধা ও দক্ষতার মূল্যায়ন করা এখন মহা দায়| কিন্তু তার ভিউ মাত্র ৯০০০!

একই সময়ে গণেশ পোস্ট করল – '১০ কেজি রসগোল্লা চ্যালেঞ্জ – ওমা, এখানে তার ভিউ ৮ কোটি! অগত্যা সরস্বতী মনোদুঃখে সেদিন হোয়াটস্অ্যাপ স্টেটাস দিলেন – 'নাঃ, এ আর নিতে পারা যাচ্ছে না| জ্ঞানচর্চার যুগ শেষ| এবার সবাই ১৫ সেকেন্ডের reel দেখে জীবনদর্শন শিখবে| মানুষের রুচিবোধ এখন সত্যিই প্রশ্নচিহ্নের মুখে!"

ফ্যামিলি হোয়াটস্অ্যাপ গ্রুপ:

নাম, "দুর্গা পরিবার অফিসিয়াল"

মা: 'সবাই কোথায়?'

Seen by all; Reply: None

১৫ মিনিট পরে –

মা: 'আমি সিরিয়াস|'

গণেশ: 'খাচ্ছি|'

কার্তিক: 'দশমী স্পেশাল ফটোশুটে ব্যস্ত|'

লক্ষ্মী: 'লক্ষ্মী পুজোর জরুরী মিটিং|'

সরস্বতী: 'ব্লগ লিখছি|'

মা: 'একবারও কেউ বলল না, 'মা, তুমি কোথায়? বাপের বাড়ি থেকে আবার বিদায়ের পালা চলে এল, তোমার কি বড্ড মনখারাপ?'

গ্রুপ নিশ্চুপ | মা উমা চুপচাপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে যাওয়ার আগে একবার লাস্ট মিনিট টু-ডু লিস্টে চোখ বুলিয়ে নেওয়ায় মন দিলেন|



শিল্পী: অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস

মহিষাসুরের রিভেঞ্জ পডকাস্ট –

মহিষাসুর এবার পডকাস্ট শুরু করেছে| নাম: 'The Other Side'

এপিসোড ১: প্রতি বছর অসুরদের লজ্জাজনক প্রদর্শন

এপিসোড ২: মিডিয়ার পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ

এপিসোড ৩: অসুর সমাজের আরো ভালো জনসংযোগের প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রতি বছরই মহালয়ার পর শ্রোতা কমতে থাকে|

দশমীর বিদায়বেলা –

বিজয়া দশমীর দিন, সকলের মন খারাপ|

মা দুর্গা শেষ রীল পোস্ট করলেন | ভিডিওতে ঢাক বাজছে | মানুষ কোলাকুলি করে চোখের জল মুছছে | গঙ্গার হাওয়ায় সিঁদুরেমাখা লালপাড় সাদা শাড়ির আঁচল উড়ছে | খালি প্যান্ডেল, মাইকে বিসর্জনের গান, চারিদিকে বিরহের নান্দনিক প্রদর্শন|

ক্যাপশন: 'চারদিনের এই ভক্তি আর ভালোবাসা আমাদের সারা বছরের শক্তি দেয় | আসছে বছর আবার আসব|' কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ১২ কোটি like | কিন্তু তার নিচেই কার্তিক কমেন্ট করল – 'মা, ওই রীলে আমার লেফ্ট প্রোফাইল ব্যবহার করোনি কেন?' গণেশ বিরক্ত ইমোজি দিয়ে কমেন্ট করল – 'উফফ, আমার ফুড ব্লগ ট্যাগ করোনি যে!' লক্ষ্মী লিখল, 'একী! স্পনসর ক্রেডিট মিসিং|' সরস্বতী লিখে ফেলল, 'ক্যাপশনে একটা বানান ভুল আছে| ভেরি শেমফুল|' সব দেখেশুনে মা ভুরু কুঁচকে বললেন, "এর চাইতে মহিষাসুর বধ অনেক সহজ ছিল!" অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জেতা যায়| মর্ত্যে এসে কোটি কোটি মানুষকে আশীর্বাদও দেওয়া যায় | কিন্তু, সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে নিজের সন্তানদের নিয়ে একটি রীল পোস্ট করে সব্বাইকে খুশি রাখা? সেটা স্বয়ং ব্রহ্মাও পারবেন না| আর সেই কারণেই সম্ভবত প্রতি বছর বিজয়ার পর কৈলাসে ফিরে মা দুর্গা প্রথমেই ফোনটা সাইলেন্ট মোডে রেখে দেন | কারণ, দেবী হওয়া সহজ | কিন্তু Social Media Mom হওয়া অত্যন্ত কঠিন!

মধ্যযুগের প্রেমকাব্য

কৃষ্ণা গুহ রায়

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ধর্মকে বাদ দিয়ে যিনি প্রথম রক্ত মাংসের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার গভীর উপস্থিতিগুলোতে শব্দচয়ন করে প্রগাঢ় অনুভূতির জীবন্ত দলিল রূপে প্রকাশ করলেন, তিনি হলেন মধ্য যুগের বাঙালি কবি দৌলত কাজি।

দৌলত কাজি সেসময় কাজি দৌলত নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৭'শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোনও একসময় চট্টগ্রাম জেলার রাউজান, সুলতানপুরের কাজি পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন আরাকান রাজসভার কবি। তাঁর লেখার ভাষা ছিল বাংলা। মধ্যযুগের অন্যান্য কবিদের মতো তাঁর কাজে তাঁর পৃষ্ঠপোষক সম্পর্কে বর্ণনা থাকলেও নিজের সম্পর্কে তিনি কিছুই লিপিবদ্ধ করে যাননি। তিনি 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী' কাব্য রচনা করে বাংলার শক্তিমান কবিদের মাঝে নিজের অবস্থান করে নিয়েছিলেন। বাংলা কাব্যে ধর্ম নিরপেক্ষ প্রণয় কাহিনীর তিনি পথিকৃৎ। সম্ভবত ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। গবেষকদের মতে আরাকান রাজ্যের আকিয়াবের কোনও এক স্থানে তাঁর সমাধি রয়েছে।

দৌলত কাজি অল্প বয়সে নানাশাস্ত্রে সুপন্ডিত হয়ে উঠেন। নিজের দেশে স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ হয়ে তিনি আরাকানে যান ভাগ্য অন্বেষণে। সেই সময়কালে চট্টগ্রামবাসীরা জীবিকা অর্জনের জন্য আরাকানে যেতেন। আরাকান রাজসভায় তখন বহু কবি এবং জ্ঞানী লোকের ভিড় ছিল। রাজার প্রধান উজীর আশরাফ খান একদিন হিন্দি ভাষার কবি মিঞা সাধন রচিত 'সতীময়না' কাহিনী শুনতে চান। দৌলত কাজি পাঞ্চালীর ছন্দে সতীময়নার কাহিনী বর্ণনা করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন এবং আরাকান (রোসাঙ্গ) রাজ দরবারে কবিদের সভায় সমাদৃত হন; সেই সঙ্গে যথেষ্ট মর্যাদাও লাভ করেন।

১৬২২ থেকে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে আশরাফ খান আরাকানের তৎকালীন অধিপতি থিরিথু ধম্মা বা শ্রী সুধর্মা নস্কর উজীর বা সমর সচিব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দৌলত কাজি আরাকান রাজসভার আশরাফ খানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি ও আশরাফ খান দুজনেই সুফী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। আশরাফ খানের আগ্রহে তিনি কবি 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের শুরুতেই তিনি থিরিথু ধম্মা এবং আশরাফ খানের প্রশংশায় লিখেছেন –

কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী
রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতারী ||

তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে যুদ্ধাচার
নাম শ্রী থুধম্মা রাজা ধন অবতার ||

প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন ||

দেব গুরু পুজএ ধর্মেতে তান মন
সে পদ দর্শনে হএ পাপের মোচন ||

পুণ্যফলে দেখে যদি রাজার চরণ
নারকীও স্বর্গ পাএ সাফল্য জীবন ||

*****

মুখ্য পাত্র শ্রীযুক্ত আশরাফ খান
হানাফী মোজাহাব ধরে চিস্তিয়া খান্দান ||

*****

শ্রীযুক্ত আশরাফ খান লস্কর উজীর
যাহার প্রতাপ বজ্রে চূর্ণ আর শির ||

মিঞা সাধন নামক একজন হিন্দিভাষী মুসলিম কবি রচিত 'ময়না কো সত্' কাব্য (কাব্যটি 'ঠেট গোহারি' বা এক ধরনের গ্রাম্য হিন্দি ভাষায় লেখা) অবলম্বনে 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না' কাব্য রচিত হয়। এই কাব্যের সঠিক রচনাকাল জানা যায়নি। তবে অনুমান করা হয় ১৬২২ থেকে ১৬৩৮ সালের মধ্যে এই কাব্য রচনা করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই মহাকাব্য সমাপ্ত হওয়ার আগেই দৌলত কাজি মৃত্যুবরণ করেন। কবির মৃত্যুর ২০ বছর পরে কবি আলাওল কাব্যটির শেষাংশ রচনা করেন।

জন্মলগ্ন থেকেই মানুষ প্রেমের মায়াজালে আবদ্ধ। কারণ, প্রেমের স্বরূপ চিরন্তন। প্রেম নায়ক-নায়িকার জীবনে কখনও অমৃতের স্বাদ এনে দেয়, আবার কখনও প্রেমের অগ্নিকণাই তাদের জীবনকে বিষের জ্বালায় জর্জরিত করে তোলে – দু'য়ে মিলেই প্রেমের সার্থকতা। আবার দাম্পত্য

জীবনেও প্রেমের একটা ভিন্ন স্বাদ রয়েছে | আদর্শ পুরুষরা যেমন স্ত্রীকে কখনও ঠকান না তেমনি আদর্শ নারীরাও নয় | এক্ষেত্রে নারীদের সতীত্ব রক্ষার ব্যাপারটা সংসার জীবনে একটা বড় ভূমিকা পালন করে | বিষয়টি দৌলত কাজির 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না' কাব্যে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, যার রেশ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত উপন্যাসে দেখা যায় |

দৌলত কাজি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও হিন্দুর সামাজিক আচার-ব্যবহার, জীবনাদর্শের মতো নানা তথ্যকে যেভাবে কাব্যটির মধ্যে স্থান দিয়েছেন তা সত্যিই অভিনব | আসলে কবির পূর্বপুরুষরা হিন্দু বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন | তাই 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না'-র মতো রোম্যান্টিক আখ্যান কাব্য রচনার সময় কবি যে পূর্ববর্তী সময়ে হিন্দুর বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত রোম্যান্টিক কাব্যকে কিছুটা অনুসরণ করেছেন তা বলাই বাহুল্য | তবে বৈষ্ণব ধর্ম নয়, পদাবলী সাহিত্যের রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের ভাব-ঐশ্বর্যই দৌলত কাজির মনকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল | আসলে দৌলত কাজি একজন মর্ত্যভূমির জীবনরসিক কবি | এজন্য কাব্যটির কাহিনী পরিকল্পনায় এবং চরিত্রের মনন-মেজাজ-মানসিকতার টানাপোড়েন উদ্‌ঘাটনে কবি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন | আর এই ভিন্ন পন্থাটাই উনিশ শতকে বাংলা উপন্যাসের সূচনা পর্বে কাহিনী নির্মাণে প্রভূত সহয়তা করেছে বলে মনে হয় |

'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না' রোম্যান্টিক আখ্যান কাব্যটির যে অংশটুকু দৌলত কাজি রচনা করেছেন তাকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি | প্রথমটি লোর-চন্দ্রাণীর আকর্ষণ-বিকর্ষণ ঘটনা সমন্বিত বিষামৃত প্রেম কাহিনী, আর দ্বিতীয়টি হ'ল স্বামী বিরহে কাতর হওয়া সত্ত্বেও ময়নার সতীত্ব রক্ষার মাধ্যমে আদর্শ নারী হয়ে ওঠার কাহিনী | একটি কাব্যের মধ্যে দুটি কাহিনীর বিচরণ বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম নয় | কিন্তু দৌলত কাজির কাব্যটি এখানে নানান কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে দুই বিপরীত দিকে এগিয়ে গেছে |

দৌলত কাজির কাব্যটির কাহিনী সংক্ষেপে এইরকম – গোহারী দেশের রাজা মোহরা | তাঁর অপূর্ব সুন্দরী কন্যা চন্দ্রাণীর সঙ্গে ভাগ্যদোষে এক নপুংসক বামনের বিয়ে হয় | এতে চন্দ্রাণী দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ে | অপরদিকে নৃপতি নন্দন রাজা লোরের সঙ্গে সতীসাধ্বী ময়নাবতীর বিয়ে হয় এবং তারা সুখে দিন কাটাতে থাকে | রাজা লোর একবার মৃগয়ায় গিয়ে এক যোগীর কাছে চন্দ্রাণীর প্রতিকৃতি দেখে মুগ্ধ হয় | এরপর তাকে লাভ করার জন্য গোহারীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এবং সেখানে গিয়ে তারা একে অপরকে দেখে আকৃষ্ট হয়ে মিলিত হয় | এরপর লোর-চন্দ্রাণীর দেবী মন্দিরে সাক্ষাৎ হয় | এসব ঘটনা দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বামন একসময় শুনতে পেয়ে লোরের বিনাশ ঘটাতে বনপথ রোধ করে | এসময় বামন ও রাজা লোরের মধ্যে যুদ্ধ হয়, বামনের পরাজয় ঘটে এবং সে প্রাণ হারায় | এরই মধ্যে চন্দ্রাণীর সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটলে যোগীবর তাকে বাঁচিয়ে দেন | রাজা লোর তখন চন্দ্রাণীকে বিয়ে করে গোহারী দেশের রাজা হয়ে সেখানেই বসবাস শুরু করে, ময়নার কথা একেবারেই ভুলে যায় |

এদিকে স্বামী বিরহে ময়না অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ে | ময়নার জীবনের এই দুঃখ-যন্ত্রণা দৌলত কাজি বারমাস্যার মধ্যে দিয়ে নানা চিত্রকল্পের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন | স্বামী সম্পর্কে ময়নার কিছুই ধারণা নেই, তাই সে নিত্য হরগৌরীর পূজা করে | এসময় মালিনীর মাধ্যমে ছাতন ময়নাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করলেও ময়না নিজ সতীত্ব দৃঢ়ভাবে বজায় রাখে | এই পর্যন্ত লিখেই দৌলত কাজি মারা যান |

কাহিনীর আলোচনা সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, কাব্যটি মানবিক প্রেম-দ্বন্দ্বের কাহিনী | এর একদিকে রয়েছে চন্দ্রাণী ও অপরদিকে ময়নাবতী – এই দুই চরিত্রের মধ্যস্থলে রয়েছে রাজা লোর | তবে চন্দ্রাণীই প্রধান নায়িকা | সে যৌবন পরিপূর্ণা এক রূপসী নারী | কাব্যটিতে রাজা লোরের সঙ্গে তার প্রেমের চড়াই-উৎরাই নানান কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে এবং উভয়েই প্রেমের বিষামৃতের স্বাদ গ্রহণ করেছে | চন্দ্রাণী বীর্যশালী বামনের স্ত্রী, কিন্তু বামন নপুংসক হওয়ার কারণে কামকেলিতে অসমর্থ –

"সর্বগুণে সম্পূর্ণ যৌবন বীর্যবল |
রতিরসহীন মাত্র কিংশুক কেবল ||" (যোগীর আগমন)

এজন্য চন্দ্রাণী বামনের বীরত্বের কথা মাথায় রেখেও নিজের কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বাড়ির দরজা ডিঙিয়ে প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে পরপুরুষকে আলিঙ্গন করেছে – সামাজিক নীতিকে এক মুহূর্তের জন্যও তোয়াক্কা করেনি | তার কাছে প্রেম শুষ্ক

মরুভূমি নয়, ভোগের মধ্যে দিয়েই সে প্রেমের স্বাদ পেতে চেয়েছে। তাই চন্দ্রাণীর স্বামী থেকেও নেই –

"স্বামীহীন নারীর কি ফল সংসার।
বিফলে বঞ্চয় নিশি রমণী যাহার ॥" (চন্দ্রাণীর খেদ)

তার কাছে এটা সত্যিই ভাগ্যের বিড়ম্বনা, কিন্তু সে কখনই দুর্ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। চন্দ্রাণী এখানে আদর্শকে দলিত করেছে এবং বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার মতো কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলে নিয়েছে। চন্দ্রাণী চরিত্রের এই কার্যকলাপ অনেকটাই আধুনিকা নারীর পরিচয় বহন করে।

মানুষকে বাদ দিয়ে যেমন সমাজ গড়ে উঠতে পারে না, তেমনি দেহকে বাদ দিয়ে প্রেম পূর্ণতা পায় না। চন্দ্রাণীর প্রেম ছিল দেহনির্ভর। এজন্য রাজা লোরের সঙ্গে তার দেহনির্ভর প্রেমেরও একটা মূল্য রয়েছে। বলা হয়, লোরের সঙ্গে চন্দ্রাণীর প্রেমের মূলে কোনও দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু কাব্যটি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে চন্দ্রাণীর প্রেমের পেছনে একটা বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে তার মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব। পাশাপাশি সামাজিক নীতির দিক থেকেও সে বেশ সচেতন। চন্দ্রাণী চরিত্রের নানান উক্তি-প্রত্যুক্তি আমাদের সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয় –

"তিল সুখ লাগিয়া হারাইলুঁ জাতিকুল।
ঘাটেত বসিয়া নৌকা ডুবাইলুঁ মূল ॥" (লোর-চন্দ্রাণীর পলায়ন)

আবার, বামনের সঙ্গে রাজা লোরের যুদ্ধ, বামনের পরাজয় ও মৃত্যু – এসব ঘটনা চন্দ্রাণীর সম্মুখে ঘটলেও নিজের বঞ্চিত জৈববৃত্তির তাড়নার ফলে সে সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করেছে। কিন্তু এসব ঘটনায় তার অন্তরাত্মা একটু হলেও কেঁপেছিল। স্বাভাবিকভাবেই লোর-চন্দ্রাণীর প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণ কখনও তাদের জীবনে অমৃতের স্বাদ এনে দিয়েছে, আবার কখনও সেই প্রেমেরই নানান কার্যকলাপ তাদের জীবনকে বিষের জ্বালায় জর্জরিত করে তুলেছে। ফলে 'লোরচন্দ্রাণী' কাব্য এক বিষামৃত প্রেম-দ্বন্দ্বের কাহিনী হয়ে উঠেছে।

চন্দ্রাণীর পাশাপাশি ময়নাবতীও দৌলত কাজির কাব্যের নায়িকা। রাজকুমারী ও রাজকুলবধূ হিসেবে তার রূপ ভুবন বিজয়ী –

"রাজার কুমারী এক নামে ময়নাবতী।
ভুবনবিজয়ী কন্যা রূপেতে পার্বতী ॥"

কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজা লোর বনবিহারে গিয়ে চন্দ্রাণীকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয় এবং তাকে বিয়ে করে সেখানেই থেকে যায়। এরূপ অবস্থায় ময়নাবতীর যে খেদ, যে বিরহজ্বালা ও আর্তির কথা আমরা জানতে পারি তা তার উক্তি-প্রত্যুক্তি, আচার-ব্যবহারেই ধরা পড়েছে। আষাঢ় মাস থেকে ময়নার বিরহ-জ্বালার চিত্রকে দৌলত কাজি তুলে ধরেছেন –

"প্রথম বারিষা দেখ প্রবেশে আষাঢ়।
বিরহিণী বিরহ বাড়য় অতি গাঢ় ॥"

ক্রমে শ্রাবণ মাস এসেছে, কিন্তু তবুও ময়নার বিরহের কোনো প্রশমন ঘটেনি। এভাবে প্রতিটি মাসে ময়নার বিরহ-বেদনাতুর হৃদয়ের কথা কবি 'সতীময়না' কাব্যে তুলে ধরেছেন। কার্তিক মাসের ঘটনা সম্পর্কে মালিনী ময়নাকে বলেছে –

"কার্তিকেত কান্ত তোর গেল দিগন্তর।"

অগ্রহায়ণে রাধার হতাশা –

"অন্তরে আগুন দিয়া দিগন্তরে কান্ত।"

তবু ময়না অন্য কোনো পুরুষের কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারেনি। কারণ, তার কাছে পতিভক্তিই প্রধান। এজন্য মালিনীর মাধ্যমে ছাতনের পাঠানো প্রস্তাবকে ময়নাবতী ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মালিনীকে বলেছে –

"মালিনী না বোল অনুচিত বাণী।
ধরম না চাহসী তেজি সতীত্ব মতি
লোর প্রেমে করাওসি হানি ॥"

শুধু তাই নয়, মালিনীকে 'পাপিনী', 'পাতকী', 'ঘাতকী' বলতেও ময়না কুণ্ঠা বোধ করেনি। এতকিছুর পরেও মালিনী যখন নাছোড়বান্দা তখন ময়না নিচু সুরে নিজের অন্তর বিদীর্ণ ভাবের কথাই জানিয়েছে –

"মালিনী মোর মনে আন নাহি তায়।
নয়নের জল দিয়া সে পদ ধোলাইমু গিয়া
যদি বিধি সে বন্ধু মিলায় ॥"

ময়নার এই উক্তি থেকে স্বামীর প্রতি তার প্রেমের একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বামী বিচ্ছেদের কারণে প্রতিটি নারীহৃদয় দুঃখ-যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়। এরূপ অবস্থায় সেই দুঃখের অগ্নিকুন্ডে যদি কেউ ঘি ঢেলে দেয় তাহলে সেই নারীর বিরহ-জ্বালা আরও শতগুণে বেড়ে ওঠে। এসময় কোনো নারীর পক্ষে নিজের

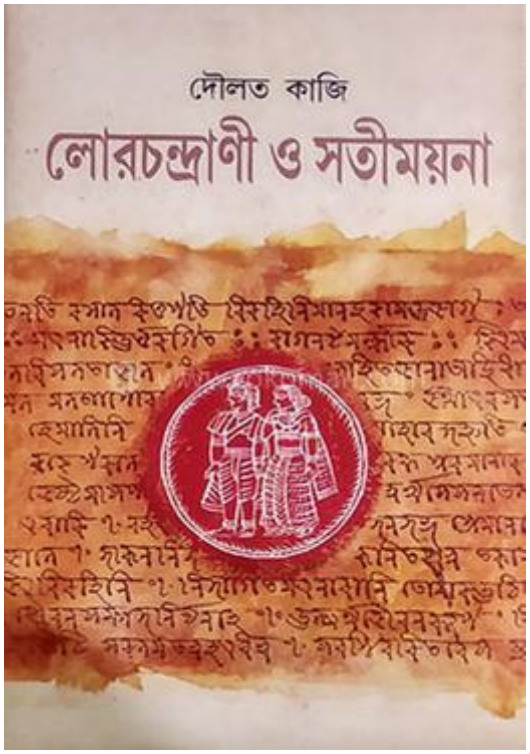
অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না | ময়নার জীবনেও এরকমটাই ঘটেছিল, দুঃখের দাবানলে মালিনী ঘি ঢেলেছিল | কিন্তু ময়না তবুও টলেনি – সেইরকম চরম মুহূর্তেও সে অটল থেকেছে এবং বছরের প্রতিটি মাসে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেও স্বামী লোরের ফিরে আসার অপেক্ষায় দিন গুনেছে | ময়নাবতীর এহেন কার্যকলাপ দেখে মনে হতে পারে সতীত্ব রক্ষা করাই তার প্রধান কাজ – আসলে তা নয়| তার হৃদয়েও প্রেম রয়েছে, কামনা বাসনা রয়েছে, স্বামীহীন অবস্থায় সেও মদনজ্বালায় ছটফট করেছে | কিন্তু সবকিছুই সে সংযমের মাধ্যমে পেতে চেয়েছে| যৌবন-বেদনা তার আছে, স্বামীসঙ্গ তার কাম্য; আবার সতীত্ব ধর্ম আছে; এর জন্য সে জীবনপাত করতে প্রস্তুত কিন্তু বিপথগামিনী হতে রাজী নয়|

দৌলত কাজির 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না' কাব্যের কাহিনী এবং চন্দ্রাণী ও ময়নার চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটাই বোঝা যায় যে চরিত্র দুটির মেজাজ ও মানসিকতা সম্পূর্ণ ভিন্ন| চন্দ্রাণীর প্রেমে কামনা বাসনাই বড় হয়ে উঠেছে | কারণ শক্তিশালী স্বামী বামন হলেও সে চন্দ্রাণীর মদনজ্বালা প্রশমিত করতে অক্ষম | তাই সমাজকে পেছনে ফেলে বাড়ির দরজা অতিক্রম করে সে রাজা লোরকে সাদরে গ্রহণ করেছে| চন্দ্রাণী চরিত্রের এই স্বভাব বৈশিষ্ট্য আধুনিক সামাজিক সাহিত্যের যে কোনও নায়িকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনীয়|

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে একজন বধূর বিনা অনুমতিতে ঘোরা-ফেরার অধিকার থাকে বাড়ির দরজা পর্যন্তই | বাড়ির বাইরে বেরোতে গেলে তাকে স্বামী বা অন্য কোনও গুরুজনের কাছে অনুমতি নিতে হয়, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বেরোতেই দেওয়া হয় না | সমাজে আদর্শ নারীরূপে যাঁরা পরিচিত তাঁরা বাড়ির দরজা ডিঙিয়ে পরপুরুষ তো দূরের কথা, অন্য কোনও প্রয়োজনীয় কাজেও বিনা অনুমতিতে বাড়ির বাইরে যেত না | ময়না এরকমই বাঙালি ঘরের এক 'আদর্শ সতী নারী'| তার সতীত্বের কারণেই কাহিনীর অগ্রগতি এখানে সম্পূর্ণভাবে গৃহমুখী হয়ে পড়েছে|

ডঃ মহুয়া ষন্নিগ্রহী সম্পাদিত 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না' কাব্যের প্রবেশক অংশে অধ্যাপক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন – "লোরচন্দ্রাণী' মানবিক প্রেম-দ্বন্দ্বের কাহিনী| অনেকটা একালের উপন্যাসের মতো| নেহাৎ পদ্যে লেখা, নাহলে এটিকে মধ্যযুগের ভালো প্রেমমূলক উপন্যাস বলে চালিয়ে দেওয়াই যেত|"

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে ক্ষুধা নিবৃত্তি, মাথা গোঁজার জন্য আচ্ছাদনের ব্যবস্থা আর শরীরের জৈবিক চাহিদা পূরণ – এই তিনটি প্রাথমিক লক্ষ্যকে সামনে রেখেই মানব সভ্যতার বিবর্তনের ধারা এগিয়ে চলেছে | সভ্যতার গতি প্রকৃতি যতই পরিবর্তিত হোক না কেন ভালোবাসার মোড়কে শৃঙ্গার রসের প্রেমকাব্য আজও প্রবহমান|



আশ্চর্য ও করুণ

ডাঃ শান্তনু মিত্র

আশ্চর্য

কী আশ্চর্য কথা! এ কি হতে পারে! সবাই মিলে আমরা জনা চল্লিশ মানুষ ঢুকে যাব একটা বিশাল লবণের ক্রিস্টালের মধ্যে? তাও আবার মাটির প্রায় আশি মিটার নিচে! এও কি কখনো সম্ভব! হ্যাঁ পুরোপুরি সম্ভব। কোনও রূপকথা বা হ্যারি পটারের গল্প নয়।

পূর্ব ইউরোপ বেড়াব বলে দুহাজার চব্বিশ সালে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন বার্লিন শহরে এসে পৌঁছালাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বার্লিনের আবহাওয়া এই সময় বেশ আরামদায়ক। ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। হালকা জ্যাকেট পরেছিলাম। তিনদিন বার্লিন শহর দেখার পর একদিন সকাল ন'টায় হোটেলের বাফেতে পেট পুরে খেয়ে তল্পিতল্পা নিয়ে একটি মনোহর বাসে করে আমরা রওনা দিলাম প্রায় দু'সপ্তাহের এই ট্যুরে। রোদ ঝলমলে সুন্দর সকাল। চারিদিকে শুধু সবুজের মেলা। এত সবুজ আমি আমার দেশেও বোধহয় দেখিনি। তারই মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের এই মার্সেডিস বাস। ভেতরে বিভিন্ন প্রদেশের শুধু ভারতীয়রা রয়েছি। সব মিলিয়ে আমরা প্রায় চল্লিশজন। অল্প কয়েকজন ছাড়া বেশির ভাগই আমাদেরই বয়সী।

বাসের একদম সামনে কন্ডাকটিং স্পিকার ছিল। ঘুচে গেল বয়স এবং ভাষার ব্যবধান। চলন্ত বাসে এক এক করে প্রত্যেকে নিজের পরিচয় প্রকাশ করলেন। তারপরই শুরু হয়ে গেল পালা করে গান, আবৃত্তি,গল্প। সবাই মিলেমিশে একটি পরিবার হয়ে যেতে আমাদের বেশি সময় লাগল না। এই বাসে করেই আমরা সবাই মিলে ঘুরলাম জার্মানি, চেক রিপাবলিক, পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, ক্রোয়েশিয়া আর স্লোভেনিয়া। এ স্মৃতি ভুলবার নয়।

চেক রিপাবলিক ঘুরে আমরা এলাম পোল্যান্ডের পুরোনো রাজধানী ক্র্যাকো শহরে। এই শহরেই একটি জায়গার নাম Wieliczka (উচ্চারণের দায়িত্ব আপনার)। এইখানেই দেখলাম সেই অবিশ্বাস্য জিনিসটি। Wieliczka Salt Mine...

পোল্যান্ড বর্তমানে একটি "জমিবদ্ধ দেশ" বা Landlocked Country, অর্থাৎ আজকে এর কোনও দিকেই সমুদ্র নেই। কিন্তু বহু লক্ষ বছর আগে ব্যাপারটা ছিল একেবারে অন্য রকম। এই অঞ্চল পুরোপুরি ছিল সমুদ্রের জলের তলায়। এর বহু প্রমাণ ভূতত্ত্ববিদরা পেয়েছেন। অনেক সামুদ্রিক জীবের ফসিল এখানকার মাটিতে উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক প্রমাণটি হ'ল মাটির নিচে এই লবণের পর্বতটি। সেই সমুদ্রের জলের লবণ জমে মাটির বহু নিচে তৈরি হয়েছিল এক বিশাল লবণ স্ফটিক। অতি বিশাল। মাটির 327 মিটার নিচে পর্যন্ত পৌঁছেছে এর গভীরতা। পাশাপাশি গেছে 287 কিমি। গত সাতশ বছর ধরে লবণ সরবরাহ হয়েছে এই বস্তুটির থেকেই। অবশেষে 1996 সালে এই খনি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এটিকে একটি মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়। UNESCO এটিকে একটি World Heritage Site বলে তকমা দেয়।

একটি সুন্দর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। তার গায়ে রয়েছে একটি বিশাল কপিকল। রংচং করা। স্পষ্টতই সেটি এখন একটি শো-পিস মাত্র। এই বাড়ির ভেতরেই একটা Z আকৃতির কাঠের সিঁড়ি ধরে আমরা মাটির নিচে নামতে শুরু করলাম। বেশ সুন্দর দেখতে সিঁড়ি। হালকা আলো দেওয়া আছে। হাওয়া বাতাসের অভাব নেই। কিন্তু আলো আঁধারিতে এবং অল্প নুনের গন্ধে একটা গা ছমছমে ভৌতিক পরিবেশ সেখানে। চল্লিশজন মিলে নিচে নামছি। বেশ লাগছে। নামছি তো নামছি... নেমেই চলেছি কোন অতল গর্ভে কে জানে! সঙ্গে গাইড আছে। সে ইংরেজিতে যা বলছে তার মানে হ'ল – "আপনারা এখন এক প্রকান্ড লবণের স্ফটিকের মধ্যে প্রবেশ করছেন। দেওয়ালের যে কোনও জায়গা লেহন করে দেখুন নোনতা স্বাদ পাবেন।" রক্ষে করো, না, লেহন করলাম না। দেওয়ালের ঠিক ঐ জায়গাটাতেই আর একজন সেই কাজটি করে গেছেন কিনা তার স্থিরতা আছে কী?

তিনশো সিঁড়ি নামার পর খবর পেলাম আমরা মাটির প্রায় পঞ্চাশ মিটার নিচে নেমেছি। কিন্তু অর্ধেক নামা হয়েছে। আরও তিনশো সিঁড়ি বাকি। কিন্তু ততক্ষণে পরিশ্রম সফল হতে শুরু করেছে। এখন আমরা একটা সমতল আঁকাবাঁকা টানেলে এসে নেমেছি। আধো অন্ধকারে টানেল দিয়ে হেঁটে চলেছি। চারিদিকে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে সাপোর্ট সিস্টেম করা

আছে | আমরা এঁকে বেঁকে তার ভিতর দিয়ে হাঁটছি | কখনো সিঁড়ি দিয়ে আরো নামছি | কখনো এসে পড়ছি বড় ফাঁকা চেম্বারের মতো জায়গায় | খুব সম্ভবত একসময় এগুলি ছিল এয়ার পকেট | তারই চারদিকে কত মূর্তি | সবই নুন খোদাই করে করা | কোথাও বর্ষা হাতে সৈনিক | কোথাও কয়েকজন মিলে নাটক করছে | পৃথিবী হাতে দাঁড়িয়ে আছেন কোপারনিকাস | তার নিচে এবং নানান মূর্তির সঙ্গে যে যেখানে পারছে সেলফি নিচ্ছে | দুপাশে দেওয়ালে রয়েছে পরপর লবণ কেটে নানান বিষয়ের reliefs... অল্প আলো দিয়ে সেগুলি দেখানো আছে |

তারপর এল ছোট ছোট দোকানের মতো সব ঘর | তাতে রয়েছে মানুষ, টেবিল-চেয়ার, ফুলদানিতে ফুল – আরো কত কী! সবই লবণ খোদাই করে করা | আলো আঁধারিতে এক অপরূপ পরিবেশ | যত এগোচ্ছি দুপাশ প্রশস্ত হচ্ছে | মনে হচ্ছে যেন কোনো mall-এ এসেছি | এরই মধ্যে মাঝে মাঝেই সিঁড়ি দিয়ে একটু একটু করে আরো নিচে নেমে চলেছি | সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করল বড় বড় নুনের প্রিজম ভর্তি ঝাড়লণ্ঠন,



উপর থেকে ঝুলছে | বেশ বড় বড় | প্রিজমের ভিতরে বাল্ব আছে, সেসব ঝলমল করে আলো দিচ্ছে | পুরোটাই নুন দিয়ে তৈরি | অভিভূত না হয়ে উপায় নেই |

এগিয়ে চলেছি | হঠাৎ দেখি চারিদিকে নুনের দেওয়াল ঘেরা এক বড়সড় জলাশয়ের পাশে আমরা এসে পৌঁছেছি | সে এক অভাবনীয় দৃশ্য | মাটির প্রায় আশি মিটার নিচে এত জল কোথা থেকে আসছে কোথায় যাচ্ছে একমাত্র ঈশ্বরই বোধহয় জানেন | অবশেষে এক বিশাল হলঘরে এসে পৌঁছালাম | মনে হ'ল যেন কোন চার্চের মধ্যে এসে পড়েছি, সেখানে ছাদ অনেক উঁচুতে | চারিদিকে বড় বড় show room.... তাতে কত মূর্তি | বাইবেলের নানান উপাখ্যান দেখানো হয়েছে | খুব বড় করে দেখানো আছে The Last Supper.... নুন খোদাই করা | খাবার দোকান রয়েছে, সাধারণ দোকানও রয়েছে | এগুলি আসল | হলঘরের মাঝে লম্বা, গোল নানান ধরনের টেবিল | সেখানে বসে খাওয়া দাওয়া করা যেতে পারে | অবশ্য আমার মতো সাধারণ বাঙালির কাছে এখানে খাবারের দাম বেশ খানিক নাগালের বাইরে | গোটা হলভর্তি ট্যুরিস্ট | চারিদিকে হৈহৈ, গান-বাজনা... মনে হচ্ছে যেন কোনও সুপার মার্কেটে এসে দাঁড়িয়েছি | বুঝবার উপায় নেই যে আমরা রয়েছি মাটির প্রায় আশি মিটার নিচে একটি নুনের চাঁইয়ের মধ্যে |

প্রায় ঘন্টা দুই-আড়াই এখানে কাটানোর পর এবার ফেরার পালা | না, ভগবানের কৃপায় এই ছশো সিঁড়ি বেয়ে আমাদের উঠতে হ'ল না | Lift পাওয়া গেল | ছোট কাঠের খুপরির মতো lift | বেশ গাদাগাদি করে এবং পালা করে তাতে আমরা উঠলাম | পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসতে সময় লাগল মিনিট তিনেক |

মুক্ত হাওয়াতে এসে বুক ভরে বাতাস নিলাম | মনে মনে বললাম মাই ডিয়ার প্রকৃতি | তোমার মতন সুন্দরী আর কে আছে!

করুণ

দুহাজার পঁচিশ সালে মে মাসের মাঝামাঝি একদিন ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছালাম ইটালির নেপলস শহরে | পৃথিবীর ইতিহাসে এই শহরটি একটি ভয়াবহ এবং অতি করুণ কাহিনীর ঘটনাস্থল |

যীশুখ্রিস্ট মারা যাওয়ার ঊনআশি বছর পরে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দুহাজার বছর আগের ঘটনা | নেপলস-এ ভিসুভিয়াস পর্বতের গোড়ায় ছিল প্রায় ছশো বছরের পুরোনো ধনসম্পদ এবং আভিজাত্যে ভরা অতি সুন্দর দুটি শহর, পম্পেই এবং হারকিউলেনিয়ম | তথাকথিত বড়লোকেরাই এখানে থাকতেন | আশেপাশে অবশ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে অন্য নামে অল্প কিছু বসতিও এ অঞ্চলে ছিল |

এই হতভাগ্য শহর দুটিতে 79 সালের চব্বিশে অগাস্ট (24th August 79 AD) দিনটি শুরু হয়েছিল একটি স্বাভাবিক কর্মব্যস্ত সকাল দিয়েই | অবশ্য কয়েক মাস ধরে মাঝে মাঝেই ভূমিকম্প হচ্ছে | তা, সে তো এ অঞ্চলে হয়েই থাকে | তাই কেউ এতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা ভাবেনি | কেউই

বোঝেনি যে মাথার উপরে দাঁড়িয়ে থাকা ভিসুভিয়াস পাহাড়ের নিচে ধরণী গুমরে উঠছে। যখন জানা গেল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তখন দুপুর একটা। পনেরো হাজার মানুষের এই শহরে তখন লাঞ্চ খাওয়ার সময়। উনুনে রুটি সেঁকা হচ্ছে। হঠাৎ প্রচন্ড শব্দে ভিসুভিয়াসের চূড়ো দিয়ে ফোয়ারার মতো আকাশের দিকে উঠতে শুরু করল লক্ষ লক্ষ টন অতিউষ্ণ



ছাই (Super-heated Pyroclastic), গ্যাস এবং পাথর কুচি (pumice) । তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই এগুলি মুষলধারে বৃষ্টিপাতের মতো পড়তে শুরু করল শহর দুটির উপর । এত আকস্মিক এবং এত দ্রুত গতিতে এই প্রলয় শুরু হয়েছিল যে, কেউ কিছু ভাবার অবকাশ পেল না। দুদিন ধরে চলল এই মৃত্যুবৃষ্টি এবং দুদিনেই প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু গরম ছাইয়ের নিচে চিরকালের জন্য চাপা পড়ে গেল দুটি সুন্দর শহর – হারকিউলেনিয়ম এবং পম্পেই। না, কেউ রক্ষা পেল না। শিশু বৃদ্ধ নারী পুরুষ সকলের জীবন্ত কবর হয়ে গেল মাত্র দুদিনে। পম্পেই ভিসুভিয়াসের কাছে হওয়ায় এই শহরের কবর হ'ল সবার আগে এবং পুরোপুরি।

কেটে গেল দেড় হাজার বছর। 1600 সাল নাগাদ এই বিশাল ধ্বংস্তূপ প্রত্নতাত্ত্বিকদের নজরে এলেও প্রকৃত খননকার্য শুরু হয় 1800 সালে। এইবারে পৃথিবীর চোখে ধরা পড়ল কী ভয়াবহ এবং করুণ ছিল সেই শেষের দুটি দিন। কেউ বাঁচেনি। কেউ কেউ পাগলের মতো পরিবার নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছে। পারেনি। কোথাও দল বেঁধে লোকে মাটিতে কুঁকড়ে শুয়ে আছে, কেউ বা উনুনে রুটি সেঁকতে সেঁকতে চাপা পড়েছে। মা শিশুকে নিজের পুরো শরীর দিয়ে ঢেকে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। যে যেখানে, যে অবস্থাতে ছিল সেই অবস্থাতেই গরম ছাইয়ে চাপা পড়েছে। সময়ের সঙ্গে ছাইয়ের মধ্যে থেকে মানুষের দেহাবশেষগুলি সব অদৃশ্য হয়েছে; রয়ে গেছে দেহের ছাঁচগুলি। ভূতত্ত্ববিদরা এই ছাঁচে প্লাস্টার অফ প্যারিস ঢেলে দেহগুলির অবিকল মূর্তি তৈরি করেছেন। এখানকার মিউজিয়ামে কাঁচের বাক্সের মধ্যে মৃত্যু যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া এই হৃদয় বিদারক মূর্তি রাখা আছে। ভগবানের অভিসম্পাত কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তা এখানে এলে বোঝা যায়।

এরপর বহু দিনের পরিশ্রমে পুরোনো ছাই খুঁড়ে ধীরে ধীরে বের করা হয়েছে সম্পূর্ণ পম্পেই শহরকে। 1997 সালে এই জায়গাকে UNESCO World Heritage Site বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

সেদিন এই করুণ ইতিহাসের মধ্যে আমরাও গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘুরে দেখলাম সেই শহর। রাস্তা, দোকান-বাজার, লোকেদের বাড়ি, সবই রয়েছে। কিন্তু ছাদ নেই। চমৎকার ফুটপাথ। কত গলি, কত রাস্তা। সুন্দর একটি গোল পাথরের গ্যালারিওয়ালা স্টেডিয়াম। বিরাট বড় বাজার। এমনকি লালবাতি অঞ্চলও দেখলাম। রাস্তায় গাড়ির চাকার গভীর দাগ। অর্থাৎ, গাড়িতে প্রচুর জিনিসপত্র বা অনেক মানুষের যাতায়াত ছিল। সময়ের সাথে জমে শক্ত হয়ে যাওয়া ছাই খুঁড়ে যতটা সম্ভব এগুলি জনসমক্ষে আনা হয়েছে। জনসভার জন্য রয়েছে বিরাট একটি চত্বর। তার একদিকে স্টেজ। একসময় চারিদিক সুন্দর প্রাচীর আর ভাস্কর্য দিয়ে ঘেরা ছিল আন্দাজ করা যায়। এর বেশিরভাগই ভেঙে গেছে।

বিকেল গড়িয়ে এসেছে। গোধূলি আলোয় সেই চত্বরে এই মুহূর্তে কত ট্যুরিস্ট, ছেলে-মেয়ে, প্রেমিক-প্রেমিকা মহানন্দে সেলফি তুলছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশ জমজমাট হৈহৈ পরিবেশ! দু'হাজার বছর আগে সেলফি ছিল না কিন্তু বাকিটা নিশ্চয়ই এই রকমই আনন্দের ছিল। স্টেজের পিছন দিকে দূরে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নির্লিপ্ত ভিসুভিয়াস। কবে আবার ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে তা একমাত্র সে নিজেই জানে।

বিদায় নেবার আগে একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আর একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। চতুর্দিকে শুধুই ধ্বংসের ছবি। চোখ ভিজে যাওয়া অসম্ভব নয়। তারই উপর দেখতে পেলাম প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে আবার ফুটেছে কত সুন্দর সুন্দর ফুল।

নতুন বইয়ের গন্ধ, মামার-বাড়ি ও দুর্গাপুজো

সুশোভন মুখোপাধ্যায়

নতুন বইয়ের গন্ধ, মামার বাড়ি আর দুর্গাপুজো আমার কাছে যেন একাকার হয়ে আছে। তার অবশ্য একটা কারণ আছে। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত আমাকে মামার বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। সে সময়, আমার বড় মামিমা পয়লা বৈশাখ আর মহালয়ায় বাড়ির ছোটদের একটি গল্পের বই উপহার দিতেন। তার মধ্যে আমিও ছিলাম। বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় লিখে দিতেন ১লা বৈশাখ বা মহালয়া, আর সেই বছরের সালটি। নতুন বইয়ের গন্ধটা কী যে ভাল লাগত!

বিশেষ করে মহালয়ার ভোরে, বড়মামার ঘরে সবাই মিলে বসে রেডিওতে মহালয়া শোনার পর, বড় মামিমার কাছ থেকে পাওয়া নতুন বইয়ের গন্ধে মনের মধ্যে পুজোর আনন্দ এসে যেত। সুন্দর, ঝকঝকে প্রচ্ছদের নতুন বই হাতে পেয়ে খুশি যেন বাঁধ মানত না। আজকাল নতুন বইয়ের মধ্যে যেন সেই গন্ধটি তেমন করে পাই না। সে গন্ধটি যেন বুকের মধ্যে রয়ে গেছে, যখনই গন্ধটি পাই, মুহূর্তে মনটা চলে যায় মামার বাড়ির সেই পুজোর দিনগুলিতে।

মামার বাড়ি ছেড়ে আসার সময় আমার বইগুলি সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারিনি, কিন্তু সঙ্গে করে যা এনেছি, তা সারা জীবনের সম্পদ হয়ে আছে। মামার বাড়িতে সেই যে বই পড়ার অভ্যেস তৈরী হয়ে গিয়েছিল, তা আজও রয়ে গেছে। কলকাতার বই প্রকাশের অন্যতম পীঠস্থান কলেজ স্ট্রীটকে কেন্দ্র করেই আমার দৈনন্দিন জীবন, উপার্জন। এখন কত বই লিখি, অনুবাদ করি, সম্পাদনা করি, চারপাশে সব সময়ই নতুন বই। এই সব বইয়ের মাঝেই বারবার খুঁজে নিতে চাই মামার বাড়ি থেকে পাওয়া সেই সব হারানো বইয়ের গন্ধ। কোথাও লীলা মজুমদারের হলদে পাখির পালক, কিংবা অবনীন্দ্রনাথের নালক বা বুড়োআংলা চোখে পড়লেই মনে পড়ে যায়, এই বইগুলোর সাথেই বড় মামিমা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সেই কোন কিশোর বেলায়। সেদিন এইসব বইয়ের হাত ধরে যে মায়া জগতে ঢুকে পড়েছিলাম, আজও সেই সেদিনের কিশোর মন ঘুরে বেড়ায় সেই জগতে, নতুন বইয়ের গন্ধ আর তার ভিতর দিয়ে পুজোর স্মৃতি বুকে নিয়ে।

শুধু তাই নয়, এই আনন্দের আরও একটি ফল্গুধারা ছিল। বড়মামা-মামিমার দুই মেয়ে, আমার বড়দি আর মেজদি; মালবিকা আর সাগরিকা। শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিল তারা। দিদিরা পুজোর সময়ে বাড়িতে আসত, আর তাদের আসার সাথে সাথে আমাদের ভাইবোনেদের আনন্দ যেন দ্বিগুণ হয়ে যেত। দিদিদের বন্ধ ঘরের দরজা খুলে যেত, আমরা যেন এক অন্য আনন্দ জগতে পৌঁছে যেতাম। দিদিদের ঘরেই নতুন বইগুলো রাখা থাকত। আমরা ভাইবোনেরা সবাই জড়ো হতাম দিদিদের ঘরে। বড়দি-মেজদি গান গাইত, বড়দি সেতারও বাজাত। দিদিদের ঘরেই রেকর্ড প্লেয়ারে প্রথম শুনেছিলাম, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের দরাজ গলায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের রানার আর সলিল চৌধুরীর গাঁয়ের বধূ গানদুটি। কতবার যে শুনেছি। তার পরেও কতবার রানার শুনেছি, বড় প্রিয় গান। এ বছর সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম শতবর্ষে মনে হচ্ছে, এতদিন পরেও দিদিদের ঘরে শোনা তাঁর রচিত সেই গানটির অনুরণনই যেন কানে লেগে আছে সারা জীবন।

এমনি করেই নতুন বইয়ের গন্ধ, নতুন গানের সুর, ষষ্ঠীতলায় ঢাকের আওয়াজ, সবাই মিলে ঠাকুর দেখতে যাওয়া, সব মিলিয়ে মামার বাড়িতে পুজোর দিনগুলি কাটানোর এক বিশেষ অনুভূতি আমার মনের মধ্যে একটি বিশেষ জায়গা নিয়ে আছে।

মাঝে মাঝেই সেইসব দিনগুলি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যেখানে ইচ্ছা থাকলেও আর ফিরে যাওয়া যায় না। তবু ভাল লাগে, যখন দেখি, আমার বড়দি মালবিকা, সুদূর মার্কিন দেশে বসেও, বাংলা পত্রিকা সম্পাদনা করে, লেখার জন্য আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে, তখন খুব, খুবই ভাল লাগে, সেই সম্পর্কের সুতোটিকে ধরতে পেরে। বুকের ভিতর কিশোর আবেগ উথলে ওঠে।



লিখতে বসেছি মামার বাড়ির পুজোর দিনগুলির কথা – সেই বিশেষ অনুভূতি মামার বাড়ির দিদিরা ও ভাইবোনেরাই কেবল আমার মতো করে উপলব্ধি করতে পারবে।

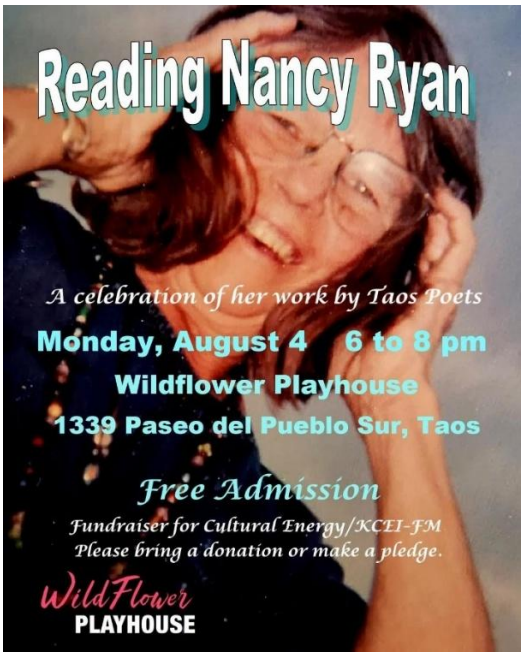
কবি না কবিতা

উদ্দালক ভরদ্বাজ

প্রতিদিন কিছু কবিতা খুঁজে পড়ার চেষ্টা করি আমি। এরকমই খুঁজতে খুঁজতে পেলাম Nancy Ryan নামে এক কবির একটি কবিতা। পড়ে ভাল লাগল, বিশেষত শেষ লাইনটা। শীতের ইতালি বর্ণনা দিতে গিয়ে উনি বলছেন "I hear the tear of frost where pear trees / Lean in a wind white with your breath".

বেশ লাগল উপমাটি। অনুবাদ করব, ইমেলে নিজেকে পাঠিয়ে রাখলাম। দু লাইন করেও ফেললাম অনুবাদ –

"আমি শুনি, বরফ-শীতল শিরশিরে হাওয়ার বাঁশী,
নুয়ে পড়া নাসপাতি গাছ, তোমার নিঃশ্বাসে সাদা।"



তারপর কবিকে খুঁজতে গিয়ে জানলাম কবি চলে গেছেন। গতবছর। শেষ বয়সে, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে, বন্ধুদের ডাকতেন কবিতা এডিট করে দিতে এবং পড়তে। সেটা একটা ক্রম হয়ে গিয়েছিল। দেখলাম সেই বন্ধু গোষ্ঠীর একটি বিজ্ঞপ্তি। কবির কবিতা পড়ার সিরিজের শেষ সভার আহ্বান।

মৃত্যু কার, কবির না কবিতার কবির মৃত্যুর পর সভা হবে শেষবার? একথা পড়ে বড় অদ্ভুত এক ভাবের উদয় হ'ল। ভাবলাম কবি তো চলে গেলেন, তাঁর শব্দগুলি এবারে কোথায় থাকবে? তাঁর বইয়ের পাতায় নিশ্চয়ই। কিন্তু এই যে বন্ধুরা পড়ছেন, পড়ছিলেন, সেই উদ্বায়ী ধ্বনির কী গতি? শুনি তো তরঙ্গেরা চিরস্থায়ী। শুধু ক্রমহ্রস্বমান বিস্তারে ধেয়ে যায় নিখিলের পানে। মৃত্যু নেই তাদের। সে তরঙ্গ কি কবির আত্মাকে কোথাও গিয়ে ছোঁয়? তাঁর কি তখন মনে আছে, একদিন কী অসম্ভব আনন্দ বেদনার তরঙ্গে দুলে তিনি লিখে ফেলেছিলেন শব্দবন্ধ। অজান্তে গেঁথেছিলেন তাঁর অকথিত জীবনমালা, আর এক অজানা উদ্বায়ী অস্তিত্বের পায়ে করুণ সমর্পণে কিম্বা নিদারুণ অভিমানে। সে অভিমান, সে নিশ্চুপ, সরব ভাবরাশি কোথায় যায়? কবিতার শরীরে কি সত্যিই লেগে থাকে সেইসব মায়াবী অশ্রুর ঘ্রাণ, সহর্ষ শীৎকার? এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে লিখে ফেললাম নিচের কবিতাটি।

কবি ও কবিতা

কবির মৃত্যু হলে
কবিতারও মৃত্যু হয় তাঁর
মৃত্যুর পিঠোপিঠি দু'চার মাস চর্চা হয়
ছবি চালাচালি, ফেসবুক পোস্ট, ব্লগ ইত্যাদি
তারপর ক্রমে ক্রমশ ম্রিয়মাণ জনতা
ভুলে গিয়ে বিষণ্ন কবিকে (মৃত্যু তো বিষণ্নতা আনে)
ধেয়ে যায় নতুন, তরুণ, জ্যান্ত কবির কবিতায়
পড়ে, দেখে, মিলিয়ে নিয়ে জীবন, কবিতা
নানাবিধ ব্যস্ততায়, শান দেয় পাঠক প্রতিভা

শুধু কবির দু'একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পাঠক, সহকবি
বৎসরান্তে একত্রিত হন, তাঁর কবিতা পড়তে
কবিতার শরীরে কবির ঘ্রাণ, কবিতার ছন্দে কবির পালক মন
কবি উড়ছেন কবিতার পাখায়, কবির বন্ধুরা দেখছেন
কবিতার শিকড় ছিঁড়ে কবি ভেসে যাচ্ছেন, দূরে দিগন্তরেখায়
তাঁর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিঁড়ে পড়ছে শব্দ,
উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়...

আর সেই খণ্ড খণ্ড ছিন্ন, বিস্রস্ত শব্দ কুড়িয়ে নেয় এক বালক,
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, ভোরের আলোয় কেমন ঠিকরে যায়
তাদের জ্বলন্ত দ্যুতি
খুশি মনে সেই শব্দের আরক মেখে বসে সে
আহরণে, আচমনে, আনন্দ ক্ষরণে...

কবি তখন অনেক দূরে
তাঁর পালক শরীর ভাসছে ভাষাহীন চেতনায়, বাধাহীন শূন্যতায়
ফেলে আসা শব্দদের ভার নেই
কলমের কালি শুকিয়ে যাওয়ার, জীবনে বাতি নিভে আসার
সঙ্গতৃষ্ণার খিদে মিটে আসার, কোন যন্ত্রণা, কোন বিষণ্ণতা,
কোন আফসোস নেই

যে শব্দ হারিয়ে যায়, সেই শব্দ খুঁজে পায় অন্য প্রাণ
অন্য খিদে, অন্য নিবৃত্তি তার, শব্দ তবু জুড়ে রাখে
কবিতা জন্ম নেয়, নবজন্ম, জেগে থাকে প্রাণ
অনন্তের গায়ে, কবিতা পাড়ায়

শেষ কবিতা:

যে সব কবি চলে গেছেন তাঁদের কবিতা পড়তে গিয়ে অনেক সময়েই আমি খুঁজতে যাই তাঁদের শেষ এবং প্রথম কবিতা। মানুষ হিসেবে, কবি হিসেবে তাঁরাও তো নিত্যই বদলে বদলে গিয়েছিলেন, যান। প্রকাশের ভাষায় কি সেই পরিবর্তন ধরা পড়ে? জীবনের শেষে লেখা কবিতাগুলির রঙ কি ক্লান্তির রঙ? নাকি তখনো কল্পনার সজাগ তুলিতে কবি বুনে চলেছেন স্বপ্নের গাথা? শেষ কবিতার প্রসঙ্গে মনে পড়ল হঠাৎ চার বছর আগে একদিন এই কবিতাটা লিখেছিলাম। কেন জানি না। লিখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কেউ কি চলে গেলেন? পরিচিত কেউ যাননি; তবু যেন খুব চিনি মনে হল ওঁকে। যার মৃত্যু আর শেষ কবিতার ছবি আঁকল আমার কলম।

রোদ

তবু সেই কবিতায় রোদ পড়েছিল
জানলার পাশে রাখা লেখার খাতা
সারারাত জ্যোৎস্নার চাঁদ আর মৌসুমি হাওয়া
তাকে আদর করেছে
কবি ছিলেন চেয়ারে আসীন
তিনিও দেখেছেন কী করে পাতা উল্টে উল্টে
হাওয়া এসে হাত রাখছে কবিতার শরীরে

শেষ রাতে বুকে ব্যথা
ধড়ফড় করে উঠতে গিয়ে
চেয়ার থেকে পড়ে গেলেন কবি
অন্ধকার মেঝেতে ছিটকে পড়ল চশমাটা কোথাও
খানিক হাতড়ালেন, ব্যথা বাড়ছে
ফোনটাই বা কোথায়, আজ আবার কাজের নার্সটি
ছুটি নিয়েছে, তার মায়ের শরীর খুব খারাপ
বাড়িতে সোমত্ত মেয়ে, ক'দিন আগেই বাবা চলে গেছেন
এমতাবস্থায় বাড়ি না ফিরলেই নয়...

জানলা দিয়ে তখনো ঝাঁকে ঝাঁকে ঢুকে পড়ছে হাওয়া
কবি কাৎ হয়ে এদিক ওদিক হাত নেড়েও পেলেন না
ফোন বা জলের গ্লাস
ব্যথা বাড়ছে, কবি মেঝেতে শুয়ে শুয়েই টের পাচ্ছেন
হু হু করে হাওয়া ঢুকছে ঘরে
মেঝেতে চাঁদের আলো লুটোপুটি খাচ্ছে
একবার মুখ ফিরিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলেন
এক চিলতে জানলার মাঝ দিয়ে পূর্ণিমার গোল চাঁদটিকে
চাঁদের গায়ে ও কার ছবি? মায়ের মতো লাগছে না!

মা তো সেই কবেই মফস্বলের হাসপাতালে ভুল অপারেশনে
চলে গেছেন, কবির তখন ষোল বছর বয়স
আজ এই আশির চাঁদে মাকে দেখে বড় ভালো লাগছে তো
আহা, মায়ের চেহারাটি তো ভুলতে বসেছিলেন
দেখো তো কেমন সুন্দর হাসিটি মায়ের

মা! মা! আমি আসছি মা... আমি আসছি...
বিড়বিড় করে বলতে চাইলেন বোধহয়
ঘড়ঘড় একটা আওয়াজ বেরোল
দুচোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল
কবি তাকিয়ে আছেন মায়ের মুখের দিকে
ঠোঁটটা একবার কেঁপে উঠল
মা যেন আরও কাছে এসেছেন
চাঁদটাও...

হু হু করে হাওয়া ঢুকছে
অল্প ভিজে হাওয়া, সন্ধ্যাবেলা একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে
এখনো দু'একটা মেঘ এদিক ওদিক
কবিতাগুলো ভিজছে...
শেষ যে কবিতাটা লিখতে শুরু করেছিলেন কবি
"রোদ আর মেঘের গল্প..."
আজ, সকালের রোদ এসে পড়েছে খোলা পাতায়

কবিতা মেখে নিচ্ছে তাপ, নবীন শরীরে
কবি আর দেখতে পাচ্ছেন না
পাবেন না
কোনদিন আর

জীবনের কবি, কবিতার জীবন:

কবির মৃত্যু হলে তাঁর পাঠকের জন্যে থেকে যায় তাঁর সৃষ্টি। কিন্তু তাঁর জীবনসাথীর জন্য কী পড়ে থাকে? হয়তো একাকীত্ব আর নীরব হাহাকার। পাঠকের কাছে কবির সৃষ্টি শিল্প, আশ্রয় এবং প্রেরণা। কবিকে সরাসরি না চিনলেও তাঁর লেখার মাধ্যমে নিজের মনের কথা খুঁজে পান। কখনও বা কবির দুঃখ, আনন্দ, বিরহ – এসব নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে নিজেরই অনুভূতি করে নেন। কখনো জীবনের প্রতিকূলতা এড়াতে খুঁজে পান সান্ত্বনা। পাঠকের কাছে কবি সৃজনশীল কিন্তু দূরের। তিনি শব্দ দেখেন, শব্দের পেছনে অনন্ত রাত্রি জাগরণ, প্রেরণা বা প্রেরণাহীনতা তাঁর অধরাই থেকে যায়। শব্দের মোহ, রহস্যময়তা, সম্মোহনও জাগরূক থাকে তাই।

কিন্তু কবির পরিবারের কাছে তাঁর সৃষ্টি একইসঙ্গে কল্পনা ও বাস্তব। কবিতা কল্পনা, কিন্তু চলে যাওয়াটি যন্ত্রণাময় বাস্তব। বা হয়তো কবিতাও তাঁর কাছে, তাঁদের কাছে তখন বাস্তব, শুধুই শূন্যতা। তাঁর প্রতিটি লেখা, খসড়া বা ডেস্কে পড়ে-থাকা অর্ধেক শেষ হওয়া কবিতা সবই যেন শুধু এক নিভে যাওয়া। তুর্কি কবি ইলহান বার্ক (İlhan Berk)-এর লেখা 'Visiting the Beloved Wife of a Dead Poet' কবিতায় (ইংরেজি অনুবাদ) দেখতে পাই সদ্য প্রয়াত কবির স্ত্রীকে। যেন কী বলতে চাইছেন, যেন কী মনে করতে চাইছেন, যেন কী নিভে গেল তাঁর জীবন থেকে। শোক, স্মৃতি, প্রেম ও নশ্বরতাকে এক তন্ত্রীতে বেঁধেছেন বার্ক। অনুবাদ রইল সেই কবিতাটির।

মৃত কবির স্ত্রীকে দেখতে গিয়ে

"যেখানে হাত রাখো
শুধু কাগজ আর বই।
কিছু অসমাপ্ত কবিতা
ছড়ানো এদিক ওদিক –
কিছু সবেই হয়েছে শেষ;
ঝকঝকে নতুন
প্রথম স্বপ্নের মতো।
কবিতায় তো সব ছিল,
সবটুকু...না?"
"একটা কবিতায় আকাশ মলিন...
একটা কবিতায় অদৃশ্য রাস্তা,
কখনো আসছে, কখনো যাচ্ছে,
ম্যাজিকের মতো...
এভাবেই কেটে গেল জীবন, জানো?"
বললেন কবির স্ত্রী।

ওর কথাগুলো যেন
ভেসে আসছিল,
অনেক দূরের দেশ থেকে
আর হঠাৎ, ঢুকে ঢুকে পড়ছিল
শূন্য ঘরটায়।

একটা বই দেখালেন,
এরপর উনি।
মলাট খোলা, পড়ে ছিল টেবিলে...
কবি এই বই ছুঁয়েছিলেন শেষবার,
এই বই ফেলেই
চলে গেলেন।

"জানো,
ঠিক ওই জায়গাটায়
বসেছিল ও।
পড়ছিল বইটা...
বসে থাকতে থাকতে,
হঠাৎ দেখলাম,
পড়ে গেল বইটা হাত থেকে,
ব্যস, সব শেষ..."
বলতে বলতে দুহাতে
মুখ ঢেকে ফেললেন উনি।
ভেসে যাওয়া –
ক্লান্ত মেঘের ছায়ায়
হারিয়ে গেলেন যেন,
গ্রহণের সূর্যের মতো।

কবি না কবিতা:

আজ এই লেখাটির অনুষঙ্গে এবং শিরোনামে রয়েছে কবীর সুমনের গানটি | কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় চলে যাওয়ার পর গানটি লিখেছিলেন সুমন | সে গানের কথায়ও যেন সেই একই প্রশ্ন | কবিতার কতটুকু কবি, কতটা তাঁর কল্পনা, কবি চলে গেলে যে শব্দরা পড়ে থাকে তাদের কি একটা ভিন্ন পরিচয় গড়ে ওঠে সময়ের সাথে সাথে! সেই পরিচয়ে কবি কি থাকেন কোথাও | হয়তো থাকেন, হয়তো না | কবিতা তো সন্তানের মতো | Child is the father of man আবার সে এক আলাদা ব্যক্তিও | সন্তানের মতোই কবিতাগুলিও অগ্রসর হয় তাদের নিজস্ব গতিপথে, শতাব্দী পেরিয়ে কোন এক পাঠকের অনুভবে সেই শব্দ নতুন রূপ নিয়ে ধরা দেয় | সেই তার সার্থকতা | হয়তো কবিরও | জীবনের নশ্বরতাকে অল্প হলেও কিছুটা অগ্রাহ্য করা যায় হয়তো | যায় কি? সুমন এতসব তর্কে যেতে চাননি | তিনি তাই নির্মোহ হয়ে লিখতে পেরেছেন –

কে বেশি অবুঝ, কবি না কবিতা?
পদ্যের দায় নেই হিসেব দেবার
ঘুমোও বাউণ্ডুলে, ঘুমোও এবার |

কিন্তু সত্যিই কি দায় নেই? কবির হৃদয় নিংড়ে বেরিয়ে আসা শব্দগুলি কি সত্যিই উদাসীন | নাকি তারাও অপেক্ষায় থাকে? জীবনের ঢেউয়ের পাশে পাশে আরও এক ঢেউয়ের মতো ভাসতে ভাসতে, একদিন দেখা হয়ে যায় তাদের, কবির সাথে, আবার, জীবন পারের নদীর ধারে | হয়তো তখন তাঁর অন্য পরিচয় | হয়তো তিনি কবি নন | হয়তো তখন তিনি নিতান্তই পাঠক | শব্দদের চিনেও চিনতে পারেন না | বা না চিনেও চেনা লাগে | আদর করে টেনে নেন তিনি, কবিতার বইটিকে, বইয়ের মলাটের মাঝে চির-চেনা চির-অচেনা শব্দদের!





বেঁচে থাকার জন্য মানুষের কী কী প্রয়োজন এবং করণীয়

ভজেন্দ্র বর্মন

ইদানিং বেশ কয়েকটি মৃত্যুসংবাদ পাই, যেখানে পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক সংসারের একমাত্র অবলম্বন, যার আয় দিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে পিতা-মাতাসহ স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ হতো | তারা কেহ কেহ ডিগ্রিধারী শিক্ষিত আর অন্যরা তত শিক্ষিত ছিল না | অবিভাবকের মৃত্যুর পর এই পরিবারগুলোকে স্বভাবতই বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে | শুনেছি, এরা প্রায় সবাই ভালোভাবে বাঁচতে চেয়েছিল | এজন্য নিজস্ব বাড়িঘর তৈরী করা এবং কারো মতে নিজেকে সচ্ছল দেখাতে অন্যদের সাথে নানা প্রতিযোগিতামূলক কাজে লিপ্ত ছিল | এজন্য তারা চড়া সুদে ধার-কর্জ করেছিল অথবা জমিজমা বন্ধক রেখে মহাজনের কাছ থেকে বেশ বড় অঙ্কের অর্থ নিয়েছিল | এর থেকে বোঝা যায় এদের চিন্তা ভাবনায় এবং আমাদের সমাজে বেশ কিছু ত্রুটিপূর্ণ দিক আছে, যার জন্য এসব দুর্ঘটনা অহরহ ঘটছে | প্রশ্ন আসে, তারা কি খুব বেশী কিছু চেয়েছিল?

সুস্থ-সবল থেকে নিরাপদে এবং আত্মসম্মান নিয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে কে না চায়? বেঁচে থাকাটা কিছু মানুষের ক্ষেত্রে খুবই কঠিন, আবার কারো ক্ষেত্রে বেশ সহজ, এবং অপর কিছু মানুষের ক্ষেত্রে মাঝামাঝি ধরনের হয় | এ কারণে মানুষের সামাজিক কাঠামো শ্রেণীভেদে জটিল – ধনী, মধ্যবিত্ত ও গরিব বা হত-দরিদ্র শ্রেণী নিয়ে আমাদের সমাজ | কোন অংশের সংখ্যা কত তার উপর ভিত্তি করে আমরা কোন অর্থনৈতিক স্তরের দেশে থাকি তা নির্ধারিত হয় |

বেঁচে থাকার জন্য মানুষের অনেক কিছু প্রয়োজন | উদাহরণ স্বরূপ, বাঁচার জন্য খাদ্য একান্ত প্রয়োজন | নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য কেহ কেহ দিনে একবেলাও খেতে পায় না; দিনের পর দিন উপোস করে কাটায় | কেউবা কোনরকমভাবে একবেলা বা দুবেলা খেয়ে দিন কাটায় | কারো আবার পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার জোটে | কারো সম্পদের পরিমাণ এত বেশী, যে তাদের খাবার নিয়ে ভাবতে হয় না | এরকম সামাজিক বৈষম্য চাক্ষুষ দেখা যায় | এক্ষেত্রে পশু-পাখি এবং কীট-পতঙ্গ গোষ্ঠী

হিসাবে মোটামুটি এক ধরনের পরিবেশে বাঁচতে পারে। তারা যেখানে বাস করে সেখানে যা পাওয়া যায়, তাই তারা ভাগাভাগি করে খায়। খাদ্যের মতো আমরা সবাই আরো অনেক কিছুই সমানভাবে পাই না। কোন কোন ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রচন্ড প্রকট। নিম্নে এসব বর্ণনা করা হ'ল।



বায়ু, খাদ্য, জল এবং পোশাক –

শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য দূষণমুক্ত বায়ু সকলেরই প্রয়োজন, কিন্তু তা সবাই পায় না। কোন কোন স্থানে বায়ু এতটাই দূষিত, যে সেখানে মানুষ সুস্থভাবে বাঁচতে পারে না। যেমন বস্তি, কল-কারখানা বা বর্জ-স্তূপের পাশাপাশি যাদের বসবাস করতে হয় তারা এ পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। এইসব মানুষরা স্বল্প শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত। তারা দূষিত বায়ু এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হয়। এটা দরিদ্র মানুষদের প্রতি সমাজের দারুণ অবহেলার প্রতিফলন।

পৃথিবীর আট বিলিয়ন মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও সুপেয় জলের পরিমাণ অনেক। ধনী দেশে খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যত সহজ হয়, গরীব দেশে ততটা সহজ নয়। সে কারণে পৃথিবীর বেশীরভাগ মানুষ অপুষ্টি, অনাহারে বা অর্ধাহারে দিন কাটায়। যেসব স্থানে খাদ্য সংকট রয়েছে, সেখানে খাদ্যে এবং খাদ্য সামগ্রীতে প্রচন্ড রকমের ভেজাল থাকে। এসব স্থানে মানুষের গড় আয়ু কম হয় আর স্বভাবতই দারিদ্র্যের হার বেশী। পক্ষান্তরে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এক স্তরের মানুষ পর্যাপ্ত আহার করে। অনেক সময় মনে হয় এক পৃথিবীতে বাস করলেও সমাজের এক অংশ অন্য অংশের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। উপরন্তু দুর্যোগজনিত কারণে শস্য নষ্ট হয়ে গেলে অসংখ্য মানুষকে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে হয়, যা ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে ঘটেছিল। অসময়ে অস্বাভাবিক বন্যার কারণে সে বছর কৃষকদের সকল ধানের ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

পৃথিবীতে জলের পরিমাণ এবং গুণগত মান সর্বত্র এক রকম নয়। জল দূষণ একটি বিরাট সমস্যা। ধনী দেশে খাবার এবং রান্নার জন্য জল শোধন করে সর্বত্র পাঠানো হয়। অন্যত্র এটা হয় না বলে জল-বাহিত রোগের প্রকোপ সেসব অঞ্চলে অনেক বেশী। জলের গুণগত মান সমান হওয়া উচিত বলা হলেও এ ব্যাপারে পৃথিবীব্যাপী খুব একটা উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা দেখা যায় না। অতীতে বাংলাদেশের জলে আর্সেনিক দূষণ নিয়ে অনেক তোলপাড় হয়েছিল। যতটুকু জানি, সে সমস্যাটি এখন ধামাচাপা অবস্থায় রয়েছে।

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে আমাদের পোশাক এক ধরনের আভরণ হয়ে দাড়িয়েছে। এসব পোশাক সস্তা বা দামী হতে পারে। অতীতে, বিশেষ করে ইংরেজদের শাসনকালের ছবি দেখে বোঝা যায়, তখন বহু দেশী মানুষ সামান্য একটু কাপড় দিয়ে লজ্জা নিবারণ করত। আমরা গর্বিত যে বেশীরভাগ মানুষ এখন সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।

আশ্রয়, ঘুম ও নিরাপত্তা –

সবাই নিরাপদে ঘুমাতে চায়। বৃষ্টি-বাদল-ঝড়-গরম-ঠান্ডা, বন্য পশুপাখি, মশা-মাছি, কীট-পতঙ্গ থেকে সর্বোপরি মানুষের দ্বারা ক্ষতিকর কর্মকান্ড হতে নিরাপদে থাকার জন্য আমরা ভাড়া বাড়ি বা নিজস্ব বাড়িতে বাস করি। সবার এরকম বাড়িতে থাকার সুযোগ হয় না। অনেকেই এখানে-সেখানে মানবেতর অবস্থায় জীবন কাটায়। সেটা সরকার ভ্রূক্ষেপে আনলে এ সমস্যার সমাধান হয়তো হতে পারত। এরকম উদ্যোগ বাংলাদেশে নেওয়া হয়েছিল। সেটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে প্রান্তিক পরিবারগুলোর অনেক উপকার হতো। দেখা যায়, আমাদের সমাজে অনেকে বেপরোয়া হয়ে জীবনের প্রথম এবং সবচেয়ে প্রধান পদক্ষেপ হিসাবে বাড়ি বানাতে চায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহ কেহ এটা করে যখন তাদের আর্থিক অবস্থা ততটা সচ্ছল থাকে না।

শিক্ষা, কর্ম দক্ষতা, আত্মসম্মান ও সততা –

কেহ কিছু করতে চাইলে সঠিক শিক্ষাসহ নিজস্ব বোধজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। বাঁচার জন্য কর্মদক্ষতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষিত না হলে দক্ষ মানুষ হিসাবে গণ্য হওয়া কঠিন। আর তা না হলে সারাজীবন মানুষের অবহেলার মুখোমুখি হয়ে থাকার সম্ভাবনা থাকে। শিক্ষা-ভিত্তিক কর্ম

দক্ষতার বিকল্প নেই বললে অত্যুক্তি হবে না | যে কোন কর্মদক্ষতা মানুষের আত্মসম্মান বাড়ায় | খুবই দুঃখজনক যে আমরা অত্যন্ত মন্থর গতিতে শিক্ষিতের হার বাড়ানোর চেষ্টা করছি |

আমাদের দুর্ভাগ্য যে কোন গরিব পিতা-মাতা শিক্ষার গুণগত দিক বোঝার পরও তাদের সন্তানকে শিক্ষিত করতে পারে না | নানা কারণে অর্থনৈতিকভাবে নীচু স্তরের ছেলে-মেয়েরা চেষ্টা করেও শিক্ষালাভ করতে সফল হয় না | যারা সফল হয়, তারাও অনেকে শিক্ষালাভের পর বেকার জীবন কাটায় | এসব পরাজয় আমাদের দেশ ও সমাজেরও ব্যর্থতা বৈকি!

Honesty is not just about telling the truth. It's about being real with yourself and others. It's about authenticity, integrity, and transparency.

সততা এমন একটি জিনিস যা রক্ষা করা সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর করে | সম্পদ অর্জন করার উদ্দেশ্যে অথবা যা পাওয়ার যোগ্যতা নেই তা যেভাবেই হোক ছিনিয়ে আনার জন্য মানুষের অসৎ হওয়ার প্রবণতা আসে খুব তাড়াতাড়ি | মিথ্যাচার করতে এবং অসৎ পথে অনেকেই যেতে চায় | কিন্তু সৎ থেকেও জীবনে উন্নতি করা সম্ভবপর | নিজের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখা সকল মানুষের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত | সৎ এবং দায়িত্বশীল মানুষ অতি সহজেই অন্যের নজরে পড়ে এবং সম্মান অর্জন করতে পারে |

শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং স্বাস্থ্যসেবা –

একটি পূর্ণ জীবন কাটাতে হলে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকা প্রয়োজন যাতে চলাচল এবং কাজকর্ম করার সক্ষমতা থাকে | শিশুকাল থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য সুষম খাদ্য, খেলাধুলা, ব্যায়াম, বিশ্রাম, বিনোদন, ভ্রমণ, সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলাসহ নানাবিধ কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় | নিজের চাহিদা বা ইচ্ছা পূরণের জন্য কাজ করতে হয় | জীবনকে অর্থবহ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয় | সবাই সব ক্ষেত্রে সফল হয় না | কিন্তু কেউ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে তার পক্ষে অনেককিছু অর্জন করা সম্ভবপর | যেখানে স্বাস্থ্যসেবা উন্নত, সেখানে মানুষ রোগাক্রান্ত হলে তাড়াতাড়ি আরোগ্যলাভ করতে পারে | যেখানে তা নেই, সেখানে মানুষের গড় আয়ু অনেক কম |

জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা, নিরাপদে বসবাস করা, সমাজের প্রথামত কাজ করা, শারীরিক ও মানসিক শান্তি রক্ষা করার জন্য আমরা সবাই নিজেকে ব্যস্ত রাখি | গর্বিত হওয়ার জন্য ছোট-বড় ভালো কিছু করা একান্ত প্রয়োজন | আমরা জীবনকে মূল্যায়ন করার জন্য সফলতা, সম্মান ও আত্মবিশ্বাস ব্যবহার করি | ছোট সফলতাকে ক্ষুদ্র হিসাবে দেখলে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় | এর দ্বারা মানসিক ও শারিরীক দুর্যোগ ডেকে আনা হয় | তাই হয়তো ঘটেছে উপরে বর্ণিত অকাল মৃত্যুর ব্যাপারগুলোতে |

এখানে আর্থিক সফলতার কথা বলা হয়নি কারণ কোন একটা মানদণ্ড দিয়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরকে বর্ণনা করা কঠিন হয়ে পড়ে | তবে যে স্তরে যে থাকে, সেই অনুযায়ী তার চাহিদার পরিমাণ থাকা উচিত এবং সততার সাথে তা পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত | অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমরা নীচু স্তরের মানুষদের আর একটু উঁচু স্তরে নিয়ে যেতে আগ্রহ দেখাই না | সেজন্য উন্নত জীবন যাপনের সীমারেখা শত চেষ্টা সত্ত্বেও অনেকের নাগালের বাইরেই থেকে যায় |



কিছুক্ষণ আরো নাহয় রহিতে কাছে

সুজয় দত্ত

একান্নবর্তী পরিবার বস্তুটা এখন মিউজিয়াম পিস্ হয়ে গেছে, পুরোনো দিনের গল্প-উপন্যাস আর সিনেমায় পাওয়া যায় শুধু। আমার জন্ম অবশ্য সেরকমই এক পরিবারে। শৈশবও কেটেছে সেখানেই। টিভি তখনো বাঙালির বিনোদন জগতে রাজত্ব শুরু করেনি, সময় কাটানোর দৈনন্দিন মাধ্যম বলতে বই আর রেডিও। উত্তর কলকাতায় আমাদের পুরোনো আমলের বাড়িতে বৈঠকখানার সেন্টারপিস্ হয়ে বসে থাকা ধাম্বাল সাইজের ভাল্ভ রেডিওটার কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। আর অন্যটা, অর্থাৎ বই আমার ঠাকুরদার দৌলতে সেই আদ্যিকালের কড়িবর্গাওয়ালা বাড়িটায় কম ছিল না, আলমারির পর আলমারি ভর্তি। সন্ধ্যে বা রাত্তিরে আলো চলে গেলে, মানে লোডশেডিং হলে, দাদুর পড়ার ঘরটায় ঢুকতে রীতিমতো গা ছমছম করত আমার। মোমবাতির কাঁপা কাঁপা আলোয় মনে হতো দেয়াল আলমারিতে সারি দিয়ে সাজানো সেইসব পোকায়-কাটা, আরশোলায়-ডিম-পাড়া, মোটা মোটা বাঁধানো বইগুলো যেন আমায় গিলতে আসছে। তবে কয়েকটা বইয়ের কথা আলাদা করে মনে আছে তাদের অদ্ভুত নামের জন্য। যেমন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা', 'হনুমানের স্বপ্ন'।

সুতরাং এক ছুটির দিনের সকালে যখন কানে এল আমার বড়ঠাম্মা (ঠাকুমার মা, যিনি ওই বাড়িতেই থাকতেন) বাড়ির কাজের মেয়ে মোক্ষদাকে মুখঝামটা দিচ্ছে সে বিকেলে কামাই করতে চায় বলে, আর "কেন? কী এমন রাজকার্য পড়েছে তোর শুনি, হতচ্ছাড়ি পোড়ারমুখী?" এই ঝাঁঝালো প্রশ্নের উত্তরে সে মিনমিন করে বলছে, "ছবিঘরে হুতোমকুমারের বই এইচে, ভাবচিনু আজ এট্টু দেইক্ক্যে আসি", শুনে বেশ অবাক হয়েছিলাম। ছবিঘর ব্যাপারটা কী, সেটা আমার ওই কচি বয়সে জানার কথা নয়, কিন্তু হুতোমকুমারের বই? তার মানে তো ওই লাল কাপড়ে বাঁধানো 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা', যেটা পাশের ঘরেই রয়েছে দাদুর পড়ার টেবিলে। সে তো এক্ষুণি দেখে নেওয়া যায়। এর জন্য কাজ কামাই? নাঃ, নিশ্চয়ই মিথ্যে অজুহাত।

'বই' মানে যে শুধু মলাট বাঁধানো কিছু কাগজের পৃষ্ঠা বোঝায় না, ওটা যে সম্পূর্ণ অন্য একটা বিনোদন মাধ্যমকে দেওয়া বাঙালির আদরের নাম, সেসব আমি জেনেছিলাম আরও কয়েক বছর পরে। কিন্তু মা-জ্যেঠিমা-কাকিমাদের কথোপকথন থেকে একটা জিনিস খুব তাড়াতাড়ি বুঝে গেলাম – এই 'হুতোমকুমার' ব্যক্তিটি দাদুর লাল বইয়ের হুতোমপ্যাঁচা নয়, অন্য লোক। একদিন বাড়ির চার বৌয়ের বৈকালিক আড্ডায় জ্যেঠিমা খুব হাত-পা নেড়ে জায়েদের ক্যুইজ করছিল, "ওঁর আসল নাম কী বল তো? জানিস না তো? অরুণ। বড়ভাই অরুণ, তারপর বরুণ, আর একদম ছোট..."। এই অবধি শুনেই আমার চেয়ে দুবছরের বড় পিসতুতো দিদি হঠাৎ কোত্থেকে বোঁ করে এসে বলল, "আমি জানি, আমি জানি, কিরণমালা।" তার এই প্রতিক্রিয়া খুবই স্বাভাবিক, কারণ আমরা অর্থাৎ বাড়ির সব কচিকাঁচারাই বড়ঠাম্মার কাছে অরুণ-বরুণ-কিরণমালার গল্প বহুবার শুনেছি। 'কিরণমালা' শুনে ছোটকাকিমা খিলখিল করে হেসে উঠল, "দূর বোকা, ভাইয়ের নাম কখনো কিরণমালা হয়?" কাকিমা-ব্যবহৃত বিশেষণটা পছন্দ না হওয়ায় সে ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করে চলে গেল, কিন্তু আমি ভাবতে লাগলাম অরুণের আরেকটা নাম যদি উত্তমকুমার হয়, তবে কি বরুণের নাম মধ্যমকুমার আর ছোটভাইয়ের নাম প্রথমকুমার? এমন ভাবার কারণ আর কিছুই না, আমার চেয়ে অনেকটা বড় জ্যাঠতুতো দাদা তখন বেশ উঁচু ক্লাসে – তাকে মাঝেমাঝে 'ব্যাকরণ ও রচনা' লেখা একটা মোটা বই থেকে সুর করে পড়তে শুনেছি 'উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ, প্রথমপুরুষ'। পুরুষ মানে তো ছেলে। আবার কুমার-ও তো ছেলেদেরই বলে।

জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে আসার পর ছেলেবেলার স্মৃতি ধূসর হতে শুরু করে, কিন্তু কিছু বিশেষ বিশেষ দিন চির-উজ্জ্বল থেকে যায়। আমার ক্ষেত্রে সেরকমই একটা দিন হ'ল প্রথমবার সিনেমা হলে যাবার অভিজ্ঞতা। আমি তখন প্রাইমারী স্কুলে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। আমার সবচেয়ে বড় যে মামাতো দিদি, তার শুভ পরিণয় আসন্ন। তারই আশীর্বাদ আর পাকাদেখা উপলক্ষ্যে আমরা সবাই মামাবাড়িতে গেছি। আমার মামাতো দাদা সিনেমার পোকা, তাই অনুষ্ঠান ভালোয় ভালোয় মিটে যেতেই তার মাথায় হুজুগ চাপল বাড়ির সবাইকে নিয়ে সিনেমায় যাবে সেই রবিবার। কাছের তিনটে হলের নাম যে আলোছায়া, সন্তোষ আর শুকতারা, সেটা দাদার

মুখে শুনে শুনে আমারও মুখস্থ ছিল। তিনটেতেই নাকি কী এক বিশেষ উপলক্ষ্যে এক সুপারস্টারের পূর্ণ আর সাম্প্রতিক হিট সিনেমাগুলো চলছে (বলাই বাহুল্য, তখন ৩রা সেপ্টেম্বরের ফিল্মী তাৎপর্য আমি জানতাম না) | সেই সময় আমি বাংলা খবরের কাগজের একটু আধটু পাতা ওল্টানো শুরু করেছি, কার্টুন আর কমিক্সের জায়গাগুলো খুব আগ্রহ নিয়ে দেখি, বিভিন্ন ছবির তলায় ক্যাপশন পড়ে বোঝার চেষ্টা করি সেগুলো কার বা কিসের ছবি। একদিন এই সুপারস্টার শব্দটা চোখে পড়েছিল। কিন্তু ছবির তলায় নাম তো রাজেশ | পদবীটা অবাঙালি | এক্ষেত্রে যে শুনছি সুপারস্টারের নাম উত্তমকুমার? তাহলে সুপারস্টার বুঝি শুধু একজনই হয় না? তার মানে কি পেলেকে যে বলা হয় 'ব্ল্যাক পার্ল', সেটাও অন্য কেউ হতে পারে? যাইহোক, আমার মামাতো দাদা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করায় বিশ্বাসী নয়, তাই একটায় হবে না – দুটো সিনেমা মিনিমাম। আলোছায়ায় ম্যাটিনে, সন্তোষে ইভনিং। পারলে শুকতারায় নাইট শোতেও নিয়ে যেত সবাইকে, আমার দিদার বকুনিতে ক্ষান্ত দিল। এখন, 'সবাই'-এর মধ্যে আমিও পড়ি কিনা, তা নিয়ে শুরুতে কিছুটা সংশয় ছিল। বড়দের কারুরই মুখ দেখে মনে হচ্ছিল না তারা আমায় নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু উল্টোটাও তো সমস্যা – আমাকে বাড়িতে রেখে গেলে অন্ততঃ তাদের একজনকে থেকে যেতে হবে আমার সঙ্গে। সেই হুল্লোড়ের আবহে ঐ অবাঞ্ছিত স্বার্থত্যাগ করতে শেষ অবধি রাজী হল না কেউ। অতএব চললাম আমিও।

কানায় কানায় ভরা সেই অন্ধকার হলঘরে আমি বিরাট পর্দাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাঝপথে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যতটুকু মনে আছে, তা হ'ল একদল দুরন্ত বাচ্চার দুষ্টুমিতে তাদের নতুন গৃহশিক্ষিকার কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে যাওয়া এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে একটা মজাদার গান গাওয়া (ওরে আন্টি রে, বুঝি যায় যায় তোর প্রাণটি ইত্যাদি), সেই আন্টির সঙ্গেই পরে পিকনিকে বেরিয়ে আরেকটা খুব মনমাতানো গানে ওদের সবার গলা মেলানো (আমাদের ছুটি ছুটি চল নেব লুটি) আর তারও পরে সেই আন্টি চলে যাবার দুঃখে সবাই মিলে গোপনে তাকে খুঁজতে বেরোনো। সেখানেও একটা স্মরণীয় গান ট্রেনে যেতে যেতে, যার একটা লাইন 'দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ হয়ে যাব মোতিহারি' আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল কারণ মোতিহারি বলে কোনো জায়গার নাম আগে কখনও শুনিনি। পরের সিনেমাটায় অর্থাৎ ইভনিং শোয়ে অবশ্য আর ঘুমিয়ে পড়িনি। সারাক্ষণ জেগে জেগে শুনছিলাম হলভর্তি লোক মুহুর্মুহু হাসিতে ফেটে পড়ছে আর দেখছিলাম একের পর এক মজাদার দৃশ্য যার মধ্যে একটা ছিল ছবির শেষের দিকে বয়স্ক বাবা-মায়েদের বেঞ্চের ওপর দাঁড়ানোর শাস্তি | পুরো ছবিটার সামগ্রিক বক্তব্য বোঝার বয়স তখন না হলেও 'পাগলা গারদ কোথায় আছে নেই বুঝি তা জানা?' গানের শেষ লাইনে দাঁড়িপাল্লার ওজনে ছেলেরা কেন জিতে গেল সেটা বুঝতে সমস্যা হয়নি। বাস্তবিকই, গোঁফ আর দাড়ি তো শুধু ছেলেদেরই থাকে – মেয়েরা পাবে কোথায়?

সেদিন আমার প্রাপ্তির তালিকায় ছিল মূলতঃ তিনটে জিনিস – সারাক্ষণ শান্ত হয়ে থাকার জন্য মেসোমশাইয়ের কিনে দেওয়া ক্যাডবেরি, সিনেমা হল নামক একটা সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা এবং অবশ্যই উত্তমকুমার নামক বহু-আলোচিত ব্যক্তিটিকে প্রথম স্বচক্ষে দেখা। শুকতারাটা বাদ পড়েছিল সেই রাতে, কিন্তু পরের বছরই সেখানে এল সদ্য-মুক্তি-পাওয়া 'আনন্দ আশ্রম' ছবিটি। আবারও মামাবাড়ি থেকে সবাই মিলে দল বেঁধে হুল্লোড় করে যাওয়া | এবার অবশ্য স্পনসর সদ্যবিবাহিত দিদি-জামাইবাবু। ততদিনে আমার পাক্কা এক বছর বয়স বেড়েছে। কম কথা নাকি? কয়েকটা ব্যাপারে উন্নতিও হয়েছে | বাড়িতে আদ্যিকালের ভাল্‌ভ রেডিও বাতিল করে বাবার নতুন কেনা ফিলিপ্স ট্র্যান্সিস্টর রেডিও এসেছে এবং আমি সেটাকে প্রায় আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি করে ফেলেছি (যদিও, সত্যি বলতে কি, রেডিওর মধ্যে যে খুদে খুদে মানুষ থাকে – সে বিশ্বাসটা তখনও যায়নি মন থেকে) | দিনের বিভিন্ন সময়ে সেটাকে বিছানায় নিয়ে তার গায়ে কান লাগিয়ে 'মনের মতো গান', 'মন-চাহে গীত', 'ছায়াগীত' ইত্যাদি শোনার অভ্যাস তৈরী হয়েছে। সুতরাং বাংলা আর হিন্দী গানের জগতে একঝাঁক শিল্পীর নামের সঙ্গে বেশ ভালোমতো পরিচয় হয়েছে, যদিও কিছু কিছু নাম ঠিকঠাক উচ্চারণ করতে পারি না বলে বড়রা হাসাহাসি করে। যেমন ভোঁসলে-র বদলে বলি 'ঘোষ লেন' (ওটা আসলে আমার মামাবাড়ির ঠিকানা) আর মুকেশ-এর জায়গায় 'মুখোশ'। যাইহোক, এর ফলে 'আনন্দ আশ্রম' দেখতে গিয়ে কোন গানটা শ্যামল মিত্রর আর কোনটা

কিশোরের তা চিনে নিতে অসুবিধে না হওয়াই স্বাভাবিক। ছবির সামগ্রিক কাহিনী বিন্যাস আর বিভিন্ন সংলাপের তাৎপর্য বুঝতে না পারলেও লম্বা ছবিটায় সারাক্ষণ ধরে আমি শুধু উত্তমকুমারকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেই কাটালাম। তাঁর হাঁটাচলা, কথা বলার ধরণ, বিভিন্ন অভিব্যক্তি প্রকাশের ভঙ্গিমা। ছবিশেষে ট্যাক্সি করে সক্কলে গেলাম কলেজ স্ট্রিটের দিলখুশ ক্যাবিনে, ওখানকার বিখ্যাত দই-মুরগী আর ফিশ কবিরাজী চাখতে। খেতে খেতে বড়রা একটু আগে দেখে আসা সিনেমা আর তার নায়ককে নিয়ে আলোচনা করছিল। 'আমি, সে ও সখা' যে তাঁরই একটা সিনেমার নাম, সে আর আমি জানব কী করে? তাই খাবার টেবিলে মেজোমাসীর মুখে ওই নামটা শুনে ভাবলাম 'আমিষেও' বলছে যখন, তখন বোধহয় নিরামিষেও সখা। আর 'মরুতীর্থ হিংলাজ' শুনে ঠিক বুঝতে পারলাম না ওটা মরুভূমিতে তীর্থ করতে গিয়ে সেখানকার মুদির দোকানে হিং চাইতে লজ্জা, নাকি চাইলেও দিতে না পারায় দোকানীর লজ্জা।

এর পরের বছরদুটোয় খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। প্রথমটা দুঃখের। প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তুমুল বৃষ্টি আর বন্যা। অসংখ্য মানুষ গৃহহীন, সর্বস্বান্ত, অসহায়। কলকাতাতেও কোথাও হাঁটুজল, কোথাও কোমর, কোথাও বা বুক। বিপুল সংখ্যক আর্তজনের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য টাকা আর রসদ চাই। ঝাঁপিয়ে পড়ল মাত্র একবছর আগে রাজ্যে ক্ষমতায় আসা বামফ্রন্ট সরকার, তার সঙ্গে অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এখনো স্পষ্ট মনে আছে আমার – দোতলার ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে দেখছি (উত্তর কলকাতার একান্নবর্তী পরিবার ছেড়ে তখন ফুলবাগান এলাকায় সরকারী ফ্ল্যাটে থাকি আমরা) সকাল-বিকেল নীচের রাস্তা দিয়ে ছোট ছোট দল হাতে চোঙা মাইক আর ত্রিপল বা শতরঞ্জি নিয়ে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে, দুপাশের বহুতল বাড়িগুলোর তলায় দাঁড়িয়ে সাহায্যের জন্য আবেদন করছে। আর সেইসব বাড়ির বারান্দা থেকে নীচে শতরঞ্চির ওপর ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে টাকা, চালভর্তি থলি, অন্য খাবার আর আনাজপাতি, পোশাকআশাক।

আমাদের কয়েকজন আত্মীয়ের বাড়ি ছিল শ্যামবাজারের দিকটায়। পরে তাদের কাছে শুনেছিলাম কলকাতার বহু শিল্পী-কলাকুশলী-অভিনেতা এক লম্বা পথযাত্রা করেছেন ত্রাণ সংগ্রহের জন্য, সারাটা রাস্তা হাতে কৌটো ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে দুপাশে জড়ো হওয়া মানুষজনের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। সেই পদযাত্রার সঙ্গে একটা তিনদিক খোলা লরিতে ছিলেন উত্তমকুমার। লরি থেকে নামেননি একবারও, কিন্তু তাঁকে একঝলক দেখার জন্য ভীড় উপচে পড়েছিল আর লোকে বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে পাঁচটাকা দশটাকার নোট (সেই সময়ের পাঁচ বা দশ টাকার মূল্য আজকের দিনে কত, তা আশা করি বলে বোঝাতে হবে না)। সেই তুলনায় অন্য শিল্পীদের কৌটোয় পড়েছে চার আনা, আট আনা, বড়জোর একটাকা।

অন্য যে জিনিসটা ঘটল সেই বছরের একদম শেষদিকে, তা আমার জীবনে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এতদিন লোকমুখে শুনতাম যে কী একটা বাক্সের মতো যন্ত্র পাওয়া যাচ্ছে এখন কলকাতায় যার সুইচ অন করলে দূরদূরান্তের ঘটনাও চোখের সামনে পর্দায় ভেসে ওঠে। বিশ্বাস করিনি। একদিন দুম করে আমার মামাবাড়িতে একটা তিনচাকা টেম্পো গাড়ি এসে থামল, পিছু পিছু সাইকেলে আমার মামা। সেখান থেকে যে চৌকোমতো কাঠের বাক্সটা বাড়ির বসবার ঘরে একটা চারপেয়ে টেবিলের ওপর এনে রাখা হ'ল, তার সামনের দিকে সুদৃশ্য কারুকাজ করা দরজা। সেই দরজা খুললে ভেতরে একটা বড়সড় কাঁচের মতো জিনিস আর তার একপাশে কয়েকটা বোতাম। জিজ্ঞেস করে জানলাম এর নাম টিভি। কী হয় এতে? দাদা রহস্য করে বলল, "দাঁড়া না, দেখবি আজ সন্ধ্যে সাড়ে ছটায়।" এর পরের কয়েক ঘন্টা গেল ছাদের ওপর একটা চকচকে রূপোলি রড খাড়া করে তার মাথায় একটা অদ্ভুত দর্শন বস্তু ফিট করতে, যেটাকে দেখলে মনে হয় কাকপক্ষী বসে বিশ্রাম নেওয়ার প্ল্যাটফর্ম। একে নাকি বলে অ্যান্টেনা। তারপর সন্ধ্যে ছ'টা বত্রিশে দরজা খুলে বোতাম ঘোরাতেই ম্যাজিক। রেডিওর ভেতর যে খুদে খুদে মানুষগুলো থাকে তাদের দেখা যায় না, শুধু গলা শোনা যায়। কিন্তু এটার ভেতরে তো স্পষ্ট দেখছি মানুষ হেঁটেচলে বেড়াচ্ছে। সাইজে তারা কত হবে – দু'তিন ইঞ্চি থেকে ছ'সাত ইঞ্চি।

যাইহোক, কোনার্ক কম্পানির সেই সাদাকালো টিভি আমার সামনে দুটো দিগন্ত খুলে দিল। প্রথমতঃ, আমি তার কয়েক বছর আগে ক্রিকেট খেলাটা পাড়ার মাঠে বড়দের দেখে দেখে বুঝে

নিয়েছিলাম (ফুটবল তো তারও আগে থেকে বুঝি)| গত ক'বছর খুব আগ্রহ নিয়ে খেলার রিলে শুনেছি রেডিওতে | এবার চুটিয়ে দেখতে শুরু করলাম সেইসব খেলার রিপ্লে হাইলাইটস এবং পরের দিকে সরাসরি সম্প্রচার | দ্বিতীয়তঃ, দূরদর্শন অচিরেই শুরু করল শনি আর রবিবার সিনেমা দেখানো | একদিন বাংলা, একদিন হিন্দী | অতএব এই প্রথম আমি ঘরে বসে উত্তমকুমারের একঝাঁক ছায়াছবি দেখে ফেলার সুযোগ পেলাম | এমন নয় যে বাড়ির বড়রা ওগুলো আমাদের মানে কচিকাঁচাদের ডেকে ডেকে দেখাত | কিন্তু আমরা টিভির সামনে ঘুরঘুর করতে করতে আর নিজেদের মধ্যে খেলতে খেলতে ঠিক দেখে নিতাম | ধন্যি মেয়ে, ছদ্মবেশী, অমানুষ, বনপলাশীর পদাবলী, সন্ন্যাসী রাজা, পদ্মীরাজ, দুই ভাই ইত্যাদি জনপ্রিয় ছবিগুলো দেখতে দেখতে অভিনয়শিল্প সম্বন্ধে একটু একটু করে মনে একটা ধারণা তৈরী হওয়া শুরু হ'ল | কোনো কোনো ছবি এমন মজাদার আর ঘটনাবহুল যে নায়কের অভিনয় এমনিই খুব উপভোগ্য লাগত | আবার কিছু কিছু খুব সিরিয়াস ধরনের ধীরগতির ছবি গল্পটা না বুঝতে পারার দরুণ বোরিং মনে হওয়ায় তাঁর অভিনয় আলাদাভাবে কোনো রেখাপাত করত না | তবে এরই মধ্যে কতকগুলো ব্যাপার নজর এড়ায়নি আমার | উত্তম-অভিনীত সিনেমাগুলোতে মূল মহিলা চরিত্রে থাকতেন যাঁরা, তাঁদের নাম তো তখন জানতাম না, কিন্তু 'হারানো সুর' আর 'সপ্তপদী'র মতো কয়েকটা ছবির নায়িকা প্রসঙ্গে বাড়ির বড়রা দেখতাম সবসময়েই একটু বেশী উচ্ছ্বসিত | পরবর্তী জীবনে তার কারণ বুঝেছি, যখন দেখার চোখ আরো পরিণত হয়েছে | নিজের অজান্তেই ফ্যান হয়ে গেছি ভদ্রমহিলার | আরেকটা জিনিস হ'ল গান | নায়ক উত্তমকুমারের ঠোঁটে আমার জানা অনেক শিল্পীর গলাই শুনতে পেতাম, কিন্তু একজনেরটা যেন একটু বেশী ঘন ঘন | তখন না বুঝলেও পরে উপলব্ধি করেছি কেন উত্তম-হেমন্ত জুটিকে 'মেড ফর ইচ আদার' বলত লোকে আর কেনই বা হেমন্তবাবু নিজে তাঁর একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন তিনি গাইলে যেন মনে হতো উত্তমের নিজের গলা |

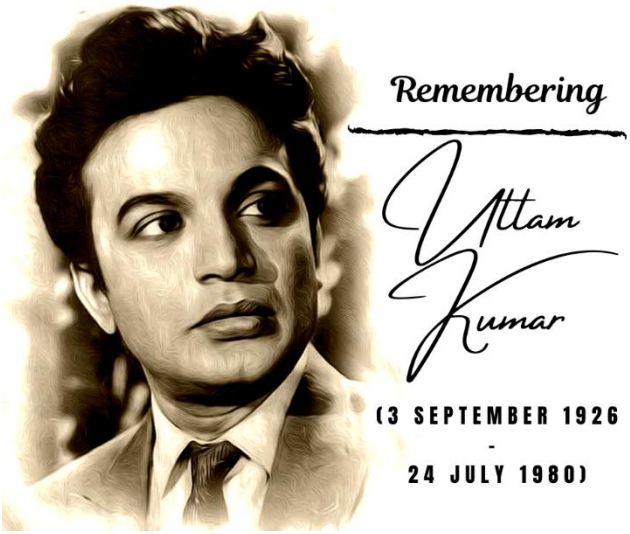
টিভির দৌলতে হয়তো বেশ কিছু সিনেমা দেখে ফেললাম তাঁর, কিন্তু সত্যি বলতে কি, কেন সবাই তাঁর নাম শুনলে হেদিয়ে পড়ে বা কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে সেটা রহস্যই রয়ে গেল আমার কাছে | কারণ বোঝার মতো বয়স তখনো হয়নি | এরপর একটা একটা করে বছর গড়াতে লাগল, শুরু হ'ল আশির দশক | এই দশকের মাঝামাঝি, যখন আমি সদ্য বয়ঃসন্ধি পেরিয়েছি, জীবনের অন্য আরও অনেক পরিবর্তনের সঙ্গে এটাও দেখলাম যে নায়ক উত্তমকুমারের প্রতি এক প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ জাগছে মনে | এমনি এমনি হয়নি সেটা অবশ্য | টিভি ছাড়াও ততদিনে মধ্যবিত্ত বাঙালির বিনোদন জগতে জায়গা করে নিয়েছে আরেক ছোট পর্দা | ভি সি পি | উৎসব-অনুষ্ঠান বা অন্য ছুটির দিনে পাড়ার দোকান থেকে একটা ভি এইচ এস ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ার আর ভিডিও কনসোল এক রাতের জন্য ভাড়া করে এনে একের পর এক সিনেমা গোগ্রাসে গেলা ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে | ওই কয়েক বছরে টিভি আর ভিসিপি মিলিয়ে উত্তমকুমারের এমন কয়েকটা ছবি পরপর দেখার সুযোগ হ'ল আমার, যেগুলো তাঁর পরিচিত (এবং হয়তো কিছুটা গতানুগতিক) 'রোম্যান্টিক হিরো' ইমেজটাকে মন থেকে অনেকটাই মুছে ফেলে নায়ক হিসেবে নতুন ভাবমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করল | প্রথমে দেখলাম দু'দশক আগের ছবি 'থানা থেকে আসছি' | যেমন রহস্যময় প্লট আর টানটান গল্প, তেমনই শক্তিশালী অভিনয় তাঁর | তারপর মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে 'অগ্নীশ্বর', 'দুই পৃথিবী' আর 'চৌরঙ্গী' | 'অগ্নীশ্বরের' বিভিন্ন দৃশ্য যে ভিডিও রিওয়াইন্ড করে কতবার দেখেছি, আজ আর হিসেব নেই | দেখতে দেখতে একটা কথাই বারবার মনে হয়েছে – ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখার্জীর দৃপ্ত ভূমিকায় ওঁকে ছাড়া আর কাউকে মানাত না, মানানো সম্ভব নয় | 'দুই পৃথিবী'তে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথমবার দেখি আমি | কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর সাবলীল অভিনয় মাঠে মারা যেত যদি না পাশাপাশি অন্য পৃথিবীর বাসিন্দা আদর্শবাদী বড়দার চরিত্রটা অমন অসাধারণভাবে তুলে ধরতেন উত্তমকুমার | আর 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসটা নিয়ে তো কোনো বিশেষণই যথেষ্ট নয় (শংকরের অর্থাৎ প্রয়াত মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের লেখার আমি তখন থেকেই বিরাট ভক্ত), কিন্তু স্যাটাদার রোলটা দেখতে দেখতে একটা তুলনাই মাথায় আসছিল | সুনীল গাভাস্কারের ব্যাটিং | যেভাবে ঝড়ঝাপটা সামলে ধৈর্য্য আর সৌন্দর্য্যের অপূর্ব সংমিশ্রণে 'শিট অ্যাঙ্কর' হয়ে টেস্টম্যাচে এক-একটা ইনিংসকে দাঁড় করাতেন সুনীল, সেই অনুভূতি জাগাচ্ছিলেন উত্তম তাঁর অভিনয়ে | আর শেষের দিকে বিমান দুর্ঘটনায় অঞ্জনা

ভৌমিকের চরিত্রটির মর্মান্তিক বিয়োগের পর উত্তমকে দেখে তো মা-মাসীরা চোখের জল ধরে রাখতে পারছিল না।

এই চারটে ছবির মাধ্যমে যদি আমার হৃদয়ে মহানায়ক হিসেবে উত্তমকুমারের বেদীর শিলান্যাস হয়ে থাকে, সেই বেদী আরও সুদৃঢ় হ'ল এর পরের দুটোতে। সেখানে অবশ্য আরেক জাদুকরের জাদুর ছোঁয়া। শরদিন্দুর রহস্য উপন্যাস নিয়ে করা 'চিড়িয়াখানা'য় যখন উত্তমকে দেখলাম, কিরকম যেন অচেনা লাগল। এই ছবিতে মাণিকবাবু তাঁর থেকে যে স্তরের অভিনয় বার করে নিতে পেরেছেন, তার একমাত্র তুলনা বোধহয় মাণিকবাবুরই আরেক কালজয়ী ছবি 'নায়ক'। 'নায়ক' দেখতে দেখতে মনে হয়েছে (এবং পরে জেনেছি সেটাই সত্যি) যে শুধু উত্তমকুমার ছিলেন বলেই এরকম একটি কাহিনী ও চিত্রনাট্য মাথায় এসেছিল সত্যজিতের। এমন ফিল্ম আর কাকে কেন্দ্র করেই বা হতে পারত? পরবর্তী সাড়ে তিন দশকে আরো অজস্রবার দেখেছি এদুটি ছবি। ডিভিডিতে, ইউটিউবে, বুকের গোপন ছবিঘরে।

আজ এতবছর পরে পিছনে তাকিয়ে আক্ষেপ হয় উত্তম ও তাঁর শিল্পকে ঠিকঠাক জানতে, বুঝতে, মূল্যায়ণ করতে বড় দেরী হয়ে গেল আমার। শুধু তো শিল্প নয়, তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বা আর পেশাবহির্ভূত অবদানের ব্যাপ্তি বা পরিধির কথাও বই পড়ে জেনেছি অনেক পরে। জেনেছি শিল্পীজীবনের প্রাথমিক ব্যর্থতা আর হতাশা কাটিয়ে আপন পরিশ্রমে আর নিষ্ঠায় বাংলা চলচ্চিত্র জগতের শীর্ষশিখরে ওঠার পরেও মানুষ হিসেবে কতখানি মাটিতে পা রেখে চলতেন তিনি। শুনেছি প্রতিশোধ-প্রতিহিংসায় বিশ্বাস করতেন না বলে তাঁর দুঃসময়ে তাঁকে চরম অবজ্ঞা করা পরিচালকের দ্বিচারিতা বা মুম্বাইয়ে হিন্দী ছবি প্রযোজনায় তাঁকে সফল হতে না দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শিল্পী-শিল্পকর্মীদের চূড়ান্ত অসহযোগিতার পরেও তাঁদের সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহার করেছেন। প্রথমে 'অভিনেতৃ সংঘ' নামক বাঙালি শিল্পী ও কলাকুশলীদের সংগঠনের মাধ্যমে আর পরে সেখানকার কিছু কিছু বামপন্থী সদস্যের সঙ্গে মতান্তরে ফলে বেরিয়ে এসে 'শিল্পী সংসদ' তৈরী করে বাংলার চলচ্চিত্র জগৎ ছাড়াও থিয়েটার, যাত্রা ও সঙ্গীত জগতের বহু দুঃস্থ মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রচারের আলোর বাইরে নিঃশব্দে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন আরও অসংখ্য মানুষের জীবনে – কখনো কারুর পড়াশোনার বা ব্যয়সাপেক্ষ চিকিৎসার খরচ জুগিয়ে, কখনো আবার কারুর মেয়ের বিয়ে টাকার অভাবে আটকে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে। রূপালি পর্দার বাইরে জীবনমঞ্চের বাস্তবভূমিতেও মানবতার মাপকাঠিতে তিনি মহানায়ক।

২৪এ জুলাই দিনটা বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন কারণে স্মরণীয়। উত্তমপ্রেমীদের হৃদয়ে ওই দিনটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নক্ষত্রহারা হওয়ার দুঃখভারাক্রান্ত স্মৃতি। আমি ১৯৮০ সালের সেইদিনে তখনও প্রাইমারী স্কুলে। আজও মনে পড়ে স্কুল থেকে ফিরে তাঁর চিরবিদায়ের খবর প্রথমবার শোনার মুহূর্তটা। তারপর সন্ধ্যায় টিভিতে দেখা মহানগরীর রাস্তায় তাঁর শোকযাত্রায় মানুষের ঢল। আমি অবশ্য মনে করি এই দিনটা ছিল মৃত্যুর পরাজয় দিবস। সে চেষ্টা করল বাঙালির প্রাণপুরুষকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে, কিন্তু পারল কই? আজও, প্রায় অর্ধশতাব্দী পরেও, বাঙালির সাংস্কৃতিক আকাশে তিনি যেমনটি ছিলেন ঠিক সেইরকমই আছেন – এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা হয়ে। তাঁর 'পথে হল দেরী'-র নায়িকার মতোই বাংলার সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ আজও অশ্রুসজল চোখে বলে উঠতে চায়, "কিছুক্ষণ আরও নাহয় রহিতে কাছে..."



সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি

সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

সকালবেলা মুরালি বাড়ি বাড়ি ঘুরে বলে গেল, "মাদ্রাজ থেকে একজন বীণাবাদক এসেছেন আমাদের বাড়িতে। বিকেল পাঁচটা থেকে তিনি আমাদের বারান্দায় বীণা বাজাবেন, তোমরা সবাই এসো।"

শ্রীনিকেতনে কুঠিবাড়ির উত্তরে বকুলতলার পরেই রাস্তার দুদিকে মুখোমুখি যেদুটি অসাধারণ নান্দনিক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ বাড়ি ছিল, তারই একটাতে তিন সন্তানকে নিয়ে বাস করতেন শ্রীনিবাসনজী আর তাঁর স্ত্রী পদ্মাদি। শ্রীনিবাসনজী ছিলেন শিল্পসদনের বয়ন বিভাগের একজন অভিজ্ঞ কর্মী। শুধু কর্মীই নন, তাঁর উদ্ভাবনী ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। নতুন মডেলের তাঁতযন্ত্র বার করে তিনি সর্বভারতীয় পুরস্কারও পেয়েছিলেন। পদ্মাদি গাইতেন গান আর বাজাতেন বীণা। তাঁদের বাড়ির খোলা বারান্দায় মাঝেমাঝেই গান-বাজনার আসর বসত। রুরাল ইনস্টিটিউট (পরে পল্লী শিক্ষাসদন) পাড়ায় থাকতেন বেশ কয়েকটি দক্ষিণী পরিবার। তাঁরা আসতেন সেইসব আসরে। রবীন্দ্রনাথের লেখায় বারে বারে বীণার উল্লেখ পেয়েছি, কিন্তু আসল বীণা প্রথম দেখেছিলাম সেই ছোটবেলায় পদ্মাদির বাড়িতে। অনেকটা সেতারের মতো দেখতে একটি তার যন্ত্র, দুদিকে দুটি লাউ আছে, একটি ছোট, একটি বড়, যন্ত্রটিকে মাটিতে বা কোলের উপর রেখে বাজানো হয়। সেদিনের আসর চলল প্রায় রাত আটটা পর্যন্ত। প্রথমে অতিথি শিল্পী বাজালেন বীণা, তারপর পদ্মাদি গাইলে গান। তখন রাগসঙ্গীত কিছুই বুঝি না। তবে কর্ণাটকী সুরের ধরণ যে আমাদের শোনা উত্তর ভারতীয় সুরের থেকে আলাদা সেটা বুঝেছিলাম। প্রায় একইরকম দেখতে রাস্তার ওপারে যে বাড়িটি ছিল সেখানে তখন থাকতেন তারকজ্যেঠু (ধর মশাই)। প্রথম যখন চিপকুঠিতে সরকারি ব্লক ডেভালাপমেন্ট অফিস কাজ শুরু করল তখন পল্লীসংগঠন বিভাগ থেকে তারকজ্যেঠুকে ডেপুটেশনে বিডিও করে সেখানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। ঐ বাড়ির খোলা বারান্দায় কত সময় কত অনুষ্ঠানের রিহার্সাল হয়েছে, নাচগান হয়েছে। শুনেছি একসময় ওখানে ছোট নাটকও হয়েছে। আমাদের পাড়ায় ছোট ছেলেমেয়েদের একটা দল ছিল। পাড়ার যে কোনো বাড়ির যে কোন বারান্দায় আমরা যখন তখন গিয়ে আমাদের খেলা জমাতে পারতাম। গৃহস্বামীর সেখানে বাধা দেবার কোনো অধিকারই ছিল না। খুব জোর তিনি বেরিয়ে এসে বলতে পারতেন, "এই তোরা বেশি চেঁচামেচি করবি না, কাজের অসুবিধে হচ্ছে।" কত রকমের যে খেলা ছিল – রুমালচোর, নাম পাতাপাতি, কুমিরডাঙ্গা আরো কত কী, আর যখন তখন নাচগান, মেলায় যাত্রা দেখে এসে তার ডায়লগ বলা, সার্কাস দেখে এসে সবাই ক্লাউন সাজা এসব চলতেই থাকত। না, আমাদের কোনো ঠাকুরদা সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন না, সামনে কাশের বনও ছিল না এবং পিছনে তাড়া দেবার মতো কোনো লক্ষেশ্বরও ছিল না। তবে বাড়িতে বাড়িতে শিউলি ফুলের গাছ ছিল, সাদা ফুলেভরা কাঠটগর গাছের বেড়া ছিল, আর কাঁকর, মাটি আর শিশিরভেজা ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াবার মতো পা ছিল। তাই শরৎকাল আসলে আমরা এমনিই বুঝে যেতাম। পাড়ার মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তার দুদিকের আমলকি গাছগুলো যখন পাতা ঝরাতে শুরু করত আর ডালগুলো ভরে যেত বড় বড় আমলকিতে, বাড়িতে বাড়িতে গেঁদা, ফেয়ারি কুইন, আর কসমসের মেলা বসত, আর ইন্দুকাকার বাড়ির টিনের চালার বারান্দার সামনে লোক দাঁড়িয়ে যেত ইয়া বড় বড় ডালিয়া আর চন্দ্রমল্লিকা দেখতে। শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতেও আমাদের বুকটা ফুলে উঠত। মনে মনে শহরের আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে বলতাম, "শ্রীনিকেতনে এসে দেখে যাও শীত কেমন পড়েছে।" তখন কত রকমারি ফল, ফুলের গাছ আমাদের বাড়িগুলোতে ছিল এবং রাস্তার ধারে ধারেও ছিল। শুনেছি রথী ঠাকুরের পরিকল্পনামতো সেসব গাছ লাগানো হয়েছিল। কখন বসন্ত এল, কখন কালবৈশাখীর ঝড় আসছে, কদম ফুলের গন্ধ জানান দিত – 'বৃষ্টি এলো বলে', এসব বুঝতে আমাদের একটুও অসুবিধা হতো না। শুনেছি এক স্কটিস টাউন প্ল্যানার আর্থার গেডেস তাঁর বাবা বিখ্যাত টাউন প্ল্যানার প্যাট্রিক গেডেসের ইচ্ছা অনুসারে গুরুদেবের পল্লীউন্নয়ন কেন্দ্রটির বসতি-ব্যবস্থার রূপদান করতে উদ্যোগী হন। তাঁরই পরিকল্পনায় তৈরি হয়েছিল সাবেক শ্রীনিকেতেনের বাড়ি-ঘর-রাস্তা-ঘাট। প্রকৃতি ও সমাজের কথা মাথায় রেখে বসতি পরিকল্পনা করাই ছিল তাঁদের ঘরাণা। ভাবলে অবাক লাগে একজন বিদেশী ইউরোপিয়ান বুঝে গেলেন প্রয়োজনের সঙ্গে সৌন্দর্যকে

মিলিয়ে গুরুদেবের সেই 'শ্রী'-এর আসন পাতার ইচ্ছাটি, যা আজও আমরা বুঝতে পারলাম না! শান্তিনিকেতনের একটি অলিখিত আইন ছিল – 'বাড়ির মাথা গাছের মাথা ছাড়াবে না'। সেই নিয়ম মেনেই গড়ে উঠল এই পল্লীটি। টিনের ছাদের বারান্দা দেওয়া বাংলো ধরনের পাকাবাড়ি, টালির ছাদের বারান্দাযুক্ত পাকাবাড়ি, পাকা ভিতের উপর মাটির ও খড়ের চারচালা বাড়ি, সাঁওতাল গ্রামের বাড়িগুলোর মতো কালো আলকাতরা মাখানো মাটির দোতলা বাড়ি, আরো নানারকম শান্তিনিকেতনের নিজস্ব রীতির ঘরবাড়ি নিয়ে সেজে উঠল শ্রীনিকেতন। সেখানে ছিল না শহুরে বাস্তুতন্ত্রের ঔদ্ধত্য, ছিল প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে জীবন যাপনের আদর্শ ব্যবস্থা, আর ছিল অনাড়ম্বর সামাজিক জীবন।

একদিন হেমন্তকাকার মেয়ে খুকু (সুপ্রিয়া) এসে খবর দিয়ে গেল, "আমাদের বাড়িতে আজ হরির লুট্ হবে তোমরা সবাই এসো।" হেমন্তকাকা ছিলেন এক অদ্ভুত মানুষ। ১৯২৫ সালে তিনি শুধু গীতাঞ্জলির কবিকে প্রণাম করবেন বলে পাবনা জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে বহুকষ্ট করে, বন্ধুর কাছে টাকা ধার নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছান। তার আগে তিনি শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এখানে এসে তাঁর কালীমোহনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তিনিই তাঁকে শ্রীনিকেতনে পল্লীসেবা বিভাগে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেন এবং হেমন্তকাকা কাজে যোগ দেন। এক সময়ে তাঁর একনিষ্ঠ পল্লীসেবার কাজের কথা শুনে গুরুদেব তাঁকে ডেকে পাঠান। সেইবারই হয় তাঁর প্রথম কবি প্রণাম। শুনেছি তাঁকে ইংল্যান্ডে এলমহার্স্ট সাহেবের সংস্থা ডারটিংটন হলে পাঠানো হয়েছিল সুতোয় রঙ করার পদ্ধতি শেখবার জন্য। খুকুরা অনেক ভাই-বোন, থাকত কালো মাটির দোতলা বাড়িগুলোর একটাতে। বাড়ির ভিতরের দিকে ছিল মাটি-নিকানো সুন্দর উঠোন। তারই একপাশে ছিল তুলসী-মঞ্চ। সেখানে প্রদীপের আলোয় সন্ধ্যেবেলায় পুজো হতো, আমরা পাড়ার সবাই গিয়ে সেখানে হাজির হতাম। পুজো হয়ে গেলে সবাই হাতে তালি দিয়ে গান ধরতাম –

লাগল হরি লুটের বাহার, লুইট্যা নেরে তোরা,
জোড়া জোড়া ফুল বাতাসা, মন্ডা জোড়া জোড়া।
খোঁড়া নাচে, বোবা গায়, অন্ধ নয়ন মেলে চায়।
লাগল হরি লুটের বাহার লুইট্যা নেরে তোরা –

একটা বড় পেতলের থালায় উঁচু করে রাখা থাকত বাতাসা। একসময় পুরুতমশাই ছুঁড়ে দিতেন সেই বাতাসা উঠোনের মধ্যে। হুড়োহুড়ি করে আমরা সবাই কুড়োতে থাকতাম। কে কটা কুড়োলো তাই নিয়ে চলত কম্পিটিশন। পরে আলাদা করে সবাইকে দেওয়া হতো ফল, মন্ডা প্রভৃতি প্রসাদ। আমরা মাথায় ঠেকিয়ে সেই প্রসাদ খেয়ে বাড়ি আসতাম।

"এমনি আমার সাদাসিধে স্বর্গপুরী,
তাইতো আমার মনটি সেথায় গেছে চুরি।"

(যতীন্দ্রমোহন বাগচী)

একদিন খবর এল আমাদের বাড়িতে 'বনফুল' আসছেন। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের জানানো হয়ে গেল সেই খবর। একজন বলল, "বনফুল কে রে?"

- "বনফুল জানিস না? নাম করা লেখক।" আমি যেন কত জানি! সারাটা দিন কাটল বনফুলকে কখন দেখব সেই চিন্তায়। বনফুল নামটার মধ্যেই এমন একটা সম্মোহনী ব্যাপার আছে সারাদিন যার সৌরভ কল্পনায় ছড়িয়ে পড়ে। সন্ধ্যের মুখে তিনি এলেন, সস্ত্রীক। দেখলাম বাবা তাঁকে বলাইদা বলে সম্বোধন করেন। একটা ঘিয়ে রংয়ের সিল্কের পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা সাদামাটা খাটো চেহারার ফর্সা, গোলগাল একজন মানুষ, গলার স্বর একটু সরুর দিকেই। তারপর বসার ঘরে অনেকক্ষণ ধরে হাসি-গল্প চলল; মা, দিদি, ওঁর স্ত্রী, সকলেই সে আড্ডায় যোগ দিলেন, শুধু আমি কেমন চুপসে গিয়ে বারান্দার এক কোণে বসে রইলাম। সারাদিন ধরে যে বনফুল মনের মধ্যে ফুটে উঠেছিল এ বনফুল সে বনফুল নয়। হ্যাঁ, এঁকে বলাইদা বলা যেতেই পারে, কিন্তু... বনফুল? না, না, মানতে পারছি না।

এরকম কত নামকরা লোকজনের আনাগোনা ছিল আমাদের পাড়ায়। একদিন বাড়িতে কাজের লোক আসেনি, বিকেলের দিকে মা ঝাঁটা হাতে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছেন আর আমি গুলতি হাতে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছি হঠাৎ দেখি একদল লোক হুমহুম করে আমাদের বাড়িতে ঢুকছে। সারির সামনে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক মাকে জিজ্ঞেস করলেন প্রভাত বাড়ি আছে? মা ততক্ষণে হাতের ঝাঁটা রেখে মাথায় কাপড় তুলে দিয়েছেন, বললেন, "না, উনি তো বেরিয়েছেন, আপনারা

বসুন না।" কিন্তু ঐ গোটা বারো-চোদ্দো লোককে বসতে দেবে কোথায়? 'কুছ পরোয়া নেহি', বলার আগেই তারা অনেকেই বারান্দার মেঝেতে বসে পড়েছে। বোঝা গেল তারা অনেকটা হেঁটে ক্লান্ত। মা তাদের জল দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ভদ্রলোক বললেন, "বৌঠান, আপনি কেমন আছেন?" সবাইকে জল দিতে দিতে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন মা। আমি একটু দূর থেকে সবাইকে লক্ষ্য করছিলাম। কী কথাবার্তা হচ্ছে ঠিক শুনতে পাচ্ছিলাম না। একটু পরে দেখলাম সবাই আবার হন হন করে বেরিয়ে চলে গেল। আমি তখন কাছে এসে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, "মা, এরা কারা?" মা বললেন, "উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী – নবকৃষ্ণ চৌধুরী, তোর বাবা আর উনি একই সঙ্গে পড়েছেন শান্তিনিকেতনে।"

- "সেকী? মুখ্যমন্ত্রী! পিছনে পেয়াদা নেই, পুলিস নেই!"

মা বললেন, "উনি ওইরকমই। উনি এরকমভাবে ঘোরেন বলে ওঁর সম্বন্ধে অনেক মজার গল্প আছে।"

(হয়তো পুলিস ছিল সাদা পোশাকে, আমরা বুঝতে পারিনি)।

মনে পড়ে গেল আরো ছোটবেলার একটা ঘটনা। হঠাৎ খবর এল নেপালের রাজা এসেছেন শ্রীনিকেতনে। দিদির হাত ধরে ছুটলাম রাজা দেখতে। শিল্পসদনের সামনে বিরাট ভিড়, পুলিসরা লাইন করে দাঁড়িয়ে, রাজা ঢুকেছেন শিল্পসদনের শোরুমে। আমি ছোট মানুষ, ভিড়ের ফাঁক-ফোকর দিয়ে যেটুকু দেখতে পেলাম – একদল মানুষ শোরুম থেকে বেরিয়ে আসছে, তাদের বেশিরভাগই কোট-প্যান্ট পরা কেউ কেউ চোস্ত পাজামা আর পাঞ্জাবির ওপর কোট, তার মধ্যে একজন লম্বা-চওড়া সুপুরুষ মানুষ মাথায় উষ্ণীষ, সাদা কোটের উপর রঙবেরঙের ব্যাচ, বাহারি কর্ড সব লাগানো রয়েছে, তাঁকে দেখে সত্যিই রাজার মতো লাগছে। আমি যতটুকু পারলাম মুগ্ধ হয়ে রাজার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ফিরে আসার পথে দিদি জিজ্ঞেস করল, "কীরে রাজা দেখলি?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, কী সুন্দর চেহারা। মাথায় কী সুন্দর পাগড়ি।" দিদি বলল, "দূর বোকা, ও তো রাজার পেয়াদা। ও রাজার পিছনে পিছনে হাঁটছিল।"

তাহলে! রাজা কোনজন আমি আজ অবধি তার হদিস পাইনি।

তবে উত্তেজনা চরমে উঠেছিল যেদিন তারকজ্যেঠুর ছোট ছেলে ছোটোন খবর দিল তাদের বাড়িতে কাল পি সি সরকার আসবেন। বোলপুরের বিচিত্রা সিনেমা হলে পি সি সরকারের (সিনিয়ার) ম্যাজিক শো ছিল। তারকজ্যেঠু তাঁর গ্রামের ছেলে, তাই একদিন দুপুরে তারকজ্যেঠুর বাড়িতে তাঁর খাবার নেমন্তন্ন হ'ল। ছোটোনের খাতির বেড়ে গেল। বাড়ি থেকে ছোটোনকে বলে দেওয়া হয়েছিল এই খবর একদম গোপন রাখতে। কিন্তু তাই কি হয়? দু'চারজন তো জেনে যাবেই। নির্দিষ্ট দিনে পি সি সরকার এলেন, সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, তারকজ্যেঠুর সঙ্গে দেদার দেশের গল্প শুরু হ'ল, তাও আবার বাঙাল ভাষায়। তিনি বুঝতে পারছিলেন কিনা জানি না যে বাড়ির আনাচ-কানাচ থেকে কয়েক জোড়া চোখ তাঁকে সর্বক্ষণ লক্ষ্য করে যাচ্ছে। চা জলখাবার দেওয়া থেকে দুপুরের খাওয়া পর্যন্ত কিছুই ঘটল না। তবে খাবার টেবিলে বসে তিনি এক মজার গল্প বললেন। ইংল্যান্ডে ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে একটি মেয়েকে মাঝামাঝি করাত দিয়ে পেট কেটে আবার জুড়ে দেওয়ার খেলাটা রীতিমত সাড়া ফেলে দিয়েছিল সে দেশে। খেলা চলাকালীন নাকি পুলিসে ফোনও হয়ে গিয়েছিল। তার পরেই তাঁর খ্যাতি ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকী সস্ত্রীক কোনো বড় ভোজসভায় যোগদান করার আমন্ত্রণ আসে তাঁর কাছে (রাণী নাকি কোনো লর্ডের ভোজসভা মনে নেই)।

"এদিকে আমার স্ত্রী তো পাঁচজনের সঙ্গে টেবিলে বইয়া কোনদিন খায় নাই। টেবিল ম্যানার্স জানব ক্যামনে। তখন ঐ ম্যাজিকের ফরমুলা অ্যাপ্লাই করলাম। তারে বললাম, 'শুনো তুমি আমার পাশেই বসো, অথবা উল্টোদিকে কোনো মহিলার পাশে বসো, সব সময়ে আমারে লক্ষ্য রাখবা। আমি যে হাত দিয়া যেটা ধরব তুমিও সেইটা সেই হাতে ধরবা। আমি যে জিনিসটা যেমনিভাবে খাব তুমিও তাই করবা বুঝেছ?' যাইহোক, ভালভাবেই সে যাত্রা পার হয়ে গেল।"

খাওয়ার পর তারকজ্যেঠু তাঁকে বললেন, "ছোটরা কয়েকজন অনেকক্ষণ ধরে তোমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য অপেক্ষা করছে, তাদের কি একটু সময় দেওয়া যাবে?"

তাঁর অনুমতি পেয়ে আমরা তো আপ্লুত।

তিনি বললেন, "হলের ভিতর তোমরা যেসব বড় বড় খেলা দেখো, যেমন গাড়ি ভ্যানিশ, বক্সের মধ্যে মানুষ ভ্যানিশ, এ সবই যন্ত্রের খেলা। আসল খেলা হ'ল যারা রাস্তায় বসে খেলা দেখায়। ছোটবেলায় বাবা মায়ের কাছে কত মার খেয়েছি, বকুনি খেয়েছি, পড়াশোনা না করে ওদের পিছনে ঘুরতাম বলে। তখন

কি তাঁরা জানতেন, এইটাই আমার পেশা হবে?"

তারপর কয়েকটা খেলার ট্রিক্স আমাদের বলেও দিলেন। একটা পেন হাতে নিয়ে নাড়াতে লাগলেন, সেটা নরম রবারের মতো হয়ে লগবগ করতে লাগল, আবার আমরা হাতে নিতেই সেটা শক্ত হয়ে গেল। একটা টাকার কয়েনকে দু'আঙুলের মধ্যে ধরে বেঁকিয়ে ফেলে আবার সমান করে দিলেন। এরকম কয়েকটা ছোট ট্রিক্স দেখিয়ে, আমাদের শিখিয়েও দিলেন। পি সি সরকারের এমন নিবিড় সান্নিধ্য পাবার পর আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী হতে পারে নিশ্চয়ই তা অনুমান করা যাচ্ছে, সে বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। এখন আমরা ফিরে আসি আমাদের শ্রীনিকেতনের মুরালিদের বাড়ির সেই বারান্দায়, যেখান থেকে সামনাসামনি দেখা যায় তারকজ্যেঠুদের বাড়ির অপূর্ব সুন্দর সেই বারান্দাটা। বড় যত্ন নিয়ে অনেক মাথা খাটিয়ে সুরেন কর মশাই আর রথী ঠাকুর এই বাড়িদুটোর পরিকল্পনা করেছিলেন। শুনেছি রথীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল একটিতে নিজে থাকবেন আর একটিতে এলমহার্স্ট বা তাঁর ডার্টিংটন হল থেকে যাঁরা আসবেন তাঁরা থাকবেন। কিন্তু তাঁর নিজের থাকা আর হয়ে ওঠেনি। এসব কথা ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ চেয়েছিলাম সেই বারান্দাটার দিকে – হঠাৎ দেখলাম, ঝলমলে চোগা-চাপকান পরা, মাথায় পাগড়ি, হাতে জাদুকাঠি, মুখে সেই স্মিত হাসি, পি সি সরকার দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের দিকে চেয়ে। এবার তিনি পিছন ফিরে বাড়িটার দিকে তাক করে তাঁর জাদু ছড়িটা ঘোরালেন – একটা ধোঁয়া এসে কিছুক্ষণের জন্য পর্দা ফেলে দিল। ধোঁয়াটা সরে যেতেই দেখি কয়েকজন মিস্তিরি কাজ করছে, সুরেন কর মশাই আর রথী ঠাকুর দাঁড়িয়ে বাড়ির গায়ের কারুকার্য কেমন হবে মিস্তিরিদের বোঝাচ্ছেন। সরকার মশাই এক গাল হাসি নিয়ে আমাদের দিকে ফিরে আর একবার জাদুকাঠিটা ঘোরালেন – দেখি বাড়িটা তৈরি হয়ে গেছে। বারান্দায় কালীমোহনবাবু আর হাফপ্যান্ট পরা এলমহার্স্ট সাহেব দুটো চেয়ারে বসে কিছু আলোচনা করছেন। সরকার মশাই একবার করে জাদুকাঠিটা ঘোরান আর একটার পর একটা দৃশ্য বেরিয়ে আসে। এক দৃশ্যে আসামের বিহু উৎসবের রিহার্সাল হচ্ছে ঐ বারান্দায়। ভূপেন হাজারিকার ভাই নৃপেন হাজারিকা (রুরাল ইনস্টিটিউটের ছাত্র ছিলেন) রিহার্সাল পরিচালনা করছেন। আসাম ও নর্থ-ইস্ট থেকে আসা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এখানকার মেয়েরাও একসঙ্গে নাচছে এবং গান গাইছে। তার পরেই তারকজ্যেঠুর এক মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠান চলছে। পরের দৃশ্য বৈদ্যনাথ ডাক্তারবাবুর বাবা বারান্দায় একটা তক্তপোষের উপর বসে কার সঙ্গে জানি দাবা খেলছেন। জাদুকাঠি আর একবার ঘোরাতেই দেখি ডাক্তার প্রদীপ আর দেবাশিস চায়ের পেয়ালা হাতে চেয়ারে বসে গল্প করছে। এবার জাদুকর হাত নাড়তেই হলুদ রঙের একটা আর্থ রিমুভার মেশিন যেন শূন্য থেকে আবির্ভূত হ'ল আর দেখা গেল তার সামনে এগিয়ে থাকা বিরাট বাকেটটার উপর খোদ পি সি সরকার দাঁড়িয়ে। বুঝলাম এবার মেশিনের খেলা শুরু হবে। আমাদের দিকে ফিরে যাদুকর মশাই জাদুছড়ি আর একপাক ঘুরিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "গিলি গিলি গিলি – যাঃ।" ব্যস, সব ভ্যানিশ, মেশিন সমেত পি সি সরকার নিজেও ভ্যানিশ, আর তাঁর সঙ্গে বাড়িটাও ভ্যানিশ।

রাস্তার উল্টোদিকে একইরকম দেখতে অন্য বাড়িটার জরাজীর্ণ বারান্দায় একরাশ শুকনো পাতা উড়ে বেড়াচ্ছে আর একজন টেকো আর একজন সাদা চুল বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে (যদিও আজকাল বুড়ো বলতে নেই, সিনিয়ার সিটিজিন বললে বয়সটা একটু কম লাগে)।

আমি বললাম, "শিবদাস, কী দেখলি?"

শিবদাস বলল, "এখন যা দেখছি সেইটে বলি, – সামনে ফাঁকা জায়গাটার উপর একটা স্কুটার আর কয়েকটা সাইকেল স্ট্যান্ড করা রয়েছে, আর তার পিছনেই দেখা যাচ্ছে খেলার মাঠ।"

আমি বললাম, "দেখলি তো ভেল্কি কাকে বলে!"

(রথী ঠাকুরদের স্বপ্নের এই অসাধারণ স্থাপত্যটি পুরোপুরি মুছে গেছে শ্রীনিকেতনের মাটি থেকে।)



কেউ আছে

ডাঃ শান্তনু মিত্র

...কেউ তো কোথাও আছে।
ধরা ছোঁয়ার অনেক দূরে...
অনুভূতির মাঝে।
প্রবল ঝড়ে বজ্রপাতে
রক্ষা করে সব বিপদে
সকাল সন্ধ্যা সাঁঝে।

...কেউ তো কোথাও আছে।
নইলে কে আর এমনভাবে
ভরিয়েছিল বিমানটাকে
এমন মানুষ দিয়ে...
দাঁতকে ছেড়ে প্রাণ বাঁচালো।
জলের ছুতোর প্লেন চালালো।
এই ক্ষমতা কে জোগালো?
কোন সে যাদুর প্যাঁচে?

...কেউ তো কোথাও আছে।
ছুরির ঘায়ে জখম চালক
কী ছিল তার রক্ষাকবচ
ভাসছে যখন মেঘে!
কে জোগালো শক্তি তাকে
খুলল গিয়ে দরজাটাকে
ঐ যাতনার মাঝে!

...কেউ তো কোথাও আছে।
একটু হলে এদিক ওদিক
দেখতে পেতাম অন্য ম্যাজিক
ধ্বংসলীলার মাঝে...
জোয়ান, শিশু, পুরুষ, নারী
সুস্থ শরীর ফিরল বাড়ি
আপনজনের কাছে।
...কেউ তো কোথাও আছে।



মনসঙ্গীত

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

মনের ভাবনা কত দিকে ধায়, দিয়ে যায় শুধু ফাঁকি,
মনকে আমার সতত যেন গো তোমার চরণে রাখি।

হও তারি সখা, রাখো তারে সাথে,
সুখে, দুখে, শোকে, আঁধারে, প্রভাতে।
তুমি ছাড়া নাহি কারো কাছে যেন, কোনও ঋণ রহে বাকি।
মনকে আমার সতত যেন গো তোমার চরণে রাখি।

দর্শনে যেন থাকে তব আলো,
চিন্তায় তব দিশা,
পূত পবিত্র হয় যেন বোধ
বাচনে তোমারি ভাষা।

এ জীবনে যেন সকলের মাঝে,
তোমার প্রেমের সুধা সুর বাজে।
পলকে পলকে সবারে আপনি তোমারই মহিমা ঢাকি।
মনকে আমার সতত যেন গো তোমার চরণে রাখি।

[গত মাসের (সেপ্টেম্বর) ২১ তারিখে ছিল বিশ্বশান্তি দিবস - World Peace Day | রাষ্ট্রসংঘের জেনারেল অ্যাসেম্বলি এই দিনটি পালনের সিদ্ধান্ত নেয় আজ থেকে ৪৫ বছর আগে, প্রথম পালিত হয় ১৯৮২ সালে | তো, এই বিগত সাড়ে চার দশকে পৃথিবীতে শান্তির খতিয়ান কি? স্কটল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের PeaceRep database-এর তথ্য অনুযায়ী এই সময়কালে আমাদের এই গ্রহে আড়াই হাজারেরও বেশী শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে আর দেড়শোরও বেশি শান্তিপ্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে | তার মানে বোঝা যাচ্ছে যুদ্ধ-দাঙ্গা-সংঘাতের সংখ্যা কত | কারণ, আগুন না জ্বললে তো আর ঘটা করে তাকে নেভানোর দরকার হয় না | এই মুহূর্তেই সারা দুনিয়ায় ছোট-বড় মিলিয়ে অন্ততঃ ১৩০টি সশস্ত্র সংঘাত চলছে | তবে শুধু যুদ্ধবিগ্রহই যে সব অশান্তির উৎস, তা তো নয় | আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, সমাজব্যবস্থায়, রাষ্ট্রব্যবস্থায়, মানুষে-মানুষে সম্পর্কে – সর্বত্র যেন ছড়িয়ে আছে অশান্তির বীজ | তাই "শান্তির ললিতবাণী" আজ প্রতি মুহূর্তে "ব্যর্থ পরিহাস" হয়ে কানে বাজে | কিন্তু কেন – কেন – কেন এই সর্বগ্রাসী অশান্তির কোনো শেষ নেই? গোড়াতেই কি কোনো গলদ থেকে যাচ্ছে? সেই দুধপুকুরের গল্পটার মতো আমরা প্রত্যেকেই কি নিজে ঢালছি জল কিন্তু আশা করছি পুকুরটা দুধে ভরে উঠবে? এইসব প্রশ্ন থেকেই আমার আজকের কবিতা – "শান্তি"]

শান্তি

সুজয় দত্ত

লাল সূর্যকে ঘিরে নীল গ্রহ খেয়ে চলে পাক |
জীবন ঘূর্ণিপাকে ঘুরে মরে মানুষের ঝাঁক |
কেউ থাকে বঞ্চিত, কেউ কেউ সবকিছু পায় |
কিন্তু জানে কি তারা – এ-জীবনে শান্তি কোথায়?

শহরে নগরে হাটে পল্লীগ্রামেতে গৃহকোণে
শান্তিবিহীন হিয়া হাহাকার করে ক্ষণে ক্ষণে |
কোথায় খুঁজবে তাকে? কোন দেশে? কোন অচিন পুরে?
মন্দিরে? মসজিদে? গীর্জায়? পথে পথে ঘুরে?

দেখোনি কি দেশে দেশে শান্তির আয়োজনে ব্যস্ত
শান্তিদূতেরা সব? মুখে বুলি, হাতে মারণাস্ত্র |
কাগজে-কলমে তারা ধ্বংস করে না – শুধু সৃষ্টি |
মাঝে মাঝে করে ফেলে মিসাইল আর বোমাবৃষ্টি |

তবে কি মন্ত্র, শাঁখ, ঘন্টার ধ্বনিতে, আজানে
শীতল শান্তিবারি সিঞ্চন করে দেবে প্রাণে?
গীতায়, কোরআনে আর বাইবেলে, গ্রন্থসাহেবে
বিশ্বাস করলেই শান্তির পথ বলে দেবে?

তাই যদি হবে, তবে যুগে যুগে অশান্তি কেন
ধ্বংসলীলায় গ্রাসে পৃথিবীকে দাবানল-হেন?
শান্তির পথ কেন বারে বারে মরীচিকা হয়ে
শূন্যে মিলিয়ে যায় – তৃষিত হৃদয় যায় রয়ে?

শান্তি সবাই চায় | দিতে পারে ক'জনই বা আর?
সবাই স্বপ্ন দেখে – সমুখে শান্তিপারাবার |
একফোঁটা ভালোবাসা দিয়েছ কি এ জীবনে কভু?
পারোনি? ভেবেছ বুঝি সে-সাগর শুকাবে না তবু?





প্রিয় শরৎ

কমলপ্রিয়া রায়

ফুলের মতোই নরম তুমি
ফুলের মতোই খুশী
মিষ্টি আলো জড়াও গায়ে
তাই তো ভালোবাসি।
নতুন রূপে আসো তুমি
বর্ষাঋতুর পরে
পৃথ্বী যেন তোমায় পেয়ে
সুরে সুরে ভরে।
আমার শরৎ বড়ই কচি
সোনা রঙটি মেখে
শিশুর মতো খেলা করে
সারা দিবস ব্যেপে।
ধানের ক্ষেতে সবুজ মাঠে
ছুটে বেড়ায় সে যে
কী যেন গান ধরবে বলে
তার মনের বীণা বাজে।
শিউলি ফুলের সাজটি যে তার
বড়ই ভালো লাগে
সবুজ সাদার পরশ পেয়ে
মনের ভাবটি জাগে।
সবার মনে রঙ ভরে দাও
আনন্দেরই দিনে
শরৎ তুমি ডাকো মোরে
হৃদয়খানি জিনে।

আমি

বাপন দেব লাড়ু

মৃত্যুকে মানুষ ভয় পায়,
কিন্তু কখনও ভেবে দেখে না,
যে 'আমি' মরবে সে আসলে কে।

এই শরীর?
যে শরীর প্রতিদিন একটু একটু করে বদলে যায়।

এই স্মৃতি?
যার অর্ধেকই সময় নিজের মতো করে লিখে দেয়।

নাকি সেই নাম,
যেটা জন্মের দিন অন্যেরা আমাকে দিয়ে গিয়েছিল?

আমি সারাজীবন নিজেকে খুঁজেছি
অন্যের দেওয়া আয়নায়,
তাই নিজের মুখটাও আমার কাছে অপরিচিত।

হয়তো 'আমি' বলে কিছু নেই,
আছে শুধু জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে
বয়ে যাওয়া একটুকরো সচেতনতা।

তবু এই সামান্য অস্তিত্বের ভেতরেই
আমরা চিরস্থায়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখি।

যে মানুষটি গতকাল ছিল,
আজ সে নেই;
যে মানুষটি আজ আছে,
আগামীকাল তাকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তাহলে অস্তিত্ব কি থাকা,
নাকি হারিয়ে যাওয়ার মাঝখানে
নিজেকে এক মুহূর্তের জন্য অনুভব করা?

হয়তো আমি কোনো স্থায়ী সত্তা নই,
আমি শুধু বিলীন হওয়ার আগে
নিজেকে 'আমি' বলে ডেকে ওঠা এক মুহূর্ত।

রাই...

দেবযানী সাহা

ঈশ্বর হওয়া বড় সহজ ছিল না,
মানুষ হয়ে তোমার চোখের জল দেখা
আরও অনেক কঠিন।

যেদিন রথের চাকা
ব্রজের মাটি ছিঁড়ে চলে গেল,
সেদিন শুধু পথ নয়,
আমার বুকও দুভাগ হয়ে গিয়েছিল।

তুমি দেখেছিলে চাকার দাগ –
দেখোনি,
প্রতিটি দাগের নিচে লুকিয়ে ছিল
আমার না-বলা আর্তনাদ।

রাজমুকুট মাথায় ওঠে,
কিন্তু তার
ময়ূর পেখমের দিনগুলো
আজও কাঁদে।

দ্বারকা আমাকে রাজা বলেছে,
পৃথিবী আমাকে ঈশ্বর করেছে,
শুধু তুমি...
তুমিই আমাকে 'কৃষ্ণ' বলে ডেকেছিলে।

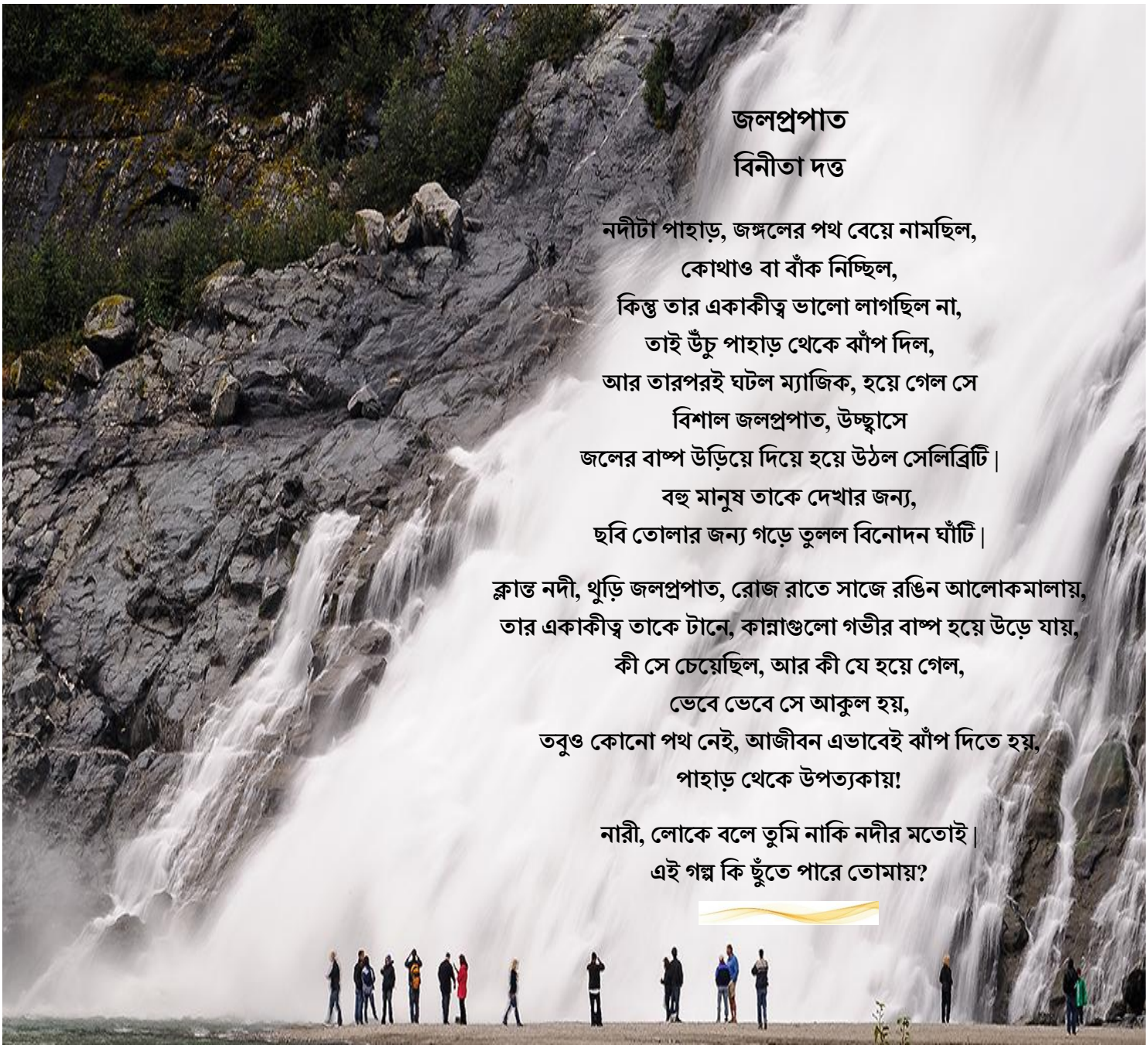
তাই আজও
অগণিত আরতির আলোয়
একফোঁটা বৃন্দাবনের সন্ধ্যা খুঁজি,
অসংখ্য প্রার্থনার ভিড়ে শুনি –
কোথাও কি এখনও
রাধা অভিমানে চুপ করে আছে?

জেনো,
ভক্তি আমাকে পূর্ণ করে না,
স্তব আমাকে শান্তি দেয় না।
প্রেমের কাছে ঈশ্বরও চিরকাল ঋণী।

যদি আবার কোনো জন্মে
রথ আর রাজদণ্ডের মধ্যে
বেছে নিতে হয়,
তবে এবার আমি ঈশ্বর হব না...

তোমার তমালতলে
একজন সাধারণ বাঁশিওয়ালা হয়েই
সারাজীবন
রাধার অপেক্ষায় বসে থাকব।





জলপ্রপাত

বিনীতা দত্ত

নদীটা পাহাড়, জঙ্গলের পথ বেয়ে নামছিল,
কোথাও বা বাঁক নিচ্ছিল,
কিন্তু তার একাকীত্ব ভালো লাগছিল না,
তাই উঁচু পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিল,
আর তারপরই ঘটল ম্যাজিক, হয়ে গেল সে
বিশাল জলপ্রপাত, উচ্ছ্বাসে
জলের বাষ্প উড়িয়ে দিয়ে হয়ে উঠল সেলিব্রিটি।
বহু মানুষ তাকে দেখার জন্য,
ছবি তোলার জন্য গড়ে তুলল বিনোদন ঘাঁটি।

ক্লান্ত নদী, থুড়ি জলপ্রপাত, রোজ রাতে সাজে রঙিন আলোকমালায়,
তার একাকীত্ব তাকে টানে, কান্নাগুলো গভীর বাষ্প হয়ে উড়ে যায়,
কী সে চেয়েছিল, আর কী যে হয়ে গেল,
ভেবে ভেবে সে আকুল হয়,
তবুও কোনো পথ নেই, আজীবন এভাবেই ঝাঁপ দিতে হয়,
পাহাড় থেকে উপত্যকায়!

নারী, লোকে বলে তুমি নাকি নদীর মতোই।
এই গল্প কি ছুঁতে পারে তোমায়?

সৃষ্টি

সুশোভন মুখোপাধ্যায়

শিল্পী প্রতিমা গড়ে
তিল তিল করে
সৃষ্টি হয় মৃন্ময়ী রূপ।

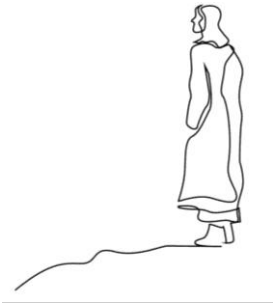
যদিও সে জানে নিশ্চিত,
সৃষ্টির পাঁচদিন আয়ু
মাত্র পাঁচদিন,

তারপর বিসর্জন,
সৃষ্টি তার জলের গভীরে
হবেই বিলীন।

তবু তার সৃষ্টিকর্মে ঢেলে দেয় প্রাণ
এরই নাম সৃষ্টি সুখ
জীবনের পরম আঘ্রাণ!

তেমনই মানুষের এই ক্ষুদ্র প্রাণ,
জন্ম হয়, মৃত্যু আসে, মাঝখানে চলে
শুধু সৃষ্টির আনন্দ সন্ধান!





প্রহর শেষে

সুশোভন মুখোপাধ্যায়

জীবনের সব কাজ শেষ হয়ে এলে,
মুখোমুখি বসার সময়।
তখন ক্লান্তি নেমে আসে
বিহঙ্গের হলুদ ডানায়।

তখন রবিচ্ছায়া দীর্ঘ হয়ে আসে,
ম্লান হয় বিকেলের আলো
তখনই তো হৃদয়ের আলো
জ্বালার সময়।

বরিষণ শেষে, পল্লবের প্রান্ত থেকে ঝরে পড়া
বারি বিন্দুসম, ফেলে আসা দিনগুলি
স্মৃতিপথ বেয়ে এসে
জমা হয় বুকের ভিতর।

তখনই তো
পরস্পর ছুঁয়ে থেকে অমৃত সুধায়
ভরে নিতে হয়
জীবনের অবশিষ্ট ক্লান্ত প্রহর!

বাংলার ঘরে উমা

ডাঃ নিবেদিতা গাঙ্গুলী

রোদ্দুর খুঁজি চল আমরা
আগমনী সুর সে তো বাজবেই,
মেঘে ঢাকা আকাশের ঘোমটা
সরিয়ে সোনারোদ সাজবেই,
এই হ'ল বাঙালির অনুভব
বাংলার ঘরে উমা আসবেই।

ওই দেখো বাংলার প্রান্তর
সেইখানে কাশফুল ফুটবেই,
ঝরে যাওয়া শিউলির গন্ধে
বাংলার প্রাণ ভরে উঠবেই...
এই হ'ল বাঙালির অনুভব
বাংলার ঘরে উমা আসবেই।

ওই দেখো ঢাকিদের নর্তন
মঙ্গলশঙ্খ তো বাজবেই
প্রদীপের আলো ধূপ চন্দন,
আঙ্গিনায় আলপনা সাজবেই
এই হ'ল বাঙালির অনুভব
বাংলার ঘরে উমা আসবেই।

দুর্গার শতরূপে রমণী
শক্তির মহারূপ অঙ্গে,
অসুর নিধন রণরঙ্গে
ত্রিনয়নী ত্রিভুবন জননী,
এই হ'ল বাঙালির অনুভব
বাংলার ঘরে উমা আসবেই।





সমুদ্র এসেছিল ঝাউবনে

দেবাশিস মজুমদার

সমুদ্র এসেছিল ঝাউবনে
রূপালী চাঁদের রাতে গভীরে গোপনে।

আকাশে ডেকেছে পাখি ঘুমভাঙা
জোয়ারের জলে ঢাকা পাথরের ডাঙা।

জোয়ারের জলে ছিল অভিমান, রাগ
ক্ষোভ, দুঃখ, প্রেম, ভুলে-যাওয়া।
দুরন্ত হাওয়া –
ছিল তাতে
ভালবাসা, নখরে ও দাঁতে।

কাঁপে ঝাউবন
অজানা সুখে।
সমুদ্রের দাগ
বালুচরী বুকে।

যদি তুমি শিশুর মতো ভালোবাসতে না পারো

আলী তারেক

আমি বলেছিলাম:
কখনও কখনও তোমাকে আমি
শিশুর মতো ভালোবাসি।

তোমার জীবন-বিধ্বস্ত মুখে
নানা পরাজয়ের বার্ধক্য-চিহ্নের ভেতর
নদী খাল নালার শুকোনো মানচিত্রে,
তোমার শীর্ণ হয়ে আসা কেশরাজি
ফাটলধরা গোড়ালির কাঠিন্যের ভেতরেও
মাঝে মাঝে নিঃশব্দে খিলখিল হেসে ওঠে
প্রবীণতম চরাচরের মতো এক শিশু।

তোমার কাঁধ নুয়ে আসা
ব্যথাভার লুকানো গাম্ভীর্য,
তোমার অন্তহীন জ্বালা-যন্ত্রণায়
দমিত ক্রোধের বিস্ফোরণে
নৃশংসতম প্রকাশের ভেতরেও
কখনো কখনো ঝরে পড়ে
বালখিল্য অভিমানের নির্ঝর।

তাই ধরিত্রী-সমান ক্লান্তিভারে
ভারানত তোমার সুষুপ্ত শরীর ঢেকে দিই
আমার প্রেমারক্ত শরীরের উষ্ণতায়।

অযত্ন-লালিত ক্ষুৎপিপাসায়
সাজিয়ে তুলি মাতৃস্তনসম মমতায়
আহার্য-পানীয়ের সম্ভার।

তোমার আহত অহংয়ের
রক্তাভ ক্ষতে ঢেলে দিই
চুম্বনের দুঃখাণু-রোধী প্রলেপ।

তুমি বলেছ:
যদি তুমি শিশুর মতো ভালোবাসতে না পারো
তবে সেটা ভালোবাসাই নয় –
ভালোবাসার প্রয়াস মাত্র।

তীর্থযাত্রার পথে
দূরকে দূরতর মরীচিকায় ডুবিয়ে
কেবল অবসন্ন পায়ে এগিয়ে চলা।

যদি আমাকে ভালোবাসতেই চাও
তাহলে আমার শিশুটিকে আগে চেনো।

আমার গহীন ভেতরে সেই
নিরস্ত্র, নিরাবরণ, অরক্ষিত, অসহায়
শিশুটিকে আগে খুঁজে নাও –
তারপর তাকেই ভালোবাসো,
তাছাড়া আর কোনো ভালোবাসা নেই।

যদি এখনও সেই আরাধ্যভূমিকে কেন্দ্র করে
কেবলি চলে তোমার পরিক্রমা,
তবে তোমার সন্ধান হোক সেই অমলতার জন্য।

তাই নিজে হয়ে ওঠো শিশু –
খুলে ফেলো তোমার কবচ শিরস্ত্রাণ
তোমার বক্ষবর্ম, উত্তরীয়, উষ্ণীষ,
ছুঁড়ে ফেলো তোমার ঢাল, রক্ষাফলক –
শিশু হয়ে এসো এই শিশুতীর্থে।

যদি তুমি শিশুর মতো ভালোবাসতে না পারো
তবে সেটা ভালোবাসাই নয়



কান্না আমাকে বলল ডেকে

আলী তারেক

আস্তিনের ভাঁজ, রুমালের আঁশ,
অথবা একটা ভেজা হাসি,
নয়তো নেহাত হাতের পিঠ –
এসব পাহাড়, দেয়াল, পর্দার আড়ালে
কান্নাকে আড়াল করে পা ফেলেছিলাম
আরেকটু উজ্জ্বল বাতাসের মুখ ছুঁবো বলে –
সাগরের ঢেউয়ে হাসির চূড়ার ভঙ্গুর ফেনা
দু'হাতে ভাঙব বলে –

ঠিক তখন, কান্না আমাকে বলল ডেকে –
ফেলে রেখে যাবে, যাও,
কিন্তু ভুলে যেয়ো না,
তোমার এতসব পাহাড়ের আড়ালে
আমিই শুধু রয়ে যাব বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা হয়ে
আমিই কেবল থাকব বেঁচে নির্ভরতার প্রতিমূর্তি হয়ে।
উজ্জ্বল পাথরের ধারালো ঘায়ে
তোমার পায়ে যখন ঝরবে রক্ত – অকরুণ লাল,
ফোঁটায় ফোঁটায়
আমারই নোনা জলে মুছে যাবে বেদনার সে রঙ,
আমারই জলের আঘাতে এমনকি পাথরের ধার হবে কোমল।
যদি তৃপ্তির ভার কখনো হয়ে ওঠে অসহনীয় –
আমারই প্লবতায় লঘুতর হবে সে বোঝা,
যদি সুখ কখনো খেলে প্রতারণার চাল,
বনবাসী এই দুয়োরানী তোমার
দু'বাহুতে রাখবে ধরে তোমার শীত-বসন্ত।

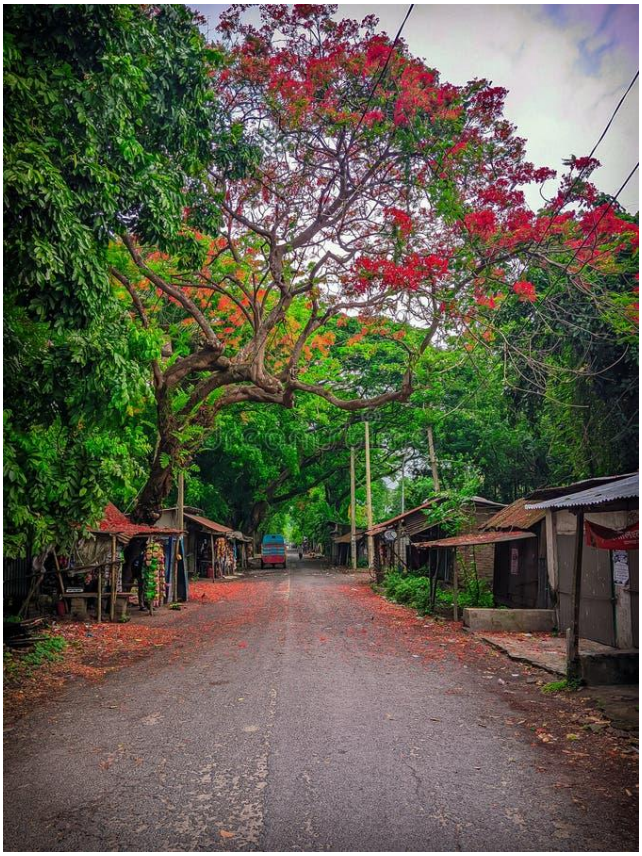
কিংবা ভুলে যদি যেতেই চাও, তবে যেয়ো,
সে তো আর থাকবে না তুমি,
শরীর থেকে যদি ঝেড়ে ফেলো কান্নার জল,
তবে আড়াল-পাহাড়ের উপত্যকায়
পথ হারানো নিরর্থক কিছু হাসির প্রতিধ্বনি ছাড়া
তোমার থেকে আর কিই-বা বাকি থাকে?
– কান্না আমাকে বলল ডেকে।



ভাতা

শঙ্কর তালুকদার

দেশের কথা কে ভাবত
কে দিত ভাতা
নিজেরটুকু গুছিয়ে ওরা
দিব্যি দিত হাঁটা।
এখন দেখ শাশকদলের
রোজই কুস্তি হয়
এ উপরে ও নীচে
মিথ্যে সে তো নয়।
আমরা সব দলে দলে
ভাতার পিছে ছুটি
চাকরি যাক, ইজ্জত যাক
পায়ে তবু লুটি।
দেশের কথা ভেবে ভেবে
নিত্য নতুন ফাঁদ
স্বাস্থ্য, শিক্ষা বেকারত্বে
কোথাও নেই ফাঁক।
দিনে দিনে তবু আমরা
ভাতার লোভে চলি
মান অপমান শিকেয় তুলে
ওদের মতোই বলি।
স্বপ্ন শুধু রাতের ঘোরে
মিছে কান্না করে
সকাল হলে ফার্স্ট বয়
আর লাস্ট বয় একই দোলায় দোলে।
ভাতা আমার নিচ্ছে কেড়ে
মান সম্মান যত
স্বাধীনচেতা মন হারিয়ে
সবার কাছে নত।
আসছে ভোট, বাজছে সানাই
ভাতার কর্মসূচি
কে কে বিক্রি হবে
লাইনে দাঁড়াও দেখি।



একদিন

শঙ্কর তালুকদার

কাজের ভিড়ে ছিলাম
ছিল নিত্য বিনোদন
সময়ের তাড়ায় হয়তো
ক্ষুণ্ন কিছু মন।

অফুরন্ত সময়ের ভিড়ে
একলা মাঠে আজ
দূর দিগন্ত সাদা কালো
রঙিন সুতোর অভাব।

স্মৃতির পথে দোলায় চড়ে
হচ্ছি পারাপার
লালমাটি আর কৃষ্ণচূড়ার
রঙ-বেরঙের সাজ।

দুপুর রোদে দাঁড়িয়ে একা
শালবীথির ঐ ধারে
কী কথা তার ছিল মনে
কে আজ তাহা জানে।

কাজের ভিড়ে ছিলাম
তাই মুচকি হাসি হেসে
অজান্তে হারিয়ে যেতাম
কাজের পরিবেশে।

এখন ভরা দুপুর
ভীষণ তায় তাপ
খ্যাপা কুকুর ঘুমিয়ে আছে
অবসন্ন ভাব।

এখন শুধু তাকিয়ে থাকা
দিনে আর রাতে
দিনের কথা, রাতের স্বপ্ন
একই তারে বাজে।

বেদনাহীন চিন্তা
নয় সে পরাধীন
অভাব বোধের সুর
মন করে রঙিন।

ঘোর

দীপান্বিতা সরকার

বুঝি না কোনটা ঠিক...
তোমাকে কাছে পাওয়া,
নাকি দূরে থাকা!
না থাকা তুমি জাপটে থাকো,
অস্পর্শের আলিঙ্গনে...
কাছের তুমি অনুভবহীন দেখায়, ছোঁয়ায়!
ব্যস্ততার ভানে, রোজের পাঁচালি করি পাঠ,
কিন্তু আমার প্রতিটা শ্বাস-প্রশ্বাসের বুকের ওম তুমি!
শিশিরেভেজা আমার সন্ধিযুগল!
বড্ড ভালো লাগার এই না দেখা!



ঘাসফুল

দীপান্বিতা সরকার

তোমার ঘরের ফুলদানির শোভা নই আমি।
বাড়ির বাগানে যত্নে আগলে রাখা টবেরও নই।
আমাকে খোঁপায় বাঁধে না কেউ।
কেউ করেনি অর্পণ তাঁর বিগ্রহে।
আমি জানি তুমি আমাকেই দেখছ।
আমার পিঠেও একটা চোখ আছে যেন!

অবাস্তব

দীপান্বিতা সরকার

জানো, কিছু ইচ্ছে ছিল,
তারা-ভরা খোলা আকাশের নিচে যদি...
জানো, কিছু ইচ্ছে ছিল,
নির্জন কোনও দ্বীপে
শুধু তুমি আর আমি!
আরো ইচ্ছে হয়,
ওই দূরপাল্লার ট্রেনে বসে দুজনে একসাথে নিখোঁজ হই!
ইচ্ছের তালিকায়,
শীতের ভোরে কোনো ছোট্ট চায়ের গুমটিতে একটা পশমের
শালের মাঝে দুজনে গুটিশুটি হই,
আর খুড়ির গরম চায়ে ঠোঁট ছোঁয়াই।
কিছু ইচ্ছে তোলা আছে ভরদুপুরের খুনসুটিতেও!
বাড়তি ইচ্ছেগুলোর মধ্যে
সমুদ্র সৈকত, সূর্যের জেগে ওঠা
আর শুতে যাওয়ার আকাশ বিছানার রং-মাখা!
জানো, আরও অনেক ছিল ইচ্ছে...
তোমাকে, আমার সব ইচ্ছেগুলো বলার!
আমি তোমার বুকের কাছে মাথা রেখে বলি, আর তুমি শোনো!
জানো... আমার খুউব ইচ্ছে হয়...!





নৈঃশব্দের ধ্বনি

বাপ্পাদিত্য

আমি আসি আমি যাই
আমি হাসি আমি কাঁদি
আমি দেখি আমি শুনি
আমি গড়ি আমি ভাঙি।
আমি স্বপ্নের পাহাড় বেয়ে উঠি
আবার দুঃস্বপ্নের গিরিখাতে আছড়ে পড়ি
ভালবাসার আলিঙ্গনে হই আপ্লুত
অদৃশ্য মায়াজালে হই আবৃত
নিজেকে গড়ি নিজের মতো
সাফল্যের মূল্যায়ন করি ব্যর্থতার দাঁড়িপাল্লায়।
আশার আলোয় প্রজ্জ্বলিত থাকে জীবন-প্রদীপ
যেমনটি থাকে সূর্যালোকে ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু
রচিলে সুখ ও স্বাচ্ছন্দের স্বরলিপি
জীবন-বীনাতে তবেই বাজে শান্তির সুর
সেই প্রবাহমান মহাকালের নিয়মে
স্মৃতির তরণি বেয়ে বিস্মৃতির দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছায়
একদিন ওই সুঠাম দেহটিও হয় ভস্মিভূত
অবশিষ্ট থাকে শুধু ভালবাসার স্বাদ ও সুগন্ধ।

থেকে যেও নিঃশব্দে

তুহিনা সুলতানা

যখন সমস্ত শব্দ ফুরিয়ে যায়,
নিঃসঙ্গ রাত যখন বুকের ভেতর শূন্যতা ছড়ায়,
তখন কোনো এক অদৃশ্য মায়া
নিঃশব্দে এসে কপালে হাত রাখে।

যে সঙ্গ চোখে দেখা যায় না,
তার উষ্ণতাই কখনও সবচেয়ে সত্য হয়ে ওঠে;
দূরত্ব যতই দীর্ঘ হোক,
মনের কাছে ভালোবাসার কোনো দূরত্ব থাকে না।

কেউ পাশে না থাকলেও
তার স্মৃতি বুকের ভেতর প্রদীপ হয়ে জ্বলে
অন্ধকারের গভীরতম প্রহরেও
সেই আলো বলে – "ভেঙে পড়ো না, আমি আছি।"

কত মানুষ আসে, কত মানুষ হারিয়ে যায়,
কত সম্পর্ক সময়ের স্রোতে মুছে যায়
তবু কিছু ভালোবাসা মুছে যায় না –
তারা রক্তের মতো শরীরে, প্রার্থনার মতো মনে বেঁচে থাকে।

তাই একাকিত্বকে কখনও শেষ সত্য ভেবো না,
কারণ সত্যিকারের আপনজন দূরে গিয়েও দূরে যায় না;
সে থাকে নিঃশ্বাসের গোপন ওঠানামায়,
চোখের জলে, নীরব প্রার্থনায়, প্রতিটি অপেক্ষায়।

শুধু এতটুকু বিশ্বাস রেখো –
সব হারিয়েও যদি ভালোবাসা বেঁচে থাকে,
তবে কেউ কখনও সম্পূর্ণ একা নয়
কেউ না কেউ থেকে যায় – নিঃশব্দে, আজীবন চিরসঙ্গী হয়ে।



ভঙ্গদেশ

রঙ্গনাথ

গোপন ষড়যন্ত্র হয়েছে, কেহ বুঝতে পারেনি –
উত্তাল দেশে খুন আর খুন, বেসামাল প্রশাসন
গুলিবর্ষণ, এখানে আগুন, সেখানে ভাঙচুর –
নেতারা পাকড়াও হ'ল; সরকারের হ'ল পতন!

ভঙ্গদেশের বিপ্লবীরা চেয়েছে সবকিছু ভাঙতে –
সবকিছু লন্ডভন্ড করতে তারা খুব মজা পায়;
অতীতে যা কিছু গড়া, তারা রাখছে না তার চিহ্ন –
ভাঙ্গন-ধ্বংস করে 'ভাঙ্গা-যোদ্ধা' হতে চায়!

সুযোগ নিয়ে বছর বছর তারা সরকার বদলায়!
তারা নাকি প্রতিবার করছে স্বাধীনতা অর্জন;
তারা গর্ব-সংস্কৃতি-ইতিহাস নির্মূল করতে চায়;
পূর্বের সকল স্মৃতি জ্বালিয়ে দিয়ে করে তর্জন।

ভঙ্গদেশে এখন মানুষ মানে না সভ্যতা-মানবতা –
সেরা তারা প্রতিহিংসাতে, করে নিন্দা-মিথ্যাচার।
প্রতিপক্ষকে হত্যা করে, জেলে চালায় নির্যাতন;
ভঙ্গদেশে যে খুন করে, তার হয় না কোন বিচার!

হেথা বিচারকরা হুকুমের সেবক, হুকুম এলে কাজ –
'খারিজ' মানে মামলা খারিজ, 'জেল' বললে জেল
'ফাঁসি' চাইলে ফাঁসি দেয়; 'নির্দোষ' বলায় খালাস।
'আইন' এখন বইতে বন্দি, চলছে ক্ষমতার খেল!

ভঙ্গদেশের সব কর্মচারীরা অফিসে দেয় ফাঁকি
মাসিক বেতন নেওয়া যেন তাদের একমাত্র কাজ।
কেহ এসে ঘুষ-চাঁদা না দিলে মুখ বেঁকিয়ে রাখে
বলে শুধু, 'ভীষণ ব্যস্ত আছি, কাজ হবে না আজ'।

যুগটা গেছে বদলে – ঘুষ এখন ডাল-ভাতের মতো
শুধু বেতনে কাজ করাটা কারো পোষায় না আর
উপরি টাকা পেলেই তো হয় জমি-বাড়ি-গাড়ি!
ঘুষ-চাঁদা হ'ল 'উপরি'– নয় তা বেআইনি ব্যাপার।

ভঙ্গদেশে মানুষ এত স্বাধীন, বিশ্বাস করা দায়!
যা খুশী তাই করে তারা, আইন মানতে হয় না;
সর্বত্র মব-সন্ত্রাস, হত্যাকান্ড – শাস্তি তার নেই।
দেখা যায় শত শত অপকর্ম – কেহ কিছু কয় না।

স্কুল আছে, কলেজ আছে, আছে বিশ্ববিদ্যালয়
শুধু শিক্ষা হয়েছে উধাও – আর ছাত্ররা ক্ষমতায়।
শিক্ষক বা শিক্ষিকা ভুল করলে রক্ষা তার নেই –
কোমরে দড়ি, মারপিট করে জুতার মালা পরায়।

এখন অফুরন্ত অনাচার, সর্বত্র সীমাহীন দুর্নীতি
আজ নিয়ে সবাই আছে ব্যস্ত – ভাবে না ভবিষ্যত!
দেশটা চরম অসভ্যতা আর বর্বরতায় ভরপুর –
সম্পদ বাড়াতে, দাপট দেখাতে এসব সহজ পথ!

ভঙ্গদেশে কী ভালো, কী মন্দ – তা ভাবে না কেহ;
দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী; অনেকে কর্মচ্যুত ও বেকার।
ধূর্ত নেতাদের কথা মেনে অনুগতরা লুটপাটে মত্ত –
শিক্ষা ছেড়ে ছাত্ররা যা পেয়েছে, তা খুব চমৎকার!

ভঙ্গদেশ যাচ্ছে ডুবে, মানুষ আজ সন্ত্রাসী-উন্মাদ!
দেশে দুটি মহাশক্তি – প্রায় সমান সমান বিভাজন!
হিংসা-প্রতিহিংসার ফসল যেন ফলছে সারা দেশে
শত্রু নিধন ও ধ্বংসকান্ড দিনরাত চলছে এখন।

আজ এক মহাশক্তি প্রতিপক্ষকে করছে নির্যাতন
অন্যদল এটাই করবে কিছুদিন পর ক্ষমতা পেলে;
অনাচারের খড়্গ হাত বদল হলেও একই কান্ড হবে।
ভঙ্গদেশ স্বস্তি পেত সব মহাশক্তিরা ছুটিতে গেলে!



আহত সময়

অজয় সাহা

মগজে আফিম চষো
নগদে হিংসা
গোপনে জঙ্গি পোষো
আপসে মীমাংসা

ফতোয়া চোখে চোখে
বদলা টাঙানো,
নিরীহ একলা ওকে
বলিতে চড়ানো

গরজে সমঝে থেকো
দুয়ারে দামাদামি
সহজে ভুলতে শেখো
তুমি কে? কে আমি?

প্যাঁচারা নজরে রাখে
বেচারা কে কোথায়,
মার খেয়ে পড়ে থাকে
কতবার খাবি খায়?

মরা মাছের চোখে
মৃত আলোর মতন
তবুও খুঁজছি তোকে
সেটুকু উপশম।





অবিকল তুমি

পৃথা চট্টোপাধ্যায়

অজানা স্রোতে ভেসে গেছে সব অপেক্ষার দিন;
ছবিতে দেখি দূরের বন-গ্রাম,
নীল পাহাড়ের কোলে তুমি হেঁটে যাচ্ছ;
অনেক দূরে মাঠে রাখা আছে তোমার সাইকেল।
অবিকল তুমি; তোমারই মতো একটা মানুষ।
মানুষ চিনতে ভুল করলেও
তোমাকে চিনতে আমার ভুল হয় না;
অনেক দূর আকাশে উড়ে যায় যে পাখি
তাকেও আমি চিনতে পারি।
আজকাল শহরের রং বদলে গেছে,
ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে রাস্তার নামে।
কিছু অচেনা শব্দ হিজিবিজি চারিদিকে ভিড় করে আসে;
আমি মাতাল দেবদারুর কাছে ফিরে যেতে চাই,
অপার বিরহ নিয়ে শ্রীরাধিকা নিধুবনে;
বসন্তে ভ্রমর কি ভুল করে ফুল চিনে নিতে?

পরিণাম

বৈশাখী চক্কোত্তি

বলতে পারো আজ কেন এত আয়োজন,
কেন এত আত্ম-জিজ্ঞাসার ঘটা?
আজ কেন মনে হয় তোমার খেয়াঘাটে
আবার কাদের আসার পালা?
আজ কেন মনে হয় এ এক জ্বালা?
কবে সাঙ্গ হবে এ খেলা?
কেন? কেন? কেন?
আসুক তোমার জীবনে বহু-বহুজন,
ভেসে যাক একুল থেকে ওকূলে।
আর তুমি থাকো বসে ব্যস্ত শেষ পারানির কড়ি গুণতে...

ছিলে তো তুমি এক সতেজ শুভ্র শঙ্খচিল
যার দু'ডানায় সফেন সমুদ্রের দুর্বার চুম্বন
ছিল সাগরিকা তোমার প্রত্যাশায় পথ চেয়ে।
রৌদ্রালোকিত জলের ভাস্কর্য ছিল
তোমার তারুণ্যে ভরা দু'ডানায় আঁকা
সেই ডানার পরশের ওমে কাতর ছিল সাগরিকা,
স্বপ্ন পেয়েছিল তার লজ্জারাঙা বিমূর্ত রূপ।
কত ভালোবাসায় মাখামাখি, সোহাগে আদরে
অধিবাসের আতিশয্যে আবেশে সে ছিল চুপ।

হায়! পারোনি নিজেকে বশে রাখতে
বাচাল হয়েছ, লজ্জা পেয়েছ কিনা জানি না
অপ্রকাশিত মাতাল কামনায় হয়েছ সর্পিল।
হিংস্র হয়েছ কখনো নেকড়ের বা শৃগালের মতো চতুর!
হারিয়ে ফেলেছিলে নিজেকে।
চেয়েছিলে খুব কায়দা করে,
দুই বিপরীত মেরুর দ্বন্দ্বকে মেলাতে।
কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তোমার
চাতুরী পড়েছে ধরা। সহসা নামে স্তব্ধতা!
আর তোমার প্রিয়তমা?
চোখের জল যখন বিবর্ণ, শুষ্ক হয়,
একটি একটি করে উনুনতপা আঁচে
বিদ্ধ করে সে নিজেকে
জ্বলন্ত শলাকায় ঠিক সেই সময়,
যখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে,
চলে যায় তোমাকে ফেলে
পঞ্চভূতে বিলীন হবে বলে
চিরবিদায় তোমাকে বলে।





সৃজন

পারমিতা বসু

একটা বয়স আসে যখন
সৃজনশক্তি হারায়,
রান্না সেলাই আরো কিছু কাজ
করা না যায়।
ভাবি বোধহয় সৃজন হিসাবে
সহজ হবে লেখা,
লিখেই কিছু প্রকাশের আনন্দ
কুড়াতে শেখা।
লেখার ভেতর প্রকাশ পায়
মনের কথাই সব,
যেটা শোনবার মানুষ পাওয়া
হয় যে অসম্ভব।
কাজের মানুষ ব্যস্ত জীবনে
সময় যে আর পায় না,
সবার কথা শোনার তাদের
সময়ে কুলায় না।
কাজের জীবন শেষে, ক্ষমতা
চলে গেলে,
কথা বলার ইচ্ছেটা যে বাড়ে
সময় পেলে।
মনের কথা লিখে ফেলে
হালকা হতে চাই,
তোমাদের সময় নিলাম, রাগ
করো না ভাই।

জন্মভূমি

পারমিতা বসু

বাংলা আমার জন্মভূমি
সে যে আমার মাতৃসমা,
এখন তার মান হারানোয়
ক্ষোভ যে মনে হচ্ছে জমা।
দায়ী গো কারা এর জন্য,
কারা লাভ করে হচ্ছে ধন্য।
মরমে মরে যাচ্ছি মোরা
দেশের বাইরে থাকি যারা।
কত গর্ব ছিল একদিন
বাংলা মাকে নিয়ে,
আজকে থাকি সবাই এখন
লজ্জায় ম্লান হয়ে।
কেন এমন হ'ল প্রভু
দোষ করেনি মা তো কভু।
কার দোষে এই শাস্তি এল
বাংলা মা যে মান হারাল।
এবার প্রভু বিচার করো
দোষীদেরকে জব্দ করো ।
বাংলার মান ফিরিয়ে এনে
খুশির জোয়ার আনো মনে।
তোমার আলো দিয়ে ভরে
শান্তি আনো দেশটা জুড়ে।



ডাক

উদয় চট্টোপাধ্যায়

আমি চাই না আমার প্রিয়জনেরা
ছবি হয়ে যাক,
তবু অনেকেই ছবি হয়ে গেছে –
কেউ বা সময়ে কেউ অসময়ে।

চলে যাবার আবার সময় অসময় থাকে নাকি?
ডাক এলেই চলে যেতে হয়,
কে ডাকে কেমন সে ডাক কেউ জানে নাকো
কিন্তু বড় অনিবার্য অমোঘ সে ডাক।
সেই ডাক একদিন আমাকেও ছবি করে দেবে...

সান্ত্বনা

উদয় চট্টোপাধ্যায়

ক্রমশ দিনগুলো সীমিত হয়ে আসছে,
এখন অনিবার্যভাবে মনে আসছে অনেক কিছু –
না-করা, না-বোঝা, ভুল করার সুদীর্ঘ তালিকা,
সংশোধনের উপায় নেই জেনে হতে হচ্ছে যন্ত্রণার শিকার।
এই যন্ত্রণা লাঘবের ওষুধ বাজারে পাওয়া যায় না;
তাই ক্রমশ জর্জরিত হচ্ছি,
মুক্তি পেতে চাইছি অনভিপ্রেত মরণের দাক্ষিণ্যে।

মৃত্যু কি মুক্তি আনে? বড় শক্ত প্রশ্ন এক –
প্রয়াতজনেরা কেউ ফিরে এসে দেয়নিকো এর উত্তর।
তাই বোঝা ভারী হয় – গুরু থেকে আরও গুরুতর –
ন্যুব্জ হয়ে পড়ি তার অভিঘাতে,
আর বুঝি, মৃত্তিকা চুম্বনেও মিলবে না সদুত্তর তার।

অনিবার্য আছে মৃত্যু। একটাই সান্ত্বনা –
তাঁর আশ্রয়ে গিয়ে লুপ্ত হবে সমগ্র চেতনা।

স্তুতিনিন্দা

উদয় চট্টোপাধ্যায়

আত্মপ্রশংসা আত্মহত্যার সমান –
মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের উক্তি –
আর আত্মপ্রশংসা শোনাও মহাপাপ;
তাহলেও আত্মপ্রশংসা আমি শুনতে চাই,
কেননা মৃত্যুর পর স্মরণসভায় বলা অথবা কাগজে লেখা
কোন প্রশংসাই কারো কর্ণ বা দৃষ্টিগোচর হয় না,
জীবৎকালে সেগুলো দেখতে বা শুনতে পেলে
কিছুটা আত্মতৃপ্তি ঘটে – সেটাই বা মন্দ কী!

মৃত মানুষের নাকি নিন্দা করতে নেই –
আমি মানি না – যত খুশি নিন্দা করো –
কেননা মৃতের কানে কোন নিন্দা কখনই পৌঁছায় না;
এখন করো না – গায়ে লাগে – মনে লাগে...



বৃদ্ধাবস্থার উপলব্ধি

হুসনে জাহান

আমার আজকের এই প্রবন্ধ স্বীয় বৃদ্ধাবস্থার বিশ্লেষণ, স্বীকৃতি ও গ্রহণ। বিবিধ শারীরিক অসুবিধার কারণে ঠাকুমা, দিদিমা, বাবা ও মায়ের মতোই নিজের জীবনের চক্রও সম্পূর্ণ হতে চলেছে। প্রায়শঃই আত্মীয় বন্ধুর আমন্ত্রণে আনন্দ উৎসবে যোগ দেওয়ার অপারগতা কেবল ছবি দেখেই পূরণ করতে হয়। অনিবার্য কারণে শরীরের অসহযোগিতা এবং আরো নানান অসুবিধা মেনে নেওয়ার চেষ্টায় বসে বসে শেষের অপেক্ষা!

সেদিন হাঁটার সময় এক নব্বই উর্ধ্ব মহিলাকে হুইলচেয়ারে বসা দেখে হাত নেড়ে সম্বোধন করলাম। তিনিও আগ্রহভরে হেসে হাত নেড়ে প্রত্যুত্তর দিলেন। দুপক্ষের নাম বদলের পালা শেষে তিনি নিজের বয়স নয়ের কোঠায় তা জানিয়ে বললেন, "আমি আজকাল অনেক কিছু ভুলে যাই। তবে পুরোনো দিনের ও ছোটবেলার কথা বেশি মনে পড়ে। শুনে মনে করলাম আরে, আমারও তো একই অবস্থা! এই কারণেই আজকাল আমার লেখালেখিও প্রায় অতীতের কাহিনীই হতে চলেছে। তবে কি বর্তমান শারীরিক অবস্থা এবং একাকিত্ব ভুলিয়ে মস্তিষ্ক পুরোনো দিনের স্মৃতি প্রজেক্ট করে সান্ত্বনার প্রলেপ লাগাতে সচেষ্ট? কে জানে! তাই হবে।

ছোটবেলায় দেখেছি ঠাকুরমা, দিদিমা যখন আমাদের বাসায় এসেছেন, আর বাবার অসুস্থতার অন্তিম অবস্থাতেও নাওয়া খাওয়া, ঘুম ও প্রার্থনা বাদে বাকি সময় তাঁরা বারান্দায় আরাম কেদারায় চুপচাপ বসে ঘন্টার পর ঘন্টা শূন্যে তাকিয়ে কাটাতেন। পারিবারিক অনুষ্ঠান নয়তো চিকিৎসার প্রয়োজনে দেখতাম বাবা গিয়ে তাঁদের নিয়ে আসতেন। দৈনন্দিন রুটিনে সকালের প্রাতরাশ শেষে তাঁরা রান্নাঘরে কাজের মেয়েদের সাথে বসে তরকারি কাটাবাছায় সাহায্য করতেন। সেকালে ক্যান্সারের ভালো চিকিৎসা তৃতীয় বিশ্বে প্রচলন না হওয়ার কারণে চলাফেরা সীমিত হওয়ার পর দোতলার লম্বা বারান্দার এক কোণে বাবাও আরাম কেদারায় বসে নিজের স্মৃতিকাহিনী লিখতেন।

ষাটোর্ধ্বে পৌঁছোনোর পর, অথবা তারও পূর্বে আত্মা যদি পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মিলনের জন্য দেহত্যাগ করার সিধান্ত নেয়, তখন দেহ স্রষ্টার দেওয়া মেয়াদ পার করে অসীমের পথে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এক এক করে তার দৃষ্টি, দাঁত, কান, হৃদয়, পেট, মস্তিষ্ক, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই দুর্বল, কার্যক্ষমতাহীন ও নিস্তেজ হয়ে দেহকে অসহায় করে ফেলে।

আজ সিনিয়র সিটিজেন গ্রুপের একটি পোস্টে আমার এই চিন্তার বিষয়ের মতোই আরেকটি লেখা দেখে মনে হ'ল, আমার বয়সী সবারই একই ধরনের চিন্তা। নিচে সে লেখাটা পোস্ট করলাম -

"একটু একটু করে আমরা বড় হই আর ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে পারি যে শুধুমাত্র মা-বাবাই সারাটা জীবন আমাদের নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসে যায়। জগতের আর কোনো সম্পর্কই এমন নিঃস্বার্থ হয়নি। এই যে আমরা ভালো থাকার জন্য বা আরো একটু নিজেকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রে মা-বাবাকে ছেড়ে কত দূর দূরান্তে পাড়ি দিই, কিন্তু দিন শেষে আমি আর আমার আশেপাশে ৯০% মানুষ সকলেই ছোটবেলাটাই মিস করি। আর ছোটবেলা মানেই মা-বাবা। ছোটবেলা মানেই খুশি। এই এত খুশি, এত নির্ভর জীবন, এত অনাবিল আনন্দের নির্মল উৎস ছিল মা-বাবা। তারা সেই পরম সৌভাগ্যবান/সৌভাগ্যবতী যারা মা-বাবার কাছে বা পাশে থাকতে পারে। এত স্বার্থপরতার ভিড়ে দেখি আমাদের জন্য মা-বাবার দুয়ার অবিরত খোলা থাকে আর তাঁদের আশীর্বাদের হাত মাথায় থাকে। আমার চেনা কিছু বাচ্চাদের শত শত অভিমান আছে বাবা-মার উপর, তারা ঠেকতে ঠেকতে একদিন জেনে যাবে যে বাবা-মায়ের থেকে বেশি ভালো কেউ কখনও বাসেনি। বাসবেও না। প্রতিদিন আমি আগের দিনের থেকেও মা-বাবাকে বেশি করে ভালোবাসি। দুনিয়ার সবার বাবা-মা যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন।"

একবার ক্লাসের তুলনামূলক এক রচনা লেখার বিষয়বস্তুতে বাল্যাবস্থা এবং বৃদ্ধাবস্থার তুলনা করেছিলাম। কিন্তু তখনও নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শুধু বাল্য ও যৌবনেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন মধ্যবয়স পার হয়ে জীবনের শেষ ধাপে পৌঁছে জীবনের সব স্তরের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করার পর এসব পার্থক্য ভালো করেই বোঝা সম্ভব হচ্ছে।

দু'অবস্থার তুলনা করতে গিয়ে দেখা যায় শিশু কাঁদলে তাকে শান্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। তার ক্ষুধা বা একাকিত্ব বা

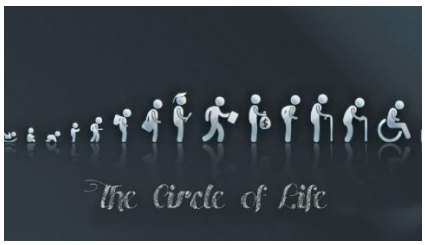
অন্য কোনো কারণে কান্নার সুর শোনামাত্র সবাই ছুটে গিয়ে তার চাহিদা পূরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শিশুও নিজের প্রয়োজনের বাইরে কোনো কিছুই বোঝে না। স্বীয় প্রয়োজনের তাগিদে কণ্ঠের পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগে নিজের প্রাপ্তি আদায় করার কৌশল তার সম্পূর্ণ আয়ত্তে। অতি কাঙ্ক্ষিত সন্তান জন্মদাত্রীর দুঃসহ শারীরিক কষ্টের পর গর্ভ থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলার পর থেকেই সে পিতা মাতার চোখের মণি হয়ে থাকে। জন্মদাত্রীর কাছে তা অত্যন্ত আনন্দদায়ক। তার সকল শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাই মা-বাবার একমাত্র কাম্য হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে অসম্মতি কিংবা বিরূপ মনোভাবের কোনো স্থান থাকে না। জীবনের সবকটা বাঁকে পিতা মাতার নিঃস্বার্থ ও অঢেল সহযোগিতা হ'ল সন্তানের অমূল্য সঞ্চয়।

বৃদ্ধের কান্না তো লজ্জাজনক। একা ঘরে নীরবে সে চোখের জলই ফেলতে পারে। বয়সকালে পৌঁছে কি শিশুসুলভ আচরণের দ্বারা একই যত্ন, বিবেচনা এবং সহযোগিতার প্রাপক হতে পারে? কখনোই নয়। প্রথমতঃ শৈশব আর বার্ধক্যের শারীরিক ও মানসিক পার্থক্যই দুই অবস্থার মাঝে বড় তফাৎ। যৌবনের স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনে পরনির্ভরতার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বার্ধক্যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হতে পারে। সেক্সপিয়ার সেই অবস্থারই যথাযথ বিবরণ দিয়েছেন – "দন্তহীন, চক্ষুহীন, স্বাদহীন, আর সর্বহারা।" দন্তহীন খাওয়ার প্রচেষ্টা, চোখে ঝাপসা দেখা, লাঠির ভরে চলাফেরা, কষ্টকর ওঠাবসা, কথা না বলে গলার স্বর ক্ষীণ হওয়া, সর্বোপরি বিস্মৃতির প্রকোপে আলাপ আলোচনায় যোগদান মুশকিল হয়ে পড়ে। অতএব বৃদ্ধাবস্থায় একা একা বারান্দায় চেয়ারে বসে বাইরের কোলাহল শোনা ও শূন্যের দিকে তাকিয়ে মহা প্রয়াণের দিন গুনে সময় কাটে।

তবে একথাও ঠিক যে সবার জীবন একই সুরে বাজে না। কেউ হেসে খেলে নির্বিঘ্নে, আবার কেউ মাথার ঘাম পায়ে ঝরিয়ে, কেউ ভালোবেসে, কেউ বা ঘৃণা করে, কেউ স্বেচ্ছাচারিতায়, কেউ স্বার্থপরতা ও হিংসা পরায়ণতায়, কেউ বেপরোয়া ও মরিয়া হয়ে একদিন অন্যের মতামতের পরোয়া না করে পৃথিবীর অস্থায়ী আবাস ত্যাগ করে অসীমে মিলিয়ে যায়। পৃথিবীবাসীর অপরাধ, লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ এবং কুৎসিত চরিত্রের রূপ তো সুয়োরানী, দুয়োরানী আর হিংস্র দানবের গল্প পড়েই জানা গেছে। দুঃখের বিষয় হয় যখন দেখা যায় যে সুযোগ্য সন্তানের অসুস্থ জননী বৃদ্ধাশ্রমের হাসপাতালে ছেলে-মেয়ের পথ চেয়ে বিছানায় অচল অবস্থায় রয়েছেন, অথবা মায়ের মৃতদেহ প্রতিবেশী দ্বারা তিনদিন পর উদ্ধার হয়। তখন মনটা মুষড়ে দুমড়ে দেয়। তবে কিছু মানব চরিত্র স্বীয় প্রতিষ্ঠার ব্যস্ততার কারণে জন্মদাতার পাশে না থাকতে পারার অনুশোচনা বহু সন্তানের কাছেই পীড়াদায়ক।

স্থানীয় লাইব্রেরিতে একদিন নাতির সাথে বসে দেশ বিদেশের গল্পে পড়েছিলাম যে আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার কোনও অনুন্নত দেশে দীর্ঘায়ু অসুস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ যখন অচল অবস্থায় পৌঁছে সম্পূর্ণ অসহায় ও অকেজো হয়ে পড়ে, তখন সে দেশের সামাজিক নিয়মানুযায়ী তার হাতপা বেঁধে বাড়ির ঢালু চালে উঠিয়ে চালকুমড়োর মতো গড়িয়ে দিয়ে তার পার্থিব জীবন ত্যাগে সহায়তা করা হয়। সে বিবরণ পড়ে অবশ্যই মনে হয়েছিল কী নিষ্ঠুর সে দেশের মানুষ! কিন্তু পরে সে সিদ্ধান্তের যুক্তি উপলব্ধি হলে বুঝেছি যে পার্থিব জীবন যখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে শুধুই নিজের ও সবার অসুবিধা ও কষ্টের কারণ হয়ে ওঠে, তখন সেই অসহ ও কষ্টকর অবস্থা থেকে নিজের ও প্রিয়জনের কৃপা, অবহেলা বা অবজ্ঞা থেকে মুক্তির এ এক বাস্তবধর্মী পন্থা। মানুষ তার নিজের প্রিয় পোষা জীবজন্তুর কষ্ট লাঘবের জন্যও তো একই পন্থা অবলম্বন করে।

এই লেখার উদ্দেশ্য ছিল বৃদ্ধাবস্থার উপলব্ধি, বিশ্লেষণ ও গ্রহণের মানসিক প্রস্তুতি। সে অবস্থায় পৌঁছানোর আগে এ ব্যাপারে পুরোপুরি ধারণা করা সম্ভব হয় না। জীবনের চক্র পূর্ণ হয় তখনই যখন সেই পরিস্থিতি সামনে এসে দাঁড়ায়। সবটাই পার্থিব জীবনে অনিবার্য বলে মেনে নিয়ে অন্তিমের অপেক্ষা মাত্র!



কুয়াশা ও রোদ্দুরের কোলাজ

সুব্রত ভট্টাচার্য

বিকেলের মরা রোদ্দুরটা যখন বারান্দার এক কোণে এসে পড়ে, রাই তখন কবিতার খাতাটা কোলের ওপর টেনে নেয় | চারপাশের মানুষ চেনে অন্য এক রাইকে – যার মঞ্চে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করা কবিতা শুনলে প্রেক্ষাগৃহ নিস্তব্ধ হয়ে যায়, যার কণ্ঠের মায়ায় শব্দেরা প্রাণ পায়|

নিজের স্বামী, সন্তান আর আবৃত্তির স্কুল – সব মিলিয়ে রাইয়ের এখন ভরা সংসার| এক মুহূর্তও একা থাকার সময় পায় না, বড্ড ব্যস্ত সে | অথচ, এই নিটোল সাফল্যের আড়ালে রাইয়ের মনে একটা অন্ধকার ঘর আছে, যেখানে বছরের পর বছর ধরে জমা হয়ে আছে এক তীব্র, অপরাধবোধ জড়ানো অন্তহীন বিরহ| এই বিরহের শুরুটা হয়েছিল বছর দশেক আগে, হঠাৎ ফেসবুকে|

নীল নামের এক ছন্নছাড়া, খামখেয়ালি আর ভীষণ পাগলাটে ছেলের সাথে তার আলাপ হয়| নীল কখনও কোনো পাকাপোক্ত কাজ করতে পারেনি | তার মাথা গোঁজার নিজস্ব কোনো ঠিকানাও ছিল না| সে শুধু পারত ভালোবাসতে| রাইকে ভালোবেসে নীল একের পর এক ডায়েরি ভর্তি করে চমৎকার সব কবিতা লিখে গেছে | সে কবিতাগুলো ছিল অদ্ভুত সুন্দর, ঠিক যেন নীলের পাগলাটে স্বভাবের মতোই মায়াবী | নীল কোনোদিন রাইকে ভুলতে পারেনি| নীলের নিজের কোনো বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলেও একটা মস্ত বড় স্বপ্ন ছিল – রাই যেন এক নামকরা বাচিক শিল্পী হয় | রাইয়ের এই জাদুকরী কণ্ঠের আবৃত্তি যেন দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে, গোটা পৃথিবী যেন তার প্রতিভার কদর করে, এটাই ছিল নীলের একমাত্র চাওয়া | সেই স্বপ্নের কথাই সে ইনবক্সে বারেবারে রাইকে বলত | আর নীল সবসময় একটা কথা ভীষণ বিশ্বাস করত – রাই যখন হাসে, তখন তাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায় | রাইয়ের মুখের ওই এক চিলতে হাসিটাই ছিল নীলের জীবনে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য | সে সবসময় চাইত, রাইয়ের মুখে যেন এই হাসিটা চিরকাল অমলিন থাকে | সম্পর্কের একদম প্রথম দিকে, সেই শুরুর দিনগুলোতে রাই মাঝে মাঝেই নীলের লেখা সেই কবিতাগুলো নিজের কণ্ঠে আবৃত্তি করত | নীল যখন ইনবক্সে ভাঙা ভাঙা ছন্দে নিজের অনুভূতির কথাগুলো পাঠাত, রাই তখন মনের আনন্দে সেই পঙক্তিগুলো সাজিয়ে নিয়ে নিপুণভাবে পাঠ করে নীলকে শোনাত | ওর মুখে আবৃত্তি শুনে নীল অবাক হয়ে যেত! সে ভাবতেই পারত না তার সাধারণ কথাগুলোকে কী করে রাই নিজের কণ্ঠের জাদুতে এতটা সুন্দর আর জীবন্ত করে তুলতে পারে! নীলের সেই বিস্ময় আর আনন্দ রাইকে এক অদ্ভুত সুখ দিত|

কিন্তু সেই দিনগুলো বেশিদিন স্থায়ী হয়নি| বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাই একসময় সিদ্ধান্ত নেয় 'আর নয়'; এবং তারপর থেকে সত্যিই সে আর কোনোদিন নীলের কবিতা পাঠ করেনি| রাই ছিল বাস্তববাদী| সে জানত, কোনো কাজকাম না থাকা এই খামখেয়ালি ছেলের সাথে সংসার করা অসম্ভব| তাই সমাজ আর পরিবারের চাপে রাই অন্য একজনকে বিয়ে করে নেয় | নীলকে সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে তাদের মিলন হওয়া সম্ভব নয়| কিন্তু নীল তো পাগল! সে তাও রাইয়ের পিছু ছাড়েনি কোনোদিন | মাঝে মধ্যেই সে ইনবক্সে কবিতা পাঠাত, ফোন করত| রাই তখন বাধ্য হয়ে এক অদ্ভুত ভানের আশ্রয় নেয়| সে নিজেকে এমনভাবে দেখাত যেন সে খুব 'ভোলাভালা', নীলের কবিতাগুলোর গভীরতা বা তার ভেতরের তীব্র আকুতি সে যেন বুঝতেই পারছে না| নীল যখন বলত, "তোর জন্য একটা কবিতা লিখেছি রাই|" রাই তখন হয়তো নীলের লেখা কবিতা পড়ত, কিন্তু পরে ভুলে যাবার ভান করে এড়িয়ে গিয়ে বলত, "ধুর!" মনে ভাবত ওসব ফালতু কবিতা বুঝবার সময় আমার নেই | সংসার সামলাব নাকি তোমার পাগলামি দেখব?" আসলে রাই নীলকে ঠান্ডা মাথায় এড়িয়ে চলত| নীল ছিল সাদাসিধা, বোকা, সহজ-সরল বিশ্বাসের মানুষ| রাইয়ের এই অবহেলা সত্ত্বেও নীল তাকে মন থেকে কখনও মুছে ফেলতে পারেনি|

কয়েক মাস আগে কয়েকজন পরিচিত মানুষের কাছে আর ফেসবুকের মাধ্যমে রাই জানতে পারে, নীল খুব অসুস্থ| ওর প্রেসার অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে, সাথে রক্তে সুগার লেভেলও ভীষণ উচ্চ | এই তীব্র অসুস্থতার কারণে চোখের জ্যোতিও দিন দিন কমে আসছে| ডাক্তার নীলকে কঠোরভাবে কোনো রকমের চিন্তা করতে বারণ করে দিয়েছেন, সময়মতো ওষুধ খেতে বলেছেন, কারণ মানসিক চাপ ওর এই শরীরের জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে | অথচ এই চরম

শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও নীল নিজের খেয়াল রাখেনি, সে শুধু রাইকে নিয়ে অবিরত কবিতা লিখে চলেছে।

খবরটা শুনে রাইয়ের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু সে তার ভরা সংসার আর ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে নিজেকে আটকে রেখেছিল। মনে মনে বলেছিল, 'কোনো কাজকাম ছাড়া ও তো নিজের খেয়াল কোনোদিন রাখেনি। এখন ভুগুক, তাছাড়া নীল আমার কে?' রাই ইচ্ছা করেই নীলকে আর পাত্তা দেয়নি, ওপাশ থেকে আসা মেসেজগুলো সিন করে রেখে দিয়েছে, কোনো উত্তর দেয়নি। সে নিজেকে আরও বেশি করে ডুবিয়ে দিয়েছিল নিজের সাজানো সংসার আর কবিতার জগতে।

কিন্তু ভাগ্য বোধহয় ওদের জন্য অন্য একটা শেষ দৃশ্য লিখে রেখেছিল। শান্তিনিকেতনে ছিল বছরের শেষ আবৃত্তি উৎসব। রাই সেখানে আমন্ত্রিত প্রধান শিল্পী। অনুষ্ঠান শেষ হতে রাত প্রায় সাড়ে আটটা। শান্তিনিকেতনের শীতের রাত তখন বেশ জমে উঠেছে, বাতাসে ছাতিম ফুলের হালকা গন্ধ। রাই যখন ব্যাকস্টেজ থেকে বেরিয়ে নিজের গাড়ির দিকে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ একটা চেনা ছায়া তাকে থমকে দাঁড় করাল। নীল এতটাই রোগা হয়ে গেছে যে দূর থেকে চেনা দায়। কিন্তু রাইয়ের ভেতরের সেই পুরোনো সত্তা নীলকে চিনে নিতে ভুল করল না। এ তো অন্য কেউ নয়, এ তার সেই ফেসবুকের ইনবক্স থেকে জীবনে আসা পাগলাটে নীল! রাইয়ের পা দুটো যেন মাটিতে গেঁথে গেল। নীল আস্তে আস্তে এগিয়ে এল রাইয়ের দিকে। চাদরের তলা থেকে বেরিয়ে আসা হাতদুটো কাঁপছে, গালের হাড়গুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। রাই লক্ষ্য করল চোখের জ্যোতি কমে আসায় নীল যেন ঠিকঠাক দেখতেও পারছে না, খুব কষ্ট করে চেনা অবয়বটা খোঁজার চেষ্টা করছে। এক সময় রাই নিজে চোখের ড্রপ নীলের চোখে দিয়ে দিত কোনো অনুষ্ঠানে একসঙ্গে উপস্থিত থাকলে।

- "রাই..." নীলের গলাটা ভেঙে এল।

রাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে নিজেকে সামলে নিয়ে তীব্র তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "তুমি এখানে? এই শরীরে এত দূর আসার কী দরকার ছিল? নিজের অবস্থা দেখেছ?"

নীল অসুস্থতার মধ্যেও তার সেই পুরোনো খেয়ালি ও পাগলাটে হাসিটুকুই হাসল। কাঁপতে কাঁপতে সেই চেনা ব্যাগ থেকে একটা পুরোনো খাতা বের করে রাইয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "ফেসবুকে দেখলাম তুই এখানে আসবি। ভাবলাম, আমার তোকে নিয়ে লেখা কবিতার শেষ ডায়েরিটা তোকে দিয়ে যাই। তোর জন্য লেখা শেষ কবিতাগুলো এতেই আছে রে। তুই এত সুন্দর আবৃত্তি করিস, দেখবি একদিন এই লেখা কবিতাগুলো মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। তুই হাজার বছর বেঁচে থাকবি মানুষের মধ্যে। তোর গলায় আমার কবিতা দূর থেকে শুনব, এই আশাটা আমার কোনোদিন মরেনি।"

রাই মুখটা ঘুরিয়ে নিল। চোখের জল সে নীলকে দেখাতে চায় না। সে আজও ভুলে যাবার ভান করে কঠোর গলায় বলল, "আমার এখন অনেক কাজ নীল, এইসব খাতা দেখবার সময় নেই। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে কলকাতায় ফিরতে হবে। আমার স্বামী অপেক্ষা করছে।"

নীল একটু কাশল, বুকটা চেপে ধরে বলল, "আমি জানি রে রাই, তোর এখন ভরা সংসার, তুই বড্ড ব্যস্ত। আমি তোকে ডিস্টার্ব করতে আসিনি। ডাক্তার বলেছে আমার হাতে আর বেশি সময় নেই। যদি আর কোনোদিন দেখা না হয় তাই শুধু এইটুকু দিতে চেয়েছিলাম।"

রাই কোনো উত্তর দিল না। সে নীলের বাড়িয়ে ধরা ডায়েরিটা ছুঁলোও না। তার চোখের কোণ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল, কিন্তু সে ঝট করে মুখটা ঘুরিয়ে নিজের গাড়ির দিকে হেঁটে চলে গেল। "ভাল কোনো ডাক্তার দেখানোর চেষ্টা করো," বলে সে গাড়িতে গিয়ে বসল। সে জানে, সে অন্য একজনের স্ত্রী, অন্য একটি পরিবারের মেরুদণ্ড। এখানে দাঁড়িয়ে দুর্বল হওয়ার কোনো অধিকার তার নেই। গাড়িটা যখন স্টার্ট দিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে কলকাতার দিকে রওনা দিল, রাই তখন গাড়ির পেছনের সিটে বসে কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরের নিকষ কালো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। একা দাঁড়িয়ে থাকা সেই অসুস্থ, ছন্নছাড়া নীল আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল কুয়াশায়। সেই রাতের পর নীল আর কোনোদিন রাইয়ের জীবনে ফেরেনি। তার সেই পুরোনো ফেসবুক আইডিটা একদিন হুট করেই 'ডিঅ্যাক্টিভেট' হয়ে গেল। রাই গোপনে অনেক খোঁজার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ছন্নছাড়া মানুষটার কোনো স্থায়ী ঠিকানা বা চেনা কোনো বন্ধু না থাকায় তার আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। নীল কি পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে একলা কোথাও

চলে গেল, নাকি নিভৃতে কোনো এক অচেনা শহরের অন্ধকার গলিতে হারিয়ে গেল – তা রাই কোনোদিন জানতে পারল না। নীল স্রেফ একটা কুয়াশার মতো মিলিয়ে গেল মহাকালের নিয়মে। ওদের প্রেমের কোনো পরিপূর্ণতা লাভ হ'ল না।

দুজনা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল দুটি আলাদা সমান্তরাল লাইনে। নীল রয়ে গেল তার সেই শেষ না হওয়া কবিতার খাতা আর নিঃসঙ্গ একাকীত্ব নিয়ে, আর রাই ফিরে গেল তার চেনা ব্যস্ততা, স্বামী, সংসার আর আবৃত্তির চেনা মঞ্চে। তবে নীলের সেই স্বপ্নটা কিন্তু সত্যি হয়েছে। রাই আজ একজন অত্যন্ত নামকরা বাচিক শিল্পী। নীলের স্বপ্ন যথার্থই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তার কণ্ঠের আবৃত্তি সত্যিই দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও মানুষ আজ তার আবৃত্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

কিন্তু এই বিপুল খ্যাতির আড়ালে, প্রতিবার যখন রাই কোনো ট্রাজিক বা বিরহের কবিতা আবৃত্তি করতে দেশ বিদেশের আলোকিত মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন প্রেক্ষাগৃহের হাজার করতালির আড়ালে সে স্পষ্ট অনুভব করতে পারে এক তীব্র শূন্যতা। করতালি ছাপিয়ে তার মনে ভেসে ওঠে এক হারিয়ে যাওয়া পাগলাটে ছেলের মুখ, যে একসময় রাইয়ের একটুখানি হাসির জন্য শুধু তাকে নিয়ে হাজারটা কবিতা লিখে খাতা ভরিয়ে ফেলত, আর যার সেই প্রথম দিককার ভাঙা ছন্দের কবিতাগুলো একদিন রাই পরম আনন্দে নিপুণভাবে সাজিয়ে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিল। এক সময় নীলের রাইকে নিয়ে লেখা কবিতা পাঠকের দরবারে ব্যাপ্ত হয়ে মানুষের মন জয় করে দেশ বিদেশে। কিন্তু এক জীবনের এই অনন্ত দূরত্ব আর না পাওয়ার হাহাকার নিয়েই আজীবন বেঁচে রইল রাই আর তার সেই হারিয়ে যাওয়া পাগলা নীল।

আবার হয়তো বেহিসাবি নীল কোনোদিন ছুটে যাবে রাইয়ের চলার পথ ধরে ওর বাড়ির সামনে। সারারাত অপেক্ষা করবে সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পপোস্টের নিচে বসে। আর রাইয়ের আবৃত্তির মধ্যে কবিতা লেখার সার্থকতা খুঁজে পাবে। হয়তো বা সেদিন সে শেষ নিঃশ্বাস নেবে বুক ভরে; রাস্তার ধারে ডাস্টবিনের পাশে দীর্ঘ অপেক্ষার রজনী শেষ হবে। হয়তো পর-জন্মে রাই নীলের কাছে আবার ধ্রুবতারা হয়ে ফিরে আসবে।

নাম, অনাম, বেনাম, ছদ্মনাম...

বাপ্পাদিত্য

নাম আমাদের এই আধুনিক মানব সভ্যতায় একটি অনন্য (unique) জিনিস, যা দিয়ে প্রত্যেকটি মানুষকে তাদের সারা জীবনের জন্য আইডেন্টিফাই করা হয়ে থাকে। গল্পের খাতিরে ধরে নিই যে, মানুষের আগে এই পৃথিবীতে দেব-দেবীরা এসেছিলেন, তাহলে বলব তাঁদেরও ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটির জন্য নামকরণের ব্যবস্থা ছিল সেই আদি অনন্তকাল থেকে। আবার যদি প্রশ্ন করা হয়, সবচেয়ে পরিচিত 'নাম' এই জগতে কোনগুলি? এই একবিংশ শতাব্দীতেও এর কোনো সহজ উত্তর মিলবে না, আমি নিশ্চিত। তবে গোটা পৃথিবী জুড়ে বেশ কিছু নাম বহুল পরিচিতি পেয়েছে যুগে যুগে, যেমন কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে – যীশু খ্রিস্ট, মাতা মেরি, ব্রহ্মা, আল্লাহ, রাম, রহিম, গৌতম বুদ্ধ, আইনস্টাইন, মাদার টেরেজা, ভিক্টোরিয়া, পেলে, মারাদোনা, সচিন তেন্ডুলকর, মেসি প্রমুখ। এখানে আমার পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয় খেয়াল করে থাকবেন, যে কটি নাম আমি উপরে উল্লেখ করেছি, তাঁরা সবাই ব্যাপকভাবে স্বীকৃত (iconic), অর্থাৎ এই পৃথিবীতে ওই নামগুলি শুনলেই ওঁদের সম্বন্ধে একটি পরিচিতি সাধারণ মানুষের মাথার মধ্যে নিমেষে খেলে যায়, "Who's Who" এইরকম ব্যাপার আরকি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রায় ৮.৪ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে কতজন আর iconic? খুবই কম। অথচ এই সমস্ত জনসংখ্যার সকলের নামই রেকর্ডেড এই পৃথিবীতে! এরপর এই আপামর জনগণের মধ্যে থেকে কিছু 'নাম' নিয়ে বাকি গল্পটা বলব।

ছোট বয়সে, অর্থাৎ আমরা যখন প্রথম কথা বলতে শিখি, চারপাশে যা শুনি সেগুলোকে 'নাম' বলে বুঝি – যেমন মা, বাবা, দিদি, দাদা, ঠাকুমা, দাদু ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি যে 'নাম' নয়, সেটা বুঝতে পারি আরও কিছুটা বড় হলে। তার ফলে কিছুটা কনফিউশনও তৈরি হয় সেই ছোট বয়স থেকে। যেমনটি আমারও হয়েছিল। 'নাম' আর তার সাথে 'সম্পর্ক'-র পার্থক্য বুঝতে কিছুটা সময় লাগে। এরপর চারপাশের বন্ধু-বান্ধব বা সঙ্গী-সাথীদের নাম কানে আসে, বিশেষত খেলার মাঠ বা প্লে-স্কুলে এবং তাদের নাম মনে রাখা শুরু হয়। আর প্রিয় বন্ধু হলে

তো কথাই নেই, বাড়ি ফিরেও সেই বন্ধুদের নাম সর্বদাই মুখে আসে।

আমি যেহেতু গ্রামে বড় হয়েছি, তাই ছোট থেকেই সব সহজ-সরল নামের সাথে পরিচয় ঘটেছে আমার। যেমন আমার নিজের ডাকনাম ছিল খোকন কিন্তু আমার প্রকৃত নাম প্রশান্ত। আমার ভাইয়ের আবার একটিই নাম, পলাশ। গ্রামে ছোট থেকে সবাই 'খোকন-পলাশ' এই পরিচিতিতে চেনে। আমার আসল নাম যে প্রশান্ত, এটি বহু পরে আমাদের গ্রামের লোকজন জেনেছে। কিন্তু স্কুলে সবাই প্রশান্ত বলেই চিনেছে। আরেকটি প্রচলিত নিয়ম আমাদের গ্রামে দেখেছি এবং অনেক পরে এটি বিশ্লেষণও করেছি, সেটি হ'ল সবার নাম ভেঙিয়ে বলা বা বিকৃত করে ডাকা। আমার মনে হয় বাংলার গ্রামগঞ্জে প্রায় সকলের নামই এভাবে ডাকার প্রচলন আছে এবং এটাই সাধারণ ব্যাপার বলে সবাই মেনে নিয়েছে। এতে করে কারও কোন রাগ, অভিমান, ক্ষোভ বা দুঃখ নেই। কিছু উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হবে, যেমন কারুর নাম হরিমোহন বা হরিসাধন তাকে গ্রামের সবাই ডাকে 'হরে' বলে, বিশ্বনাথ 'বিশে', চণ্ডীচরণ 'চন্ডে', বংশীবদন হয়ে গেছে 'বংশে' | আবার রাখহরিকে ডাকে 'রেখো' বলে, ভূতনাথ হ'ল 'ভূতো', কার্তিক 'কেতো', কালোবরণ 'কেলো', ভোলানাথ 'ভুলো', রামকৃষ্ণ 'রেমো', ধনকৃষ্ণ 'ধনা' আর নারায়ণ 'নাড়ু' এরকম হাজার উদাহরণ লেখা যায়।

এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো, যতই অপভ্রংশ মনে হোক এই রূপান্তরগুলোকে কিন্তু অনেক সময় একটু আদরের অর্থাৎ adorable বলেও কানে এসে লাগে। যেমন যার নাম লক্ষীন্দর তাকে ডাকে 'লকাই' বলে। আর লক্ষ্মীমণিকে ডাকে 'লখু' বলে, অপরাজিত 'অপু', দীপ্তস্বর 'দিপু', রমাকান্ত 'রমু'। এরপর হচ্ছে সত্যি সত্যি বিদ্‌ঘুটে সব নাম। তার কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক এখানে, পচা, ধসা, খেঁদি, পেঁচি, ক্ষ্যাপা, খেপি, বুড়ি, বুড়ো, টেঁপা, টেঁপি, বোঁচা, বুঁচি ইত্যাদি। আমার খুব ছোটবেলায় ওইসব নাম শুনে, ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে পৃথিবীতে এতসব নাম থাকতে মানুষজন কেন পচা, ধসা ইত্যাদি নাম রেখেছে নিজেদের ছেলে মেয়ের? তখন ঠাকুমা একটা গল্প বলেছিল সেটি আমার এখনও মনে আছে। তখনকার দিনে ভারতবর্ষে শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশি ছিল এখনকার তুলনায়। মূলত কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড এসবে প্রচুর বাচ্চা কম বয়সে বেঘোরে মারা যেত। এর সাথে ছিল তেমনি কুসংস্কার ভরা সমাজ। সবাই মনে করত যে, মৃত্যুর দূত যমরাজ এসে তাদের বাচ্চাদের নিয়ে চলে যায়। তাই যমরাজের অরুচির জন্য মানুষ নিজেদের প্রিয় সন্তান-সন্ততিদের ওইসব নামগুলি রাখত।

আবার আমেরিকাতে এসে দেখি, এখানে ডাকনামের ব্যাপার-স্যাপার আমাদের দেশের থেকে পুরোপুরি আলাদা। ধরুন এ দেশে যার প্রকৃত নাম Robert, তার ডাকনাম Bob (by default) | অর্থাৎ যদি আমেরিকার পঞ্চাশটি প্রদেশে পঞ্চাশ হাজার মানুষের নাম Robert হয় তাহলে সেই সমস্ত লোকেরই ডাকনাম Bob। একইরকম ভাবে Christopher এর ডাকনাম Chris, David এর Dave, Joseph এর Joe, William এর Bill। এরকম অনেক উদাহরণ আছে।

এরপর দেখুন মানুষের কর্মকাণ্ড এবং স্বভাব-চরিত্রের উপর নির্ভর করে কেমন তাদের নাম প্রচলিত হয়েছে। যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋষি অরবিন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, বাঘাযতীন, শহীদ ক্ষুদিরাম, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র। এরপর সময় অনেকটাই অতিবাহিত হয়েছে, গঙ্গায় জলও অনেক গড়িয়েছে, সাথে মানুষের কর্ম-কান্ডেরও পরিবর্তন ঘটেছে | ফলে বর্তমান বঙ্গ সমাজে আমাদের নতুন কিছু নামের সাথেও পরিচয় হয়েছে, যেমন ফাটাকেষ্ট, হাতকাটা দিলীপ, হুববাশ্যামল ইত্যাদি।

এরপর একটু অন্য নামের কথায় আসি। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসরদের নাম মানে শুধু ইনিশিয়াল অর্থাৎ DG, AD, CRM, NCG, ANB, SCD প্রভৃতি। এখন মনে পড়ে আমার নিজের সাবজেক্ট ছাড়া অন্য স্যারদের পুরো নাম কখনোই জানা হয়ে ওঠেনি। শুধু ওরকম শর্ট ফর্ম বা ইনিশিয়াল নামে চলত। আমার কলেজে বাংলা বিভাগের এক অধ্যাপকের নাম ছিল BR | ওঁর আসল নাম যে ভগবান রাহা, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী এটি জেনেছিল কলেজের পড়া শেষ করার পরে। অন্য একজন অধ্যাপকের নাম ছিল পশুপতি তরফদার, কিন্তু সবাই স্যারের নাম জানত PPT | এই সংক্ষিপ্ত নামের প্রভাব আরও কতদূর অবধি বিস্তৃত ছিল সেটাও আমি দেখেছি। এখানে মাত্র দুটি উদাহরণ দেব – আমাদের গ্রামে সবার পরিচিত একজন

মাতাল ছিল, তার নাম বাসুদেব চক্রবর্তী | নাম থেকেই বোঝা যায় ব্রাহ্মণ গোত্রের মানুষ | রোজই সকাল থেকে সে মাতাল থাকত | এত বেশি পান করত যে, সবসময় তার চোখ লাল থাকত এবং বিকেল থেকে রাত্রিতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সে হয়ে যেত BDC | ওই সময় কেউ বাসুদেব নামে ডাকলে, আর সাড়া পাওয়া যেত না | সে তখন বলত "I am BDC now"| শুনেছিলাম ওই বাসুদেব বেশ কয়েক বছর কলেজে যাতায়াত করেছিল, তবে শেষ পর্যন্ত কোন ডিগ্রী অর্জন করতে পারেনি |

আর একজনকে দেখেছিলাম আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, Jadavpur University-তে | সে হ'ল পুলক বিশ্বাস | সবাই ডাকে পুবি বা পুবিদা বলে | আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে হস্টেলে গেলাম তখন পুবিদা আমাদের থেকে ৮/১০ বছরের সিনিয়র এবং তখনও হস্টেলের লাইভ মেম্বার | তারপরে জানলাম পুবিদা এই হস্টেলে থেকে অলরেডি দুখানা মাস্টার্স ডিগ্রী করে ফেলেছে | এখন তিন নম্বর, MPhil-এ পাঠরত | আমি তখন ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, হস্টেলে আজীবন থাকার জন্য এতগুলো ডিগ্রী, নাকি সত্যি সত্যিই পুবিদা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চান জীবনের মধ্যগগন পর্যন্ত | বলে রাখা ভালো, পুবিদার আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং প্রথম মাস্টার্স ডিগ্রী ছিল বাংলা সাহিত্যে, দ্বিতীয় মাস্টার্স ডিগ্রীটি ছিল কম্পারেটিভ লিটারেচারে আর তৃতীয়টি চলছিল ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ-এ | এহেন পুবিদাও ছিল খুব দারুপ্রিয় | সন্ধ্যার পর পুবিদার হস্টেলের ঘরে সাহিত্যের তুফান বয়ে যেত, তার কিছুটা পর শুরু হতো সঙ্গীত, এবং চলত মধ্যরাত অবধি | ওই সাহিত্যের আসরে আমি প্রথম পাবলো নেরুদার কথা শুনি | তার অনেক আগে থেকেই ফেলুদা, টেনিদা, ঘনাদাদের সাথে আলাপ পরিচয় হয়েছিল আমার | এখানে আরও একটা জিনিস উল্লেখ করি, ওই আসরে মাঝে মাঝে কালিকাদার (কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য) দর্শন মিলত | কালিকাদা পুবিদার কম্পারেটিভ লিটারেচারের ক্লাসমেট ছিলেন | কালিকাদা কিছু পরে বিখ্যাত হন "দোহার" ব্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে | আমি পুবিদাকে সকাল এগারোটার আগে কোনদিনই বিছানা ছেড়ে উঠতে দেখিনি | অনেক পরে শুনেছিলাম পুবিদা একটি স্কুলে শিক্ষকতা করে | তবে জানি না ছাত্র-ছাত্রীরা কী বলে ডাকে আমাদের পুবিদাকে, পুবিস্যার না পুলকস্যার? তবে পুবিদা চিরকাল স্বপ্ন দেখত কলেজে অথবা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করার |

এরপর আমাদের পাঠ্য বইয়ের স্রষ্টা বা লেখকদের কয়েকটি নাম মনে করাই আমার পাঠক পাঠিকাদের | প্রথমে সবার মনে আসবে K. C. Nag-এর গণিত বা অঙ্ক বই | ওঁর পুরো নাম যে কেশব চন্দ্র নাগ, এটা আমার মতো অধিকাংশ পড়ুয়ারা কোনদিন জানত না বা জানতে আগ্রহী ছিল না | তেমনই Physics বইয়ের লেখক C. R. DG নামেই পরিচিত ছিলেন | ওঁর পুরো নামটি বেশ জমজমাট, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত |

আবার নামের দ্বারা বেশ কিছু জিনিসকে খুব সহজভাবে ব্যক্ত করা যায়, যেমন কাউকে আমরা বলি যে তুই তো 'কালিদাস', মানে তাকে বলা হ'ল তুই খুব বোকা ছেলে | কালিদাস গাছের যে ডালে বসেছিল, সেই ডালটিকেই কুঠার দিয়ে কাটছিল | সেই অর্থে এই পৃথিবীতে এখন আমরা সবাই কালিদাস | আমরা সবাই এই সুন্দর পৃথিবীকে সর্বক্ষণ দূষিত করে চলেছি বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে |

এইরকম আরো একটি উদাহরণ, কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিখ্যাত চরিত্র 'শ্রীকান্ত'| আসলে আমাদের কিশোর বয়সে সকলের মধ্যে একটি করে শ্রীকান্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকে | সেজন্য আমাদের বাংলার গ্রামে-গঞ্জে একটু ডানপিটে বা ডাকাবুকো ছেলেদেরকে শ্রীকান্ত নামে ডাকা হয় | আবার শরৎবাবুর গল্পের বিশেষ চরিত্র 'দেবদাস'| আমরা সকলেই জানি আমাদের সমাজে কিছু লোকজনকে কেন দেবদাস বলে ডাকা হয় |

তারপর জানলাম তাঁদের নাম, যাঁরা আমাদের খুব প্রিয় শিল্পী, এখন অবশ্য ওঁদের 'সেলিব্রিটি' বলার প্রচলন হয়েছে এই একবিংশ শতাব্দীতে | প্রথমেই যাঁর কথা মনে আসে, তিনি আমাদের গত শতাব্দীর বাংলা চলচ্চিত্রের মহানায়ক 'উত্তমকুমার'| সত্যিই যেমন নাম, তেমনি সুদর্শন চেহারা; মনভোলানো হাসি ও চমৎকার অভিনয় | উত্তমকুমার নামেই একসময় বাঙালি সমাজে উথালপাথাল অবস্থা হতো | একদিকে সমস্ত বাঙালি ললনারা স্বপ্ন দেখতেন উত্তমকুমারের মতো স্বামী পাবার | অন্যদিকে বাঙালি তনয়রা উত্তমকুমারের আদবকায়দা অনুকরণ করে গেছে | যেমন – হাঁটাচলা, চুলের কায়দা, সদা

হাসিমুখ ইত্যাদি | বাংলা চলচ্চিত্র, 'বসন্তবিলাপ'-এ চিন্ময়ের ডায়লগ বাঙালি চিরকাল মনে রেখেছে, যেখানে চিন্ময় তার প্রেমিকাকে বলছে, "তুমি আমাকে একবার উত্তমকুমার বলো"| অথচ মজার ঘটনা হ'ল, উত্তমকুমার নামটি তাঁর প্রকৃত নাম ছিল না, ওঁর পিতামাতার দেওয়া নাম ছিল অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় | 'উত্তম' নামটি ছিল তাঁর মামাবাড়ির দেওয়া ডাকনাম | কথিত আছে এহেন অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র flop হয় | তারপর নিজের ছোটবেলার দুটি নামকে মিশিয়ে হয়ে যান 'উত্তমকুমার'| এরপর বাকি ইতিহাস তো আমরা সকলেই জানি | তাহলে বুঝুন এইসব নামের কেমন মহিমা! এই ট্রেন্ড আমরা এখনও দেখে চলেছি বাংলা ও হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এবং সঙ্গীত জগতে | বহু মানুষই নাম পরিবর্তন করার পর বিখ্যাত হয়েছেন | উদাহরণ স্বরূপ মিঠুন চক্রবর্তী, কুমার শানু এবং এরকম আরও অনেক আছে |

এবার middle name নিয়ে কিছু বলা যাক | যদিও আমার নিজের কোন middle নাম নেই, কিন্তু বংশানুক্রমে থাকারই কথা ছিল, কারণ আমাদের পরিবারে middle নামের প্রচলন আগের দুই-তিন পুরুষ ধরে আছে | আমার দুই দাদুর বেশ গালভরা middle নাম ছিল | রাধা গোবিন্দ দত্ত এবং দোল গোবিন্দ দত্ত | আমার বাবা ও কাকুরা চার ভাই, প্রত্যেকেরই middle নাম 'কুমার'| সেই হিসেবে খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার ও আমার ভাইয়ের middle নাম 'কুমার' রাখা হয় | কিন্তু কোনও অজানা কারণে আমি যখন ক্লাস ফোর থেকে ফাইভে অ্যাডমিশন পাই, আমার middle নামটি বাদ পড়ে যায়, ফলে আমি হয়ে যাই প্রশান্ত দত্ত | তাতে অবশ্য আমার সুবিধাই হয়েছিল, এত বড় নাম লিখতে সময় লাগে, তাই ছোটবেলায় ভালোই লেগেছিল আমার, কিন্তু ভাইয়ের middle নামটি রয়ে গেছে |

এই middle নাম নিয়ে আরো একটি ফ্যাক্ট বলি | বাবার middle নাম নিয়ে মেয়ের অ্যালার্জি | ব্যাপারটি আর কোথাও নয়, আমাদের বাড়িতে | আমার শ্বশুর মহাশয়ের নাম মোহন পদ পাল | এই 'পদ'টি নিয়েই যত কান্ড | আমার প্রিয়তমার একদমই পছন্দ ছিল না ওই পদ শব্দটি, সে বাবার নাম বলত 'মোহন পাল' | বাবাকে অনেকবার বলেছে, "তুমি ওই 'পদ'টি ব্যবহার করবে না |" আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন তার এত আপত্তি এই ছোট অথচ সুন্দর middle নামটিতে | ওর যুক্তি, "আমার বাবা বেশ স্মার্ট মানুষ, 'পদ' শব্দটি জুড়লে বাবার নামটি কেমন যেন সেকেলে হয়ে যায়, সেটা বাবার পক্ষে বেমানান |" বুঝুন একবার যুক্তিটি!

আরও গল্প আছে এই নাম-অনাম নিয়ে | পাত্র-পাত্রীর সম্বন্ধ করে বিবাহ হচ্ছে, এমত অবস্থায় শুধু এই নামের চক্করে বিয়ে ভেঙে গেছে | তেমন ঘটনাও ঘটেছে আমাদের বঙ্গ সমাজে | পাত্রটি ছিল আমাদের ইউনিভার্সিটির এক বন্ধু | আমরা পাশাপাশি হস্টেলে থাকতাম | তার নাম হল গোবর্ধন মন্ডল | MCA-তে পড়ত এই গোবর্ধন | আমাদের সবার প্রিয় 'গবা' পড়াশোনায় খুবই ভালো ছিল | ক্যাম্পাস interview-তে চাকরি পেল বহুজাতিক সংস্থায় | দু-তিন মাসের মধ্যেই চলে যাবে USA-এর Silicon Valley-তে | গোবর্ধন গ্রামের ছেলে, সেই সময় গোবর্ধন বেশ সুপাত্রও | যথারীতি অনেক সুপাত্রীদের যোগাযোগ আসতে শুরু করল গোবর্ধনের বাবা-মা'র কাছে | শুনেছিলাম তাদের মধ্যে একজনকে ওর বেশ পছন্দ হয়েছিল এবং দেশ ছাড়ার আগেই গোবর্ধনের বিবাহ সম্পন্ন হবে ঠিক হয়েছিল | এমত অবস্থায় শুনলাম পাত্রী বেঁকে বসেছেন | পাত্রী জানিয়েছেন, 'গোবর্ধন' নামটি তার একেবারেই পছন্দ নয়; কেমন যেন বোকা বোকা নাম, সুতরাং এই বিয়েতে তিনি রাজি নন | আমাদের গবার বিয়ে এখন হচ্ছে না | ব্যাপারটা একবার ভাবুন, নামের কেমন প্রভাব!

এবার আসি last name বা surname-এর কথায় | এই পদবী বা surname বা family name পৃথিবীর সব দেশে প্রচলিত বলে আমার মনে হয় | সেরকম কোন দেশের নাম শুনিনি যে last name-এর প্রচলন নেই | সাধারণভাবে পারিবারিক নাম আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকি | এটি স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে, অর্থাৎ বংশ পরম্পরায় | কিন্তু সন্তান-সন্ততি তো বাবা-মা'র যৌথ উদ্যোগে পৃথিবীতে আসে | তাহলে ছেলেমেয়েরা কেন শুধু বাবারই পদবী পায় বা দেওয়া হয়? এ এক কঠিন প্রশ্ন! বাবা এবং মায়ের পদবী যৌথভাবে ছেলে-মেয়ের পাওয়ার কথা | কিংবা শুধু মায়ের পদবীও দেওয়া যেত | কিন্তু বাস্তবে তেমনটা দেখা যায় না | এ বেশ একটা ধাঁধার ব্যাপার!

এরপর এই পদবীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে first name রাখার দু'একটা কথা বলি | যাদের পদবী 'মন্ডল' তারা তাদের একমাত্র সন্তানের first name রেখেছে সপ্তর্ষি | তাহলে ছেলের পুরো নামটি হল 'সপ্তর্ষি মণ্ডল'| শুনতে বেশ ভালোই, বলুন! আবার দেখি ইংল্যান্ড ফুটবল টিমের স্ট্রাইকারের পারিবারিক নাম Kane | তাঁর বাবা-মা ছেলের বেশ যুৎসই একটি নাম রেখেছিলেন, সেটি Harry | তাহলে হ'ল Harry Kane | বাহ্, শুনতে তো বেশ লাগে!

এবার দেখা যাক নাম নিয়ে মানুষকে কীভাবে অপদস্থ করা হয় – তারও অনেক উদাহরণ আছে | যেমন, অনেককে বলতে শুনেছি, "ওই দেখো, কানা ছেলের নাম 'পদ্মলোচন'!" ছোটবেলায় যখন মাধ্যমিক স্কুলে পড়াশোনা করি তখন পাঠ্যপুস্তকগুলি থেকে প্রথম 'ছদ্মনাম'-এর সাথে পরিচয় হয় | এই যেমন লেখকের নাম 'বনফুল'| বাংলা ক্লাসের শিক্ষক বলতেন "জেনে নে, এটা কিন্তু লেখকের ছদ্মনাম, আসল নাম হ'ল বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় |" আমার তো 'বনফুল' নামটি বেশ পছন্দ হয়েছিল সেদিন | কী মিষ্টি নাম! আমি নিজে প্রতিদিন মেঠো আল রাস্তা দিয়ে এক থেকে দেড় কিলোমিটার হেঁটে



শিল্পী: ঐশিক দত্ত (বয়স ১৪) (লেখকের পুত্র)

স্কুলে যেতাম আর সারা বছরে প্রতি ঋতুতে কত রঙ-বেরঙের বনফুল দেখতাম | কিন্তু সেভাবে মন দিয়ে ফুলগুলির দিকে তাকানো হয়নি কোনদিন | যেদিন ওই 'বনফুল' নামটি বাংলা শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকে শুনেছিলাম, সেদিন থেকেই রাস্তার দু'ধারে বনফুলগুলো খুব মনোযোগ সহকারে দেখতাম এবং বিশেষ করে বর্ষার পর অনেক রকমের প্রজাপতিদের আনাগোনা দেখতাম ওইসব ফুলের উপর! তারপর একদিন শুনলাম 'হুতোম প্যাঁচা' এটিও আমাদের এক বাঙালি লেখকের ছদ্মনাম, তাঁর আসল নাম কালীপ্রসন্ন সিংহ | ওঁর লেখা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' আমাদের ক্লাসে পড়ানো হতো | আরও অনেকের মধ্যে 'পরশুরাম'-এর কথা এখনো বেশ মনে পড়ে, যাঁর প্রকৃত নাম রাজশেখর বসু |

অনেক পরে জানলাম এবং দেখলাম বিদেশেও লেখকদের pen name বা ছদ্মনাম ব্যবহার বহুকাল থেকে প্রচলিত | যেমন আমার বেশ প্রিয় একজনের নাম বলি, এঁকে গোটা পৃথিবীর মানুষ যে নামে চেনে সেটি তাঁর ছদ্মনাম, তিনি হলেন Mark Twain | ওঁর আসল নামটি আমরা সাধারণ পাঠক পাঠিকারা জানি না | সেই নামটি হ'ল Samuel Langhorne Clemens | এখানে উল্লেখ করি সেই বিখ্যাত Singer-Songwriter-Musician-Poet-এর নাম, যে নামে গোটা পৃথিবীতে তিনি পরিচিত, সেই নাম হ'ল Bob Dylan, যাঁর আসল নাম Robert Allen Zimmerman |

সর্বশেষে বাবা-মায়ের দেওয়া 'নাম'-এর সার্থকতা নিয়ে দু'একটা উদাহরণ দিয়ে গল্পটি শেষ করব | যেমন ধরুন একজনের নাম 'দেবতনু'| বাবা-মা'র দেওয়া এই নামটি যে কতটা উপযুক্ত তার প্রমাণ আমি ছাড়া আপাতত এই পৃথিবীতে আর কেউ উপলব্ধি করতে পারেনি এ যাবৎ |

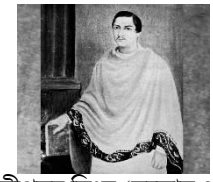
গল্পটি সংক্ষেপে বলি | ২০২০ সালে করোনা কালে গোটা পৃথিবীর মানুষ যখন হাহাকার আর অনিশ্চয়তায় ভুগছে, সেই সময় আমাদের একমাত্র সন্তান ঐশিক আর আমার জীবন এসে পড়েছে এক অসীম অন্ধকার গহ্বরে, আমি হারিয়েছি আমার জীবনের প্রাণশক্তি, আমার প্রিয়তমা সুস্মিতাকে, আর ঐশিক হয়েছে সদ্য মাতৃহীন | এই ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে 'দেবতনু' সত্যিই দেবতার মতো উপস্থিত হয়েছিল আমাদের দুজনের সামনে | এই ঘটনা লিখে বোঝানো সম্ভব নয়, শুধুই অনুভূতি | এই দেবতনুর সাথে আমাদের পূর্ব পরিচয় ছিল না | সত্যিই দেবতনু তার দুটি হাত দিয়ে আমাদের দুজনকে ওই অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেছে এবং প্রায় দশ মাস আমাদের সঙ্গে থেকেছে ওই দুঃসময়ে | একটি ৯ বছরের মাতৃহীন বালক তার অস্থির এবং অনিশ্চয়তায় ভরা জীবনে প্রাণভরে অক্সিজেন পেয়েছে ওই দেবতনু আঙ্কেলের কাছ থেকে | পৃথিবী তখন সেই অমানুষিক '6-feet' distance নিয়ে ব্যস্ত | আমি নিজে না পাই কাউকে দেখতে, না পাই একটু কথা বলতে, না মুখে খাবার তুলতে, তার সঙ্গে আমার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্রম

অবনতি চলছে| ওই দুঃসময়ে এই দেবতনুর বাড়ানো হাত ধরে আমি একটু একটু করে সুড়ঙ্গের অপরদিকে এক চিলতে আলোর সন্ধান পেয়েছিলাম | বেঁচে থেকে, লড়াই করে, ঐশিকের মুখে দুটো খাবার তুলে দেওয়ার শক্তি অর্জন করেছিলাম| সেইজন্য এখানে ওই বাবা মায়ের দেওয়া দেবতনু নামটি উল্লেখ করলাম|

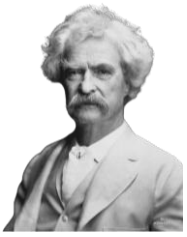
এরপরে বলি একজনের নাম, তিনি হলেন 'ত্রিগুণা সেন'| আহা কী সুন্দর নাম! আমি সবিস্ময়ে ভেবেছি, যিনি বা যাঁরা সেই শিশুটির 'ত্রিগুণা' নামটি রেখেছিলেন, তাঁদের নামকরণের সার্থকতার কথা| ত্রিগুণা সেন ৯২-৯৩ বছর জীবিত ছিলেন | তিনি ছিলেন প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ এবং গুণীজন | স্বাধীন ভারতবর্ষে দুটি প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ছিলেন অনেক বছর, প্রথমে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, তারপর কিছু বছর বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে | এরই মধ্যে তিনি বেশ কয়েক বছর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব সামলেছেন Education Minister হিসাবে | তিনি ছিলেন নামজাদা অধ্যাপক, successful administrator, nationally recognized educator | এক কথায় স্বাধীন ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ধারক ও বাহক ছিলেন তিনি| এই মানুষের নাম 'ত্রিগুণা' ছাড়া আর কী হতে পারত আমার জানা নেই| আশ্চর্যজনকভাবে আমি যখন ত্রিগুণা সেন মহাশয়ের নাম প্রথম শুনি ও চাক্ষুষ দেখি সেই মহান মানুষটিকে, তিনি তখন সদ্য পরলোকে গমন করেছেন| আমি সেইসময় যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম | আমার তখন MSc ফাইনাল ইয়ার, ১৯৯৮ | একদিন আমাদের ক্লাস চলাকালীন শুনলাম সদ্যপ্রয়াত ত্রিগুণা সেন মহাশয়ের মরদেহ আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আনা হবে| আমরা সবাই দল বেঁধে JU-এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, অরবিন্দ ভবনে হাজির হয়েছিলাম | সেদিন দেখেছিলাম আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ মানুষটিকে একবার চোখে দেখবেন এই আশায় ওখানে জমায়েত হয়েছেন | তখনকার Vice Chancellor সংক্ষিপ্তভাবে ত্রিগুণা সেন সম্পর্কে বলেছিলেন এবং আমরা সবাই ওঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম| এই পুরো ঘটনাটাই আমার এখনও মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করে এবং ওই সুন্দর নামটি আমার হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল সেই দিন থেকে|

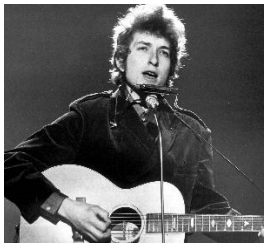
এরপর যাঁর নাম বলব, সেই নামের অর্থ যে কত গভীর তা মাপার মতো কোন measuring unit এই পৃথিবীতে এখনো আবিষ্কার হয়েছে বলে আমার মনে হয় না | আমি নিশ্চিত, আমার পাঠক পাঠিকারা ইতিমধ্যে অনুমান করতে পারছেন আমি কার কথা বলতে চলেছি| তিনি হলেন আমাদের সকলের বিস্ময় 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' বা 'রবি ঠাকুর'| আমার জানতে ইচ্ছে করে সেই ছোট শিশুটির নামকরণ কে করেছিলেন| এর চেয়ে উপযুক্ত নাম আর কীই বা হতে পারত ওই মহীরুহের? 'রবি' অর্থাৎ সূর্য| এই মহাবিশ্বে সূর্যের মতো শক্তির উৎস আর কার আছে! সূর্য যেমন অনন্তকাল আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে আলোকিত করে চলেছে তেমনি আজ এই একবিংশ শতাব্দীতেও আমাদের সেই 'রবি'-র কিরণে প্রস্ফুটিত বাঙালির কোমল হৃদয়!


বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

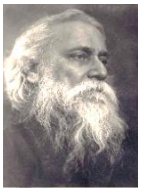

কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম প্যাঁচা)


রাজশেখর বসু (পরশুরাম)


Samuel Langhorne Clemens (Mark Twain)


Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)


ত্রিগুণা সেন


কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলোর সন্ধানে

বীরেশ্বর মিত্র

পান্ডিচেরির আকাশটা সেদিন যেন অন্যরকম ছিল | হালকা নীলের মধ্যে কোথাও এক অদৃশ্য শান্তির পরশ – যেন কোন দৈব আশীর্বাদ আমার মাথায় ঝরে পড়েছে | সমুদ্রের ঢেউগুলো খুব শান্ত, খুব মৃদু | আমি এসেছিলাম পন্ডিচেরিতে ক'দিনের জন্য – শুধু ঘুরতে নয়, নিজেকে খুঁজে পেতে | নিয়ম করে দু'বেলা অরবিন্দ আশ্রমে যেতাম চঞ্চল মনকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে | খুব ভাল লাগত আশ্রমের পরিবেশ |

প্রথম দিনই পৌঁছেছিলাম আশ্রমের ডাইনিং হলে | সাধারণ নিরহঙ্কার এক জায়গা | নেই কোন বিলাসিতা, নেই কোন চাকচিক্য – তবু এক অদ্ভুত পবিত্রতা যেন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে | এখানেই আমার এক অভিনব অনুভূতির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল | সবাই নীরবে বসে খাচ্ছে | কেউ উচ্চ স্বরে কথা বলছে না | এই নীরবতার মধ্যেই যেন এক গভীর সঙ্গীতের মূর্ছনা অনুরণিত হয়ে চলেছে |

অরবিন্দ আশ্রমে লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার নিতে হয় | বিশিষ্ট সভ্রান্ত ঘরের মহিলারা পরিবেশন করছিলেন | সবাই বয়স্কা; লাইনের সব শেষে দই পরিবেশন করছিলেন একজন তরুণী, বয়স বছর তিরিশ হবে | পরনে হালকা মেটে রঙের সালোয়ার কামিজ | কোন সাজসজ্জা নেই | তবু কী অপূর্ব এক দীপ্তি | চোখদুটি শান্ত, গভীর, যেন বহু দূরের কোনও আলোর ছায়া লুকিয়ে আছে | এক অদ্ভুত মাধুর্য এবং প্রশান্তি ঘিরে রয়েছে সেই মুখচ্ছবিতে | দই নেবার পরেও কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে ছিলাম তাঁর দিকে তাকিয়ে |

তিনি মৃদু হেসে বললেন, "আর কিছু লাগবে?"

নির্মল হাসি, যা কোন সাধারণ হাসি নয় | মনে হয় যেন তাঁর মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা অনন্ত শান্তির অভিব্যক্তি |

বোধহয় নিজের ভাবনার অতলে হারিয়ে গিয়েছিলাম, সম্বিত ফিরে আসার পর মাথা নেড়ে 'না' বললাম | খাওয়া শেষ হলেও মনটা যেন ভরল না | এই মেয়েটির মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু অনুভব করতে পারছি | এই অস্থিরতা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখল | সেই রাতে ঠিক করে ঘুমোতে পারলাম না | কে সে? কেন সে এখানে? কী এমন শক্তি যা তাকে এই জীবন বেছে নিতে বাধ্য করেছে? প্রশ্ন অনেক কিন্তু উত্তর মিলছে না |

পরের দিন আবার গেলাম ডাইনিং হলে | উদ্দেশ্য একটাই – সেই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করে তাঁর মনের রহস্যের খানিক আঁচ পাওয়া | দূর থেকে দেখলাম, ঠিক আগের মতোই শান্ত, নিরাভরণ | দই নেবার সময় আমি সাহস সঞ্চয় করে বললাম, "আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?"

তিনি একটু অবাক হলেন অবশ্যই | সেই ভুবন ভোলানো মৃদু হাসি হেসে বললেন, "খাবার পর আসুন, বাইরে বসে কথা বলা যাবে |"

খাওয়া শেষ করে আমি বাইরে এসে অপেক্ষা করতে লাগলাম | কিছুক্ষণ পর তিনি এলেন | আমরা দুজন ডাইনিং হলের বাইরে এক পুরোনো গাছের নিচে বসলাম | চারিদিক নিস্তব্ধ | হালকা বাতাস বইছে | উনি প্রশ্নের অপেক্ষায় রইলেন |

আমি বললাম, "আপনাকে দেখে মনে হ'ল আপনি আর সবার থেকে অনেকটা আলাদা | আপনার মধ্যে একটা অদ্ভুত শান্তি আছে | আপনি কি এখানে থাকেন?"

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "অনেক বছর ধরে আমি এখানে প্রায়ই আসি |"

- "আর আপনার পরিবার?"

একটু থেমে তিনি বললেন, "আমার মা বাবা আছেন, বয়স হয়েছে, কলকাতায় থাকেন, আমি বিবাহিতা |"

আমি চমকে উঠলাম, বিবাহিতা, তাহলে!

তিনি শান্ত গলায় বললেন, "সব সম্পর্কই শুধু এক জীবনের জন্য নয় | কিছু সম্পর্ক থাকে আত্মার সাথে |"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম | আবার জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি স্বেচ্ছায় এই জীবন বেছে নিয়েছেন?"

তিনি উদাস হয়ে আকাশের দিকে তাকালেন | যেন কোথাও দূরে কিছু খুঁজছেন |

- "হ্যাঁ, এটা আমার নিজের সিদ্ধান্ত |"

- "কিন্তু কেন?" আমার কৌতূহল বেড়েই চলছিল, "আপনার তো একটা সংসার আছে, পরিবার আছে সব ছেড়ে এখানে কেন?"

- "আমার জীবনে সব ছিল, এখনো আছে; স্বামী, পরিবার, স্বাচ্ছন্দ্য সব | কিন্তু ভিতরে একটা শূন্যতা ছিল | মনে হতো,

আমি যেন নিজের কাছেই হারিয়ে যাচ্ছি।"

- "তারপর?"

- "কয়েক বছর আগে এখানে এসেছিলাম এক বন্ধুর সাথে কিছুদিনের জন্য, আশ্রমের পরিবেশ আমাকে খুব আকর্ষণ করেছিল। তখনই বুঝতে পেরেছিলাম আমি আসলে কী খুঁজে বেড়াচ্ছি। এই নীরবতা, এই সাধনা এই আত্ম অনুসন্ধান – এটাই আমার আসল পথ। তারপর থেকে আমি সুযোগ পেলেই প্রতি দু'তিন মাসে এখানে চলে আসি। এবার ভাবছি একেবারে চলে আসব।"

- "আপনি সব ছেড়ে চলে আসবেন?" আমি যারপরনাই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

শান্ত গলায় তিনি বললেন, "ছাড়ছি না তো, রূপান্তরিত করছি। আমি বুঝতে পারলাম – ভালবাসা মানে শুধু একসঙ্গে থাকা নয়, ভালবাসা মানে মুক্তি দেওয়া। আমার স্বামী বুঝেছিলেন আমি কী চাই, তাই তিনি থামাননি।"

আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম।

- "আর আপনার বাবা-মা?"

- "তাঁরাও প্রথমে কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু এখন তাঁরা বুঝেছেন যে, আমি কোথায় সুখ খুঁজে পাই।

আমি তাঁর দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

- "আপনি কি সুখী?" আমি শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

- "হ্যাঁ, এই প্রথমবার সত্যিকারের সুখী।"

আমি বললাম, "আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি যেন অন্য কোন জগতের মানুষ।"

তিনি হেসে বললেন, "না, আমি খুব সাধারণ মানুষ। শুধু ভিতরের ডাকটা শুনতে পেয়েছি আর সেই দিকেই এগিয়ে চলার চেষ্টা করছি।"

তারপর বললাম, "আমি কি আপনার সাথে আবার দেখা করতে পারি?"

তিনি একটু ভেবে বললেন, "দেখা তো হয়েই যায়, যদি প্রয়োজন হয়।"

পরের কয়েক দিন আমি প্রতিদিনই ডাইনিং হল-এ যেতাম। আমাদের কথা হতো জীবন নিয়ে, আত্মা নিয়ে, ভালবাসা নিয়ে। তিনি বলতেন, জীবন শুধু বাইরের ঘটনা নয়। আসল জীবনটা ভিতরে ঘটে। কিন্তু আমরা বেঁচে থাকি কেবল বাইরের জগতেই। বাইরের জগতটা হ'ল প্রতিফলন। ভিতরটা বদলালে সব বদলে যায়।

একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি কখনও ফিরে যেতে চান আপনার পুরোনো জীবনে?"

তিনি একটু হেসে বললেন, "আমি তো কোথাও যাইনি, আমি শুধু নিজের কাছে ফিরে এসেছি।"

এই কথাটা আমার মনে এক গভীর ছাপ ফেলল।

শেষদিন যখন বিদায় নেবার সময় এল, তখন মনটা ভারি হয়ে উঠল। বললাম, "আমি হয়তো আবার আসব, আপনাকে দেখতে।"

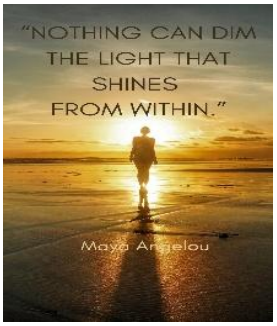
তিনি বললেন, "আমাকে নয়, নিজেকে দেখতে আসবেন।"

আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর দিকে তাকালাম।

তিনি বললেন, "যদি সত্যি কিছু খুঁজতে চান তাহলে বাইরে নয়, ভিতরে খুঁজুন।"

আমি মাথা নত করলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলাম যে জীবনে আমরা কত কিছু চাই – সম্পদ, সম্পর্ক, সাফল্য। আসলে আমরা কি জানি, আমরা কী খুঁজছি? সেই তরুণী, তিনি আমাকে কোন উত্তর দেননি কিন্তু তিনি আমাকে প্রশ্ন করতে শিখিয়েছেন। হয়তো এটাই আসল শিক্ষার পথ। পরদিন আমি পন্ডিচেরি ছেড়ে চলে এলাম। কিন্তু আজও যখনই চোখ বন্ধ করি, সেই মেয়েটির শান্ত মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে আমার মানসপটে। আর বুঝতে পারি জীবনের আসল পথটা হয়তো বাইরে নয়, ভেতরেই কোথাও লুকিয়ে আছে। হয়তো একদিন আমিও সেই পথ খুঁজে পাব। হয়তো সেই আলোর সন্ধানেই বারে বারে ফিরে আসব নিষ্ঠা ও শান্তির আধার এই আশ্রমে।



চাঁপাডাঙ্গায় ছ'বছর

শ্যামল মজুমদার

১৯৭৬ থেকে ১৯৮১ অবধি কর্মসূত্রে ছিলাম হুগলীর চাঁপাডাঙ্গা নামক এক গঞ্জে। এখানকার আলু ও কুষ্মান্ড বিখ্যাত। রবিবার ভাতঘুমের সময় প্রায়শই কানে আসত –

"চানা, আর নকুলদানা,
বাবুদের জন্য আনা।
চলে আয়, চলে আয়রে, গৌরগোপাল,
খোকা খাবে, খুকু খাবে, আর খাবে
খোকাদের ঠাকমা।"

বিচিত্র মুখোশে মুখ ঢেকে, কুচকুচে কালো ফুলহাতা শার্ট কালো চোঙা প্যান্টে গোঁজা, পায়ে ঘুঙুর – একটি রোগা মানুষ কোথায় কোথায় যে তার পসরা নিয়ে ফিরি করে বেড়াত!

কর্মজীবনের সূত্রপাত অবশ্য আরেকটু আগে, ১৯৭৫ সালে, ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। ফার্টিলাইজার কর্পোরেশানের একটি প্রজেক্টে, ইন্দোজার্মান ফার্টিলাইজার এডুকেশনাল প্রজেক্ট। আশুরিয়া গ্রামে, বীরভূম মুর্শিদাবাদ সীমানার অনতিদূরে একটি দোতলা মাটির খড়ছাওয়া কুটিরে। কমবেশী ন'মাস মতো ছিলাম হোথায় মায়ে-পোয়ে। তারপর ব্যাঙ্কে, হুগলী জেলার চাঁপাডাঙ্গায় ১৯৭৬ সালে।

ফিরে তাকালে মনে হয় যেন সে এক অদ্ভুত সময়। কুড়ি টাকায় দুই থলে ভর্তি রবিবারের বাজার, পমফ্রেট মাছ ১৫ টাকা কিলো (অচ্ছেদ্দার মাছ), তোলা উনুন, ঘুঁটে কয়লার আগুন ইত্যাদি। প্রথম আস্তানা ছিল মেস, পরে একজন মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির দোতলায় মাকে নিয়ে উঠলাম। নববধূও সেই ছোট দুটি ঘরেই সংসার পেতেছিলেন ও সাধারণের ব্যবহৃত স্নানঘর ইত্যাদিকেই মানে মানে মেনে নিয়েছিলেন; প্রেম ছিল নির্ভেজাল। প্রধান সড়ক থেকে বাড়ির সংযোগ ছিল আলপথ। বৃষ্টির পর সেই আলপথ দিয়ে সান্ধ্য আঁধারে বাড়ি ফেরা আমার অসাধ্য ছিল। একদিন হামাগুড়ি দিয়ে কর্দমাক্ত পোশাকে আস্তানায় পৌঁছেছিলাম।

চাকরি পোক্ত হতেই ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে বিবাহ। বিবাহের কিছুদিন পরই সৌভাগ্যবশতঃ নতুন গৃহে স্থানান্তরিত হয়েছিলাম। আলুর গুদামের ছাদে তিন কামরার ঠিকঠাক একটি বাসা প্রশস্ত খোলা ছাদ সংলগ্ন; খোলামেলা ও একাধারে ব্যক্তিগত পরিসর।

সেই বছরেই হয় ভয়াবহ বন্যা। বাবা নবদ্বীপে। কিছুদিন আগেই হোটেল ব্যবসায় অবসর হেতু প্রাপ্ত অর্থ লগ্নী করেছেন এক সুহৃদের সঙ্গে পার্টনারশিপে। গঙ্গাতীরবর্তী সেটিই আমার সত্যিকারের বাবার হোটেল, 'গঙ্গাশ্রী লজ'। ছোট করে বাবার অর্থ উপার্জনের পশ্চাৎপটটা বলে নিলে মানুষটিকে বুঝতে সুবিধে হতে পারে ভেবে জানাই যে, শিক্ষান্তে রয়াল এয়ারফোর্সের যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন বাড়ি থেকে পালিয়ে। সেই কারণেই নাকি ঠাকুমা অন্তিমবারের মতো শয্যাগ্রহণ করেন এবং বাবা ফিরে এসেও তাঁকে বাঁচাতে পারেননি। প্রাক্তন সৈনিক হওয়ার সুবাদে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনে চাকরি করেন। অবসর নিয়ে স্বাধীন ব্যবসা করতে ইচ্ছে হলে দুই বন্ধু মিলে সস্তায় একটি হোটেল কিনে ফেলেন। অনেকবার মনে হয় গিয়ে একবার দেখে আসি সেই লজের বর্তমান অবস্থা।

বন্যায় বাবার সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আমাদের তো পৃথিবী অন্ধকার! মা ও তাঁর পুত্রবধূকে বিরাটিতে ঠাকুমার জিম্মায় রেখে আমি যাওয়া স্থির করলাম। বাবার ছোটকাকিমা, আমাদের সেসময়ের সবেধন ঠাকুমা, প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্না ছিলেন, তাঁর হুকুমে অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাঙাকাকু আমার যাত্রাপথের অভিভাবক হলেন। যানবাহন নেই, ভোরবেলা কাকা-ভাইপো জলমগ্ন রাস্তায় নগ্নপদে বেলঘরিয়া স্টেশনে পৌঁছালাম। ট্রেনে কৃষ্ণনগর। রিক্সায় স্বরূপগঞ্জ ঘাট। ঘাট ভেসে গেছে। সাতাশ বছরের জীবনে বন্যা কখনও দেখিনি। জলাকীর্ণ বিশ্বচরাচর। এর মধ্যে কোথায় যাব? না জানি সন্তরণ; জল ছাড়া আর কিছুই দৃশ্যমান নয়। দিকচক্রবালে কোথাও স্থলের আভাসমাত্রও পাওয়া যাচ্ছে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় শব্দটিকে সশরীরে প্রত্যক্ষ করলাম যেন।

নৌকোর তত্ত্বতালাস শুরু হ'ল। গন্তব্য বোঝাতেই কালঘাম ছুটে গেল। অকস্মাৎ উদিত হলেন এক মাল্লা যিনি আমার বাবাকে এবং তাঁর হোটেল দুটিকেই চেনেন। উপরন্তু জানা গেল যে সেই হোটেলেই তিনি সপরিবার আশ্রিতও বটে। বাবার হোটেলের শয্যা, ক্ষেত্র এবং অর্থানুকূল্যেই তাঁর মতো

আরো বেশ কিছু পরিবার ধনেপ্রাণে বেঁচে গেছেন। কৃতজ্ঞতায় পরানির কড়ি অনেকটাই মকুব করে দিলেন।

তো সেই বিপুল জলধী পার হতে শেষ অবধি কমবেশী তিনঘন্টা অতিবাহিত হ'ল। এদিকে ওদিকে জেগে থাকা মন্দিরের দৃশ্যমান চূড়ায় আশ্রিত গোবৎস এবং ভাসমান বৃক্ষ ব্যতীত কিছু দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। নাও ভিড়ল হোটেলের দোতলায়। একতলা ও সিঁড়ি বন্যার জলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত ছিল। জনাকীর্ণ দোতলাটিতে বাবা ঠায় দাঁড়িয়ে। বসতে পারছেন না, চলতেও প্রায় অপারগ। অথচ আমাদের সঙ্গে ফিরে যেতেও অরাজী; তাঁর আশ্রিতদের জন্য চিন্তায়। মিলিটারি জেদ। ভাগ্যিস কাকা ছিলেন আর ঠাকুমার আদেশ ছিল। আশ্রিত মাঝিমাল্লাদের সমবেত জোরাজুরিতেও কিছুটা চিঁড়ে ভিজল। যতদূর সম্ভব টাকাপয়সা তাদের দিয়ে দিলেন। হোটেলে যা চালডাল ছিল তাও দিয়ে দিলেন। এরপর নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি ফিরতি নৌকায় আমাদের সঙ্গী হলেন। সারাটা জলপথ দাঁড়িয়ে এলেন। পিঠ, কোমর ও পায়ে এত ব্যথা, কিন্তু স্বীকার করবেন না, হার মানবেন না। স্বরূপগঞ্জে নৌকো থেকে ধরাধরি করে নামানো হ'ল, দুইপা হাঁটতে গিয়ে পড়ে গেলেন। সেই প্রথম তাঁর চোখে যেন দেখতে পেলাম পরাজয়ের লজ্জা ও বিড়ম্বনা। সুহৃদপ্রতীম ছোট ভাইয়ের সহযোগিতায় ধীরে ধীরে ছোট পদক্ষেপে রিক্সায় উঠলেন। কিন্তু বসতে পারলেন না। সেবার বিরাটিতে ঠাকুমার সক্রিয় তত্ত্বাবধানে, কাকা-কাকিমা ও পিসিমণিদের সেবা শুশ্রূষায় সুস্থ হয়ে উঠলেন, প্রায় মাস তিনেকের ব্যবধানে।

ঠাকুমার কাছে বাবাকে গচ্ছিত রেখে আমায় ফিরতে হ'ল চাঁপাডাঙ্গার কর্মক্ষেত্রে। বন্যার কারণে ২রা অক্টোবরের ছুটি বাতিল হয়ে গিয়েছিল। আমরা সবাই রোজ জল ঠেলে অফিস করেছি। বন্যার্ত মানুষের জন্য সাধ্যানুযায়ী পরিশ্রম করেছি। এরই মধ্যে এক সন্ধ্যায় উপস্থিত হলেন একজন সতীর্থ বন্ধু রাতের আশ্রয়ের খোঁজে। তিনি সবরকম চেষ্টা করেছিলেন বানভাসি আরামবাগে তাঁর পিতৃগৃহে পৌঁছানোর কিন্তু বিফল, বিপর্যস্ত হয়ে ফিরে এসেছেন। সারারাত উদ্বিগ্ন জাগরণে অতিবাহিত করে পরদিনই কাকভোরে তিনি পুনরায় তাঁর উদ্দিষ্ট সাধনে পথে নেমে পড়লেন। আমি সঙ্গে গেলাম। মিলিটারি মোটরচালিত নৌকায় প্রবল ঝুঁকি মাথায় নিয়ে অনিশ্চিত, বিপদসঙ্কুল জলপথে তিনি ভেসে গেলেন আমাদের দুশ্চিন্তায় ফেলে রেখে। সৌভাগ্যবশতঃ স্বল্প সময়ের মধ্যেই খবর পেয়েছিলাম যে তিনি তাঁর অভীষ্ট সাধন করে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছিলেন।

চাঁপাডাঙ্গায় ১৯৮১-র মাঝামাঝি অবধি ছিলাম। ইতিমধ্যে ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ তারিখে শান্তিনিকেতনে আমার পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে (নার্সিং হোমের বিল তিনশো টাকার নীচে ছিল)। সেই নার্সিং হোমটি বহুকাল বিগত।

সেই গ্রামে, মতান্তরে গঞ্জে, আমি কেষ্টযাত্রা দেখেছিলাম। পূর্বে কোনো ধারণাই ছিল না এই গ্রামীণ শিল্পের। একটি আংশিক পোশাকাচ্ছাদিত, আলতাচর্চিত পা, চন্দনসদৃশ কিছু একটি বস্তু কপালে তিলকের ভূমিকায়, না-কিশোর ও তার সঙ্গিনী, দুইজনে যথাক্রমে কেষ্ট ও রাধার ভূমিকায় প্রায় দেড় ঘন্টাব্যাপী প্রণয়পালা গাইল। কোনোরকম ঘোষণা বা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই চারিদিকে দর্শকশ্রোতাদের সমাগম হ'ল। না ছিল মঞ্চ, না স্বরবর্ধক যন্ত্রণা, না বেশভূষা সাজগোজ। দুইজনের গলায় দুটি আধশুকনো মালা, তাই পরিণতিতে পারস্পরিক কণ্ঠবদল হ'ল সমবেত আপ্লুত জনতার সাশ্রুনয়ন 'হরি হরি' বোলের মাঝে। সেই মালা দুটি নিলামে চড়ানো হলে উৎসাহী ক্রেতাদের মধ্যে প্রায় হাতাহাতি হবার যোগাড়। এছাড়াও সকলেই সামর্থ্যানুযায়ী দান করলেন। এটি আমার একটি বিস্ময়কর মনোরম স্মৃতি।

বন্যা ছিল বাৎসরিক নিয়ম। তবে ১৯৭৮ সালে ব্যতিক্রমী ছিল তার ভয়াবহ ব্যাপ্তি ও সর্বনাশের পরিমাণ। অন্য কোনো এক বছরে বানের জলে ভেসে আসা জ্যান্ত চিংড়ি পেয়েছিলাম, তাদের আয়তন দেখে সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের ভাষায় "সকেট থেকে আইবল দুটি টপাৎ করে মেঝেতে পড়ে গেল" ইত্যাদি মনে পড়ে যেতে বাধ্য।

ইলিশের মরসুমে এক বন্ধুবর, যিনি মুন্ডেশ্বরী ইরিগেশন প্রকল্পের এঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত ছিলেন, ধরে নিয়ে গেলেন দিগরুইঘাটে। দামোদরে ইলিশ ধরা চাক্ষুষ হ'ল ও সস্তায় কিনলাম; নদ থেকে সোজা রান্নাঘরে। এঞ্জিনিয়ার সাহেবের খাতিরে একটু বেশীই সস্তা হ'ল বলাই বাহুল্য। তো তিনি ছিলেন অবিবাহিত, এলিজিবল ব্যাচেলর যাকে বলে আর কি। সবকটি মাছই এল আমার ডেরায়, আমার সহৃদয় গৃহিনী রেঁধেবেড়ে দুই ভোজনরসিকের আত্মা পরিতৃপ্ত করলেন।

দামোদরে ইলিশের উৎপাদন কম হয় বলে শুনেছি, কিন্তু স্বাদ যে তার কী মনোমুগ্ধকর তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

কাজে বেরিয়ে আমাকে দূরদূরান্তে বহু গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে হতো – পদব্রজে, সাইকেলবাহনে, বাসে, রিক্সাভ্যানে নানারকম প্রক্রিয়ায়। দুটি গ্রামের নাম ভুলে গেছি কিন্তু তাদের স্থানমাহাত্ম্যের বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য যাই বলা যাক না কেন অবিস্মরণীয়। একটিতে দিনের বেলায় কোনো পুরুষ মানুষকে জাগ্রত পাওয়া যাবে না। তারা সারারাত ডাকাতি করে আর দিনে ঘুমোয়। অন্য গ্রামটিতে প্রায় প্রতিদিন কেউ আত্মঘাতী হয়, অবিরাম ক্রন্দনরোল ও অনির্বাণ শোকের দহনে আচ্ছন্ন তার পরিবেশ। সেই গাঁ যে কী করে উজাড় হয়ে যায়নি সেটাই বিস্ময়কর। মা ষষ্ঠীর অকৃপণ কৃপাই একমাত্র ভরসা বোধহয়।

মধুরেণ সমাপয়েৎ;

চাঁপাডাঙ্গার এক অন্যতম স্মৃতিসংগ্রহ, এক কলি গানের টুকরো, কোনো আত্মভোলা বৈরাগীর গলায় শোনা, আজও কানে বাজে...

"কৈ গেলা গা ম্যাঘার মা,
শুনসা নাকি ম্যাঘার মা,
তোমার ম্যাঘার প্যাগনা গজাইসে"...



চেন্নাই-এ হারিয়ে যাওয়া

কাবেরী ঘোষ

জাহাজে জয়েন করার কথাই ছিল, তবে কবে সেই তারিখটা জানা ছিল না। ঘটনাটা ঘটেছিল ৮0 দশকের শেষ দিকে। মাদ্রাজের নাম পাল্টে যে চেন্নাই হবে সেটা তখনো মনে হয় কারোর মাথাতেই ছিল না।

ক্যাপ্টেন ঘোষ তখন রান করছেন চেন্নাই টু পোর্ট ব্লেয়ার – জাহাজের নাম 'নানকৌড়ি'।

এমন একটি দিনে চেন্নাই অফিস আমাকে জানাল অমুক দিনে আপনাদের চেন্নাইতে চলে আসতে হবে। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা হোটেল উডল্যান্ড-এ চলে আসবেন, ময়লাপুর যামিনী ফ্লাই ওভারের পাশেই। আপনার নামে সেখানে একটি ঘর বুক করা আছে।

এখানে একটু বলে রাখা ভালো – ভারতবর্ষের যত এইরকম প্যাসেঞ্জার জাহাজ আছে সব রাষ্ট্রপতি মন্ত্রকের, কিন্তু চালায় SCI। তো অফিসকে জাহাজ থেকে জানানো হলে তবেই জানতে পারে জাহাজের বার্থিং এবং সেলিং-এর সময় কখন।

ওদের কথামতো দুটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে রওনা দিই। আমাদের ফ্লাইট ছিল বিকেলে। চেন্নাইতে যখন পৌঁছালাম তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। এটাই আমার প্রথমবার চেন্নাইতে যাওয়া। একটা প্রিপেড ট্যাক্সি নিয়ে নিলাম। যে সময়ের কথা বলছি, তখন কিন্তু টাউনে ঢুকতে গেলে রাস্তার দুদিকে এত লাইটের সমারোহ ছিল না, ছিল না এতসব বাড়ি-ঘর-দোর। চারপাশ ছিল বেশ ফাঁকা। এই আধো-অন্ধকারের জন্যই বোধহয় এয়ারপোর্ট থেকে যমুনা ফ্লাই-ওভারের ওপর দিয়ে আমাদের গন্তব্যে যাবার সময় রাস্তাটা অনেক লম্বা মনে হয়েছিল। মেয়ে আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে, আর ছেলে কোলে; সেও ঘুমিয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছিল এই অন্ধকারে মধ্যে দিয়ে চলছি তো চলছিই। আমার কিন্তু তখন বেশ ভয় করতে শুরু হয়েছে। ড্রাইভার বুঝতে পেরে বলল, "ভয় পেও না।" তাই শুনে আরো ভয়ে আমার ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগল! এখনো আমার স্মৃতিতে সেই অনুভূতিটি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

এসে পৌঁছালাম হোটেলে। রিসেপশনে গিয়ে জানলাম আমার বা ঘোষের নামে কোন ঘর বুক করা নেই।

দরকারের সময় বোধহয় আমার সব ভয় চলে যায়। তাকিয়ে দেখি ড্রাইভার বলছে, "চিন্তা কী তোমার? চলো আমার সঙ্গে, আমার অনেক চেনা হোটেল আছে।"

সে কথায় কান না দিয়ে আমি রিসেপশনিস্টকে বললাম, "এত রাতে আমি বাচ্চাদের নিয়ে কোথাও যাব না। যে করেই হোক এখানে আজ রাতে আমাদের থাকতে দিতেই হবে। ট্যাক্সিওয়ালাকে চলে যেতে বললাম।

মেয়ে একটু বড় হয়েছে, মা'র দিকে তাকিয়ে সে মায়ের অসহায়তাটা বেশ বুঝতে পারছে।

হোটেল রিসেপশন থেকে জোর করে এক রাতের জন্য একটা ঘর আদায় করে সেখানে মালপত্র আর বাচ্চাদের নিয়ে ঢুকে পড়লাম। বাচ্চারা ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি রইলাম জেগে, ভোরের অপেক্ষায়।

সবে বাইরে আলো ফুটছে – তালা দিয়ে সবাই যে যার ঘুমোচ্ছে। আমি এদিক ওদিক ঘুরছি। এমন সময় হোটেলের PRO আমায় দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে এগিয়ে এসে বললেন, "প্রবলেম থাকলে বলতেই পারো।"

একটু বেলা হলে ওঁর কাছ থেকে SCI-এর ঠিকানা নিয়ে সোজা চলে গেলাম সেই অফিসে। আমাদের খবর পেয়ে সারা অফিসের সবাই তোলপাড় করে ছুটে এলেন। দেখতে পেলাম ক্যাপ্টেন ঘোষ তাঁর পরিবারের খোঁজ না পেয়ে কতটা উতলা হয়ে উঠেছেন।

জাহাজ সেইদিন রাতে বার্থিং হবার পর ঘোষ যখন 'উডল্যান্ড'-এ ফোন করেন, তখন হোটেল থেকে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয় ওই নামে কোন বোর্ডার চেক-ইন করেনি। একথা শোনার পরই উনি SCI-কে খবরটা দেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন চলে যান এয়ারপোর্টে। এয়ারপোর্টের লিস্ট বলে দেয় আমরা তিনজন সহি সলামত অবস্থায় চেন্নাইতে ল্যান্ড করেছি; অথচ হোটেল বলছে আমরা ঢুকিনি। কী কান্ড! থানায় খবর চলে গেছে, ঘোষ অফিসে বসে আছেন থানা থেকে কী খবর আসে শোনার জন্য। বাড়িতে শ্বশুরমশাই এই খবর শোনার পর একদম চুপ মেরে গেছেন...

ঠিক এই সন্ধিক্ষণে দুটি বাচ্চাসহ মায়ের আগমন! বাচ্চারা বাবাকে দেখতে পেয়ে কী করবে বুঝতে পারছে না, অফিসারেরা দারুণ খুশি ঘোষের পরিবারকে একসঙ্গে দেখতে পেয়ে, নইলে ঠিক ছিল সেলিং ক্যান্সেল করে আমাদের খোঁজা হবে।

এসবের মধ্যে আমি কেবল ভাবছিলাম কত তাড়াতাড়ি আমরা হোটেল থেকে স্যুটকেসগুলি নিয়ে জাহাজে গিয়ে নিশ্চিন্তে একটু ঘুমোব। প্রচুর টেনশন নিয়ে ফেলেছিলাম...!

পরবর্তীকালে এইরকম ঘটনা আরো ঘটেছে আমার জীবনে, তাও আবার বিদেশের মাটিতে! আজ তারা কত বড় হয়ে গেছে...



ভালোবাসার ভূত আর ভূতের ভালোবাসা

সফিক আহমেদ

তিন্নি ছোটবেলা থেকেই একটু ডেপো প্রকৃতির, যাকে বলে অকাল পক্ক। তার মধ্যে সবসময় একটা ভালোবাসার ভূত বিরাজ করত আর মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠত কাউকে না কাউকে ভালোবেসে ফেলার জন্য।

বছর দশেক বয়সে ফ্রক পরে বাবা মায়ের হাত ধরে পাড়ার সার্বজনীন দুর্গাপূজার জলসা দেখতে গিয়ে কালোয়াতি মার্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান চলাকালীন ইতিউতি চাইতে চাইতে চোখে পড়ল সামনের সারিতে গোলগাল মিষ্টি দেখতে টুকটুকে ফর্সা লাল আপেলের মতো গাল, তেল চকচকে সিঁথিকাটা চুলের বিল্টু গভীর মনোযোগ দিয়ে গান শুনছে আর তালে তালে মাথা নাড়ছে। তিন্নির তো গান শোনায় মন নেই, তবে মনে মনে ঠিক করে ফেলল বিল্টুকে ভালোবাসতে হবে। তখন ভালোবাসাটা কি জিনিস, এটা খায় না মাথায় মাখে তার কোনো সম্যক ধারণাও ছিল না তিন্নির। বিল্টু থাকে তাদের গলিতেই, পাঁচটা বাড়ির পরের বাড়িতে। সেখানে ওর যাতায়াতও আছে।

যা ভাবা তাই কাজ, পরেরদিন থেকে বিল্টুর বাড়িতে কারণে অকারণে বিভিন্ন ছুতোয় যাতায়াত বাড়িয়ে দিল। কখনো গল্পের বই চাইতে, কখনো পড়ার নোট নিতে বা কখনো নেহাত গল্প করতে – বেশ একটা মাখোমাখোভাবে বিল্টুর গা ঘেঁষে বসত, তবে বিল্টুর মা এলেই সড়াৎ করে সরে যেত। তবে বিল্টুটা একেবারে আকাট ভালো ছেলে। তার কোনো হেলদোল নেই তিন্নি কাছে এল বা দূরে গেল। একদিন মা এসে পড়লে বিল্টু বলল, "দেখো না মা, তিন্নি কেমন গায়েপড়া।" মা হেসে বলল, "তা বেশ তো, তিন্নি পড়াশোনায় কত ভালো, ওর থেকে নাহয় অঙ্কগুলো একটু বুঝে নিতে পারিস তো।" তিন্নি মনে মনে প্রমাদ গুনল, ভালোবাসতে এসে যদি অঙ্ক বোঝাতে হয় তাহলেই হয়েছে। তার উপর আজকাল বিল্টু এক ক্ল্যাসিকাল গানের মাস্টারের কাছে তালিম নিচ্ছে, হাতে একটা সুতো বাঁধা দেখিয়ে বলে নাড়া বেঁধেছে আর যখন তখন উচ্চৈঃস্বরে একটা বা আধখানা দুর্বোধ্য কথা ইনিয়ে বিনিয়ে গলা কাঁপিয়ে মাথা নাড়িয়ে বলে যাচ্ছে। তিন্নি আর নিতে পারছিল না বিল্টুর এই নতুন অবতার। হুশ করে তার ভালোবাসাটা উবে গিয়ে ভালোবাসার ভূতটাও তখনকার মতো ঘাড় থেকে নেমে গেল। তবে বেশিদিনের জন্য নয়, ভালোবাসার ভূত তার মধ্যে থেকেই গিয়েছিল।

বয়স তখন তার বারো কি তেরো। গরমের ছুটিতে ট্রেনে চেপে সপরিবারে যাচ্ছিল গ্রামের বাড়ি বর্ধমানে। বাবার এক গ্রামতুতো আত্মীয় পরিবারও ছিল সেই ট্রেনে। সেকালে গ্রামতুতো আত্মীয়রাও নিজের আত্মীয়র থেকে কোনো অংশে কম হতো না। গ্রামে গিয়ে তাদের বাড়িতে এক সন্ধ্যাবেলা নেমন্তন্ন ছিল, তখন সবে সেখানে ইলেক্ট্রিকের খাম্বা বসছে, তার টানা হয়নি তখনও। হ্যাজাকের আলোয় খেতে খেতে আলাপ হ'ল গ্রামের কিশোর ভুবনের সাথে। ভুবনের হাজার কৌতূহল শহুরে মেয়ে তিন্নির জীবন নিয়ে। কেমন স্কুলে পড়ে, কেমন ইউনিফর্ম, কোনোদিন সিনেমা দেখেছে কিনা, কী খেলা হয় স্কুলে ইত্যাদি নানান প্রশ্ন তার। তিন্নি উত্তর দিতে থাকে আর ভুবনের গ্রামের স্কুলের তুলনা করে দেখে ভুবনের স্কুলে না আছে ইউনিফর্ম না আছে একেক বিষয়ে আলাদা আলাদা মাস্টার, আর খেলাধুলা বলতে গ্রামের মাঠে একটা সেলাই করা ফুটবল নিয়ে মাতামাতি আর ক্ষেতের কাজে, বাগানের কাজে পরিবারকে সাহায্য করা। ভুবনের সারল্য আর মুখে সবসময় লেগে থাকা হাসি দেখে তিন্নির ভারি ভালো লেগে গেল। খাওদাওয়ার পরও বাবা মায়ের গল্পের আর শেষ নেই। তিন্নিকে উসখুস করতে দেখে ভুবনের বাবা ভুবনকে বলল, "তিন্নি মাকে তুই বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয়, আমরা আর একটু গল্প করি।"

ভুবন একহাতে একটা লণ্ঠন আর এক হাতে তিন্নির হাত ধরে বাঁশ বাগানের মধ্যে দিয়ে একটা সরু পায়েহাঁটা পথে চলতে চলতে, তিন্নির ভালোবাসার ভূতটা কেমন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ভুবনকে খুব ভালোবাসতে ইচ্ছা করল তিন্নির। বাঁশ বাগানের আলো আঁধারি, লণ্ঠনের নিভু নিভু আলোয় এক অপার্থিব পরিবেশ। হঠাৎ লণ্ঠনটা বাতাসে ঝপ করে নিভে গেল, আর তিন্নি ভুবনের হাতটা জড়িয়ে ধরল। গ্রামের ছেলে ভুবন একটু চমকে গেলেও হাতটা ছাড়িয়ে নিল না। ভালই লাগছিল একটা শহুরে মেয়ের গায়ের গন্ধ আর একসাথে পায়ে পা মিলিয়ে অন্ধকারে পথ চলা। বাঁশ বাগানের শেষে খোলা মাঠে চাঁদের আলো ছিল। বাকি পথটা কোনো কথা না বলে সে তিন্নিকে বাড়ি পৌঁছে দিল। তিন্নি আদুরে স্বরে বলল, "আজ চলি

কিন্তু বাকি যে ক'দিন আছি আমাকে কিন্তু গ্রাম দেখাতে হবে।" ভুবন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়ে আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল আর তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সেই অন্ধকারের দিকে।

এরপর কয়েকটা দিন একসাথে গ্রামের নদীর চর আর এক চিলতে জল দেখা, ধান ক্ষেতের আল দিয়ে ব্যালান্স করে হাঁটা, আম বাগানে ঝরে পড়া আম কুড়োনো এইসব করতে করতে তিন্নির ভালোবাসাটা বেশ চাড়া দিয়ে উঠেছে আর ছুটিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভুবন আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় মনমরা হয়ে থাকতে থাকতে একদিন আমবাগানে ক্ষেতে কাজ করা রুক্ষ হাতে তিন্নিকে জোর করে কাছে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করতেই তিন্নির ভালোবাসার মৌতাত কেটে গেল। ভুবনের গায়ের ঘেমো গন্ধ, শক্ত চোয়াল আর কঠিন হাতের ছোয়ায় হঠাৎ ভালোবাসার ভূতটা নেমে গেল। তিন্নি ভুবনের বাহুপাশ থেকে ছিটকে বেরিয়ে দৌড় লাগাল বাড়ির দিকে। পরদিন ট্রেনে কলকাতায় ফিরতে ফিরতে আনমনা তিন্নি ভাবতে লাগল ভালোবাসাটা ফেলে এলাম, তবে ভালোলাগা মুহূর্তগুলো সঙ্গে থেকে গেল।

তিন্নির জীবনে ভালোবাসার ভূত ফিরে ফিরে আসে, আবার চলেও যায়। তিন্নির তখন বছর ষোলো বয়স, ভালোবাসার ভূতের দৌরাত্ম্যও বয়সোচিত শারীরিক আবেদন নিয়েই আসে আজকাল। সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা, বাড়িতে গৃহশিক্ষকের অবাধ যাতায়াত। তার মধ্যে বিদ্যুৎ স্যার এঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র, সায়েন্স সাবজেক্ট পড়ায়। হালকা গোঁফদাড়ি নিয়ে খুবই আকর্ষণীয় চেহারা তিন্নির কাছে। আজকাল পড়ার চাপ থেকে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচার জন্য তিন্নি শিবরাম চক্রবর্তীর রচনা সমগ্র ঘাঁটতে থাকে আর হেসে একটু হালকা হয় তার মন।

তারপর সে ডুবে গেল 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা' পড়তে আর নিজেকে কল্পনা করতে লাগল ভালোবাসার মুখ্য চরিত্র রিনি বলে, আর বিদ্যুৎ স্যার স্বয়ং শিবরাম। এক দুপুরে বিদ্যুৎ স্যারের আসার কথা আর মা'রও বিশেষ কাজ থাকায় বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। ভালোবাসার ভূত মাথায় কিলবিল করছে। রিনির সন্দেশ মুখে নিয়ে শিবরামের সাথে প্রথম চুম্বন দৃশ্যটা আজ বিদ্যুৎ স্যারের সাথে করেই ফেলবে এই মনে করে একটা প্লেটে সন্দেশ আর জল সাজিয়ে রেখেছিল। ঘরের আলো পাখার সুইচ বন্ধ করে অল্প অল্প ঘাম নিয়ে সামনে খোলা এ-লাইন ফ্রক পরে অপেক্ষা করছিল যদি প্রথম চুম্বনের পর বিদ্যুৎ স্যার শিবরামের রিনির মতো তার নিরাবরণ দেহ দেখতে চায় তাতেও তার কোনো আপত্তি নেই। বিদ্যুৎ স্যার রোদে পুড়ে তাদের বাড়িতে পৌঁছে কলিংবেল না বাজাতেই চটপট দরজা খুলে দিয়ে তিন্নি বলল, "আজ কেউ বাড়িতে নেই আর কারেন্টও নেই, এই গরমে চলুন ছাতের ঘরে গিয়ে পড়ি। ওখানে বেশ হাওয়া বাতাস আছে। এই বলে সন্দেশের প্লেট আর জল নিয়ে পায়ে পায়ে ছাদের সিঁড়িতে উঠতে লাগল। সদ্য যুবক বিদ্যুৎ স্যার ছাত্রীর ওই গজগামিনী রূপ দেখে একটু চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করল। যাহোক, ছাদের ঘরে গিয়ে সন্দেশের প্লেটটা মাটিতে রেখে তিন্নি, মানে তখনকার রিনি একটু পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রশ্ন করল, "বিদ্যুৎদা, আপনি গল্পের বই পড়েন, নাকি শুধু নীরস অঙ্ক আর বিজ্ঞানের মধ্যেই ডুবে থাকেন?" হঠাৎ স্যার ছেড়ে বিদ্যুৎদা সম্ভাষণে একটু থতমত খেলেও সেটা কাটিয়ে বেশ সপ্রতিভ উত্তর এল, "অবশ্যই পড়ি।"

- "আচ্ছা শিবরামের 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা' পড়েছেন?"
- "হ্যাঁ পড়েছি।"
- "রিনিকে আপনার কেমন লাগে? আচ্ছা রিনির সন্দেশ মুখে প্রথম চুমু খাওয়াটা কেমন লাগে? বিদ্যুৎদা তুমি তিন্নির মুখের সন্দেশ খাবে, চুমু খাবে?"

হ্যাঁ-না বলার সুযোগ না দিয়ে তিন্নি কোনোদিকে না তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে মাটিতে রাখা প্লেট থেকে একটা সন্দেশ তুলে অর্ধেক মুখে গুঁজে বিদ্যুতের দিকে বিদ্যুৎ গতিতে মুখটা বাড়িয়ে দিল। বিদ্যুৎদা বিস্ফারিত ও আতঙ্কিত চোখে তিন্নির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে মুখে অর্ধেক ঝুলন্ত সন্দেশ থেকে লাল পিঁপড়ে পিলপিল করে ছড়িয়ে পড়ছে। চুমুর আশায় চোখ বন্ধ তিন্নি বিভ্রান্তভাবে ভাবছে চুমুর মদির নেশার বদলে ঠোঁটে গালে এত জ্বালা আসছে কোথা থেকে? তার এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য দুই গালে হালকা চড় মেরে পিঁপড়ে মারতে শুরু করল বিদ্যুৎ। আর তিন্নি চোখ খুলে চুমুর বদলে চড় আর পিঁপড়ের কামড় খেতে খেতে চোখের জলে, নাকের জলে ভাসতে ভাসতে দুদ্দাড় করে নিচে ছুট লাগালো। বাথরুমে গিয়ে

খিল লাগিয়ে জলের ধারা চালিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকল আর জলের ধারার সাথে তার ভালোবাসার ভূত নর্দমায় বয়ে গেল | এরপর বহুদিন তিন্নি আর ভালোবাসার ভূতকে প্রশ্রয় দেয়নি |

তিন্নির ভালো নাম ত্রিনয়নী | পড়াশুনো, একটার পর একটা পরীক্ষা, স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে কলেজ – এখন ত্রিনয়নী খুব সিরিয়াস পড়াশুনো নিয়ে, আর বেশ ভালো রেজাল্টও করে | তবে একটা-আধটা খুচরো প্রেম যে হয়নি তা নয়, কিন্তু সবকটাই অকালে ঝরে পড়েছে, কোনোটাই উল্লেখযোগ্যভাবে প্রস্ফুটিত হয়নি | তবে একটা প্রেম বেশ ভালোভাবে পাকতে শুরু করেছিল | কম্পারেটিভ লিটারেচার ক্লাসের সহপাঠী ধূর্জটি প্রসাদ সিংহ নামটা বেশ গুরুগম্ভীর হলেও ধূর্জটি বেশ নরম স্বভাবের মানুষ | তার গভীর চোখ, মননশীল কথাবার্তা আর সব বিষয়ে একটা স্বাধীন বিশ্লেষণ এবং ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি যখন মৃদুকণ্ঠে প্রকাশ করত তখন তার বক্তব্যের মধ্যে একটা দৃঢ়তা থাকত | ত্রিনয়নীর ভালোবাসার ভূত একটু একটু করে আবার প্রশ্রয় পেতে শুরু করেছিল | রেগুলার ক্লাসের পরে প্রায়ই ধূর্জটির সাথে লাইব্রেরিতে বা কলেজ চত্বরে হাঁটতে হাঁটতে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা চলত | তারপর ধূর্জটি বাসে করে চলে যেত আধা মফস্বল জয়নগরের দিকে, আর তিন্নি দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত পাড়ায় | দুজনের মধ্যে ক্লাস ডিফারেন্স থাকলেও তিন্নি একটু সোশ্যাল এক্সপেরিমেন্ট করতে চেয়েছিল | ভালোবাসা আর ভালোলাগার মানুষের কোনো ক্লাস হয় না | ধূর্জটিকে তার গন্ধ-বর্ণ-স্পর্শ অনুভূতির প্রশ্রয় দেওয়া, ক্লাস ফাঁকা থাকলে কোনো সময় লেকের ধারে হাত ধরে হাঁটা, এমনকি গঙ্গায় ভেসে থাকা নৌকায় ঘন্টা দরে কিছু ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ মুহূর্তও কাটায় | প্রেমটা যখন বেশ মাখো মাখো পরিণতি পেতে চলেছে তখনই একটা অঘটন এরকম একটা পাকা প্রেমকে টুপ্ করে ঝরিয়ে দিল |

ক্লাসে তখন মেয়েদের আত্মনির্ভরতা আর আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছিল | সেই শুনে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিন্নি গোলপার্কের কাছে একটা ক্যারাটে ক্লাসে ভর্তি হয়ে গেল | খুব মনোযোগ দিয়ে শিখতে থাকল সামনে দিয়ে কেউ আক্রমণ করলে কী করতে হবে, পিছন থেকে হঠাৎ কেউ স্পর্শ করলে কী করে পা ঘুরিয়ে লাথি মেরে তাকে কুপোকাত করতে হবে ইত্যাদি | আর দেখতে দেখতে তার কোমরে ক্যারাটের বেল্ট সাদা থেকে সবুজ, নীল হয়ে আরো ঘন রঙের দিকে এগিয়ে চলল | তবে ক্যারাটে ক্লাসের বাইরে তাকে কখনো কসরত দেখাতে হয়নি |

পড়াশুনোর সেশন প্রায় শেষ | শীতকালের হিমেল হাওয়া বইতে শুরু হয়েছে | নিয়ম করে ধূর্জটির সঙ্গে আর দেখা হবে না তাই হাসতে হাসতে তিন্নি বলল, "ধূর্জটি, তুই এতদিন জয়নগর থেকে এসে আমার সাথে প্রেম করলি আর কোনোদিন শীতকালে জয়নগরের বিখ্যাত মোয়া খাওয়ালি না! এটা কি ঠিক হ'ল?" ধূর্জটি অপদস্থ হয়ে হেসে বলল, "ঠিক আছে, তোকে একদিন সারপ্রাইস দেব আমাদের গ্রামের বাড়ির ঘি দিয়ে বানানো আসল মোয়া খাইয়ে |"

শীতকালের ছোট বেলা, তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়ে যায় | রাস্তায় লোকজনও কমে যায় | সেদিন তিন্নি লাইব্রেরিতে অনেকটা সময় কাটিয়ে আধো অন্ধকারে বাস স্ট্যান্ডের দিকে হেঁটে যাচ্ছে একটু যেন অমনোযোগী হয়ে | হঠাৎ তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিতে থাকল কেউ তাকে ফলো করছে | তিন্নি চলার গতি বাড়িয়ে দিল তবুও বুঝতে পারল লোকটি কাছাকাছি চলে আসছে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোয় তার ছায়াও দেখতে পাচ্ছে | তিন্নি তৈরী হয়ে থাকল তার ক্যারাটের খয়েরি বেল্টের প্রয়োগ করবার জন্য | আচমকা ছায়াটা কাছে এসে



তিন্নির চোখ হাত দিয়ে ঢেকে বলল, "Surprise!" আর তৎক্ষণাৎ তিন্নি রিফ্লেক্সে ডান পায়ের উপর ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঁ'পায়ের একটা লাথিতে ছায়ামূর্তিকে ধরাশায়ী করে ফেলল | তারপর ভালো করে তাকিয়ে দেখে এ তো ধূর্জটি!

ধূর্জটি তখন চোখে ধোঁয়া আর হাতে মোয়া নিয়ে চিৎপাত, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে জয়নগরের আসলি মোয়া | এত ফাঁকা রাস্তায়ও ইতিমধ্যে লোক জমতে শুরু করেছে | কেউ কেউ বীরত্ব দেখিয়ে 'বাড়িতে মা বোন নেই' এই cliche ডায়ালগ মেরে হাত-পায়ের সুখ করে নিতে শুরু করেছে | বিপদ দেখে তিন্নি ধূর্জটিকে বাঁচাবার জন্য তারস্বরে চেঁচাতে লাগল, "ভুল হয়ে গেছে, এ কোনো দুষ্কৃতকারী নয়, আমার চেনা বন্ধু |" জনতার ঠিক পছন্দ হ'ল না এই রকম একটা হাতে

গরম কেস হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায়। যাহোক, আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হওয়ার পর ধূর্জটিকে ধরে তুলে দেখা গেল তার একটা চোখে কালশিটে পড়ে আধবোজা হয়ে রয়েছে, আর হাতে তখনও একটা মোয়া ধরা আছে। ক্লাসের শেষ দিনের এরকম একটা সমাপ্তি ধূর্জটি আর তিন্নি কেউই ভাবতে পারেনি। তারা বিমর্ষ মনে যে যার বাড়ির বাস ধরে এগিয়ে গেল।

এরপর তিন্নি পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের জন্য গেল JNUতে ম্যাস্ কমিউনিকেশন পড়তে, আর ধূর্জটি থেকে গেল জয়নগরে একটা স্কুলের শিক্ষক হয়ে। নতুন ইউনিভার্সিটি আর নতুন সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশুনো করতে গিয়ে আর কোনোদিকে মন দেবার সুযোগ পায়নি তিন্নি। আর তার মধ্যে আজন্ম লালিত ভালোবাসার সেই ভূতটাও কেমন মুড়ির মতো মিইয়ে গেল।

লাস্ট সেমেস্টারে কোনো সোশ্যাল বা হিস্টরিক ইভেন্ট কভার করে একটা প্রজেক্ট করতে হয়। একটা সাংবাদিকতা-সুলভ প্রতিবেদন সাবমিট করতে হয় ছবিসহ। এই প্রজেক্টের জন্য দু'মাসের সেমেস্টার break। পড়ার চাপে বহুদিন কলকাতায় যাওয়া হয়নি, তাই তিন্নি রিসার্চ করতে থাকল কলকাতা বা কলকাতার কাছাকাছি কোনো ইভেন্ট কভার করা যায় কিনা। কলকাতার দুর্গাপুজো বহুল চর্চিত আর ইউনেস্কো recognized 'Intangible Cultural Heritage of Humanity', তাই নতুন করে সেই বিষয়ে সেনসেশনাল স্টোরি তৈরী করা মুশকিল। গুগল আর ChatGPT ঘাঁটতে ঘাঁটতে চোখে পড়ে গেল চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো। চন্দননগরের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে পাওয়া গেল অনেক তথ্য।

চন্দননগর (আগে চন্দেরনগর বা চন্দেরনাগোর নামেও পরিচিত ছিল) ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে হুগলি জেলার একটা শহর। এটা চন্দননগর মহকুমার সদর দপ্তর এবং কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, কেএমডি-এ এলাকার অন্তর্ভুক্ত। হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে চন্দননগর শহরটা ছিল ভারতের পাঁচটা ফরাসি উপনিবেশের মধ্যে অন্যতম। এখানকার ঔপনিবেশিক আমলের বাংলোগুলোতে ইন্দো-ফরাসি স্থাপত্য-শৈলীর নিদর্শন পাওয়া যায়, যার অধিকাংশই বর্তমানে জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এখানে যদিও এখনো ফরাসি পূর্বপুরুষের উত্তরসূরি কেউ কেউ বসবাস করে কিন্তু তারা বাঙালি বিয়ে করে বাঙালিই হয়ে গেছে।

নভেম্বর মাসে দীপাবলির দশদিন পর, চন্দননগর শহর এবং এর পার্শ্ববর্তী ভদ্রেশ্বর ও মানকুন্ডু এলাকায় জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার প্রতিমা কলকাতার দুর্গাপূজার প্রতিমার তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি উঁচু হয়ে থাকে। পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত পুরো এলাকাটি চন্দননগরের স্থানীয় নির্মাতাদের তৈরি আলোকসজ্জায় ঝলমল করে ওঠে। দশমীর রাত থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত প্রধান পূজা কমিটিগুলো তাদের থিম-ভিত্তিক প্রতিমা নিয়ে এক বিশাল শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। রিও-র সাম্বা উৎসবের পরেই এটি বিশ্বের বৃহত্তম শোভাযাত্রা হিসেবে বিবেচিত। এখানকার প্রাচীনতম পূজাগুলোর মধ্যে কোনোটি ৩০০ বছরেরও বেশি (যেমন, আদি মা) আবার কোনোটি ১৫০ বছরের পুরোনো।



তিন্নি মনস্থির করে ফেলল 'This is it. চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোই হবে আমার প্রজেক্টের সাবজেক্ট।' পরদিনই রাজধানী এক্সপ্রেসে ফিরে এল কলকাতায়। কলকাতা থেকে চন্দননগর লোকাল ট্রেনে ৪০/৫০ মিনিটের রাস্তা। চারদিনের পুজো – ষষ্ঠীতে বোধন, সপ্তমী, অষ্টমীতে মূল পুজো। তিন্নি রোজ সকালে বেরিয়ে সারাদিন, সারা সন্ধ্যা পুজো আর চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা দেখে আর অসংখ্য ছবি ক্যামেরাবন্দি করে কলকাতায় ফেরে শেষ ট্রেনে। দেখতে দেখতে নবমী এসে গেল জগদ্ধাত্রী পুজোতে বিসর্জন হয় নবমীতেই। সেদিন একটু বেলার দিকে কাজের সুবিধার জন্য তিন্নি একটা tight জিন্স, পায়ে sneakers, চারিদিকে পকেটওয়ালা জ্যাকেট পরে, কাঁধে নিক্কন ক্যামেরা আর টেলিলেন্স ঝুলিয়ে ভীড় ঠেলে উঠে পড়ল লোকাল ট্রেনে।

বিকেলে স্টেশনে পৌঁছে দেখে লোকে লোকারণ্য। বিসর্জন আর আলোকসজ্জা দেখতে দলে দলে আবাল বৃদ্ধ

বণিতার ভীড়। কোনোরকমে ভীড় ঠেলতে ঠেলতে যখন রানী ঘাটে পৌঁছাল তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু এক একটি প্রতিমা আসছে বিসর্জনের জন্য। ভীড় সামলানোর জন্য বাঁশের বেড়া প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম। তখন রাত প্রায় ৯টা। তিন্নি ছবি তোলার নেশায় বাঁশের বেড়ার তলা দিয়ে গলে গিয়ে ঘাটের পিছল কাদামাটি পেরিয়ে এগিয়ে চলল বিসর্জনের close up অ্যাকশন আর মায়ের ডুবতে থাকা মুখের ড্রামাটিক ভিডিও তুলবে বলে।

হঠাৎ পা পিছলে কাদা মাখামাখি, কোনরকমে ক্যামেরা আকাশের দিকে তুলে চিৎকার করে উঠল 'হেল্প হেল্প,' কিন্তু জগদ্ধাত্রী মায়ের জয় জয়কার আর ঢাকের বাদ্দি পেরিয়ে সে চিৎকার কারো কানে ঢুকছে না আর তিন্নি কাদামাখা চিৎ হওয়া কচ্ছপের মতো হাত পা নাড়াতে নাড়াতে জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে তিন্নির চোখ বন্ধ, অবশ্যাম্ভাবী গঙ্গা প্রাপ্তির অপেক্ষা, সেই সময় একটা বলিষ্ঠ হাত তার ঊর্ধ্বমুখী ক্যামেরাসহ ডান হাতের কব্জিটা ধরে ফেলল। এখনো সলিল সমাধি হয়নি বুঝে মিটিমিটি চোখ খুলে তিন্নি দেখে তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে সুঠাম সুদর্শন বাবরি চুলের এক যুবক। যুবকটি সাবধানে তিন্নিকে টেনে তুলে দাঁড় করাতেই আবার সে পা পিছলে আছড়ে পড়ল পরিত্রাতার গায়ে আর তাকেও জলকাদা মাখিয়ে একাকার। যাইহোক, ধীর পদক্ষেপে কাদা পেরিয়ে, ভীড় এড়িয়ে যখন তারা পাকা রাস্তায় পৌঁছাল, যুবকটি মিষ্টি হেসে বলল, "আমার নাম রাফায়েল। আমি দেখছিলাম ছবি তোলার নেশায় বুঁদ হয়ে কী করে তোমার পদস্খলন হ'ল। দেখে আমি হেসেই ফেলেছিলাম, তবে আমি এগিয়ে যেতে আরেকটু দেরি করলে সত্যিই মহা বিপদ হয়ে যেত। আমার বাড়ি কাছেই, বাড়িতে মা বাবা আছেন। তুমি চাইলে একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে নিতে পারো।"

তিন্নি আপদমস্তক কাদা মেখে ফিরতে পারবে না, এদিকে রাতও অনেক হয়েছে, তাই রাজি হয়ে গেল রাফায়েলের বাড়িতে যেতে। যাওয়ার পথে তিন্নি নিজের পরিচয় দিল আর কৌতূহল-বশত রাস্তার আলোতে রাফায়েলের নীল চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার এমন অবাঙালি নাম কেন?"

সে হেসে বলল, "আমার পূর্বপুরুষরা ফরাসি, তবে মা বাঙালি তাই বোধহয় বাবা মা এমন নাম রেখেছেন। কেন, তোমার পছন্দ নয় নামটা?"

- "তা কেন হবে? বেশ তো নামটা।"

বাড়িটা রানীঘাট থেকে খুব একটা দূর নয়, একটা বিশাল পুরোনো বাংলো। বাইরে থেকে একটু ভাঙাচোরা দেয়াল আর খিলান হলেও একটা আভিজাত্য আছে। সদর দরজায় কড়া নাড়তে রাফায়েলের মা এসে দরজা খুলে ছেলের সাথে এমন একটা কিম্ভুত কিমাকার চলমান কাদার তাল দেখে আঁতকে উঠলেন।

রাফায়েল তার মাকে বলে, "দরজা আটকে না থেকে আমাদের ঢুকতে দাও, তারপর সব বলছি।"

দালানে একটা চেয়ারে বসিয়ে তাদের ইতিবৃত্ত শুনে মুখ চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে তার মা তিন্নিকে নিয়ে চললেন বাইরের বাথরুমে। সেখানে তাকে তোয়ালে, সাবান, শুকনো কাপড় দিয়ে বললেন, "পরিষ্কার হয়ে এই কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে চলে এসো। এত রাত্রে তুমি আর ফিরতে পারবে না। আজ রাতটা এখানেই, আমাদের উপরের ঘরে থেকে যাও। কাল সকালে তোমার কাপড় শুকোলে বাড়ি যেয়ো। রাফায়েলও বেরিয়ে যাবে ওর নাইট ডিউটিতে। ও পুজোর ক'দিন রাত্রে পাড়ায় ভলান্টিয়ার ডিউটি করে, এই ভীড়ে লোকজন বিপদে পড়লে সাহায্য করার জন্য।"

তিন্নির আর কোনো উপায়ন্তর নেই, তাই রাজি হয়ে গেল। মনে মনে তার বেশ মজাও লাগছিল, এটা যেন একটা গল্পের প্লট। তার লেখায় এই অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই উঠে আসবে।

সামান্য কিছু খাবার ব্যবস্থা করে দিলেন মমতাময়ী মা। খাবার পর সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে গিয়ে চোখে পড়ল ভিতরের ঘরে একজন সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ স্থানু হয়ে বসে আছেন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে। আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে মা বললেন, "উনি রাফায়েলের বাবা। আমাদের পরিবারে একটা দুর্ঘটনার পর থেকে তাঁর বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। চলো, তোমাকে শোবার ঘর দেখিয়ে দিই।"

আলো আঁধারি দোতলায় লম্বা বারান্দার শেষে একটা ঘর। দরজা খুলতে তিন্নি দেখে সুন্দর সাজানো গোছানো একটা বিশাল ঘর, মাঝে পুরোনো স্টাইলের পালঙ্ক, তাতে ঝুলছে ফিনফিনে মশারি। তবে ঘরে আলো একটু কম, একটা টিমটিমে নাইট ল্যাম্প জ্বলছে মাত্র। তবে ঘুমানোর জন্য যথেষ্ট। মা

বারান্দার অন্যপ্রান্তে বাথরুম দেখিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। যাওয়ার সময় তিন্নির মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, "তোমাকে আমাদের বেশ পছন্দ হয়েছে।"

দরজার ছিটকিনি তুলে মশারির মধ্যে ঢুকে সারাদিনের ধকল আর পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ভাবতে ভাবতে তিন্নির ঘুম এসে গেল সহজেই। কিছুক্ষণ পর ঘুমটা একটু পাতলা হতে মনে হ'ল কেউ একজন মশারির বাইরে থেকে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। আধো আধো চোখ খুলে দেখে রাফায়েলের বা ওর বাবার মতোই দেখতে সুদর্শন নীল চোখ লম্বা চুল স্বপ্নের রাজকুমারের মতো এই পুরুষ মায়াভরা চোখে তাকিয়ে আছে।

সেই পুরুষ খুব মৃদুস্বরে বলল, "আমি অলিভিয়ের তিন্নি, আমাকে তুমি গ্রহণ করবে? আমি বহুদিন অপেক্ষা করছি তোমার জন্য।"

অদ্ভুতভাবে তিন্নির কোনো ভয় লাগল না, তার মনে হ'ল অলিভিয়েরকে অনেকদিন থেকে চেনে। এই তার ভালোবাসা যা সে ছোটবেলা থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সম্মোহিত অবস্থায় তিন্নির শরীর জেগে উঠল। দুহাত বাড়িয়ে সে অলিভিয়েরকে



বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর রাত'ভর শরীরী মত্ততা আর রাগ মোচনের পর ক্লান্ত হয়ে আবার গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

সকালের আলো জানলা পেরিয়ে তিন্নির মুখে পড়তেই ধড়মড় করে উঠে বসল তিন্নি। শরীরে তখনও একটা আদুরে আবেশ। মশারি সরিয়ে বিছানা থেকে নামতেই চোখ চলে গেল সামনের দেয়ালে। তিন্নির পা কেঁপে উঠল। দেয়ালে বেশ বড় একটা ছবি অলিভিয়েরের, তাতে মালা দেওয়া, সেই নীল চোখের সম্মোহনী দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। পড়িমরি করে নিজের শুকিয়ে যাওয়া কাপড় জামা পরে, ক্যামেরাটা বগলদাবা করে দরজার ছিটকিনি খুলতেই দেখে দাঁড়িয়ে আছেন রাফায়েলের মা। মুখে একটা পরিতৃপ্তির হাসি আর জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টি যেন প্রশ্ন করছেন অলিভিয়ের এসেছিল কাল রাতে? মুখে বললেন, "এসো তোমাকে এগিয়ে দিই।" সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগলেন, "ও আমার বড় ভালোবাসার ছেলে। এক বাঙালি মেয়ের প্রেমে পাগল হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটি তাকে ধোঁকা দিয়ে চলে গেল আর অলিভিয়ের সেই দুঃখে সুইসাইড করল ওই ঘরে দরজা বন্ধ করে, বিষ খেয়ে। সেই শোকে ওর বাবা বাকরুদ্ধ হয়ে মূর্তির মতো বসে থাকেন, আর আমি রোজ ওর ঘর পরিষ্কার করি, মালা দিই। আমি জানি ও আমাদের ছেড়ে কোথাও যায়নি। তুমি এসো মা। তোমাকে আমাদের সবার খুব ভালো লেগেছে।"

তিন্নি হনহন করে চন্দননগর স্টেশনের দিকে এগিয়ে গিয়ে কলকাতার লোকালে চড়ে বসল। খোলা জানলার হাওয়া চুল উড়িয়ে দিচ্ছে আর তিন্নির যেন সারাটা জীবনের ভালোবাসার ভূতগুলো হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। চোখটা একটু লেগে এসেছিল ঠান্ডা হাওয়াতে।

তিন্নি মুখে একচিলতে হাসি নিয়ে যেন মনে মনে ভাবছে ভূতের ভালোবাসাটা কিন্তু মন্দ ছিল না!



উড়িয়ে দেবার লাগল নেশা

বলাকা ঘোষাল

পাহাড়ের গায়ে একটা পাথর আলগা হলেও তাকে নাড়ানো অত সোজা নয়। কিন্তু একবার যদি কোনভাবে গড়াতে শুরু করে, তাহলে আর দেখতে হয় না। নিমেষে বেগ বেড়ে গিয়ে প্রচন্ড গতি পেয়ে যায়। ওই শুরুটাই যা একটু কঠিন। প্রথমে অসম্ভব মনে হতে থাকে। কিন্তু ওই অবধিই। জীবনের অনেক কাজও আমার ঠিক সেরকমই, শুরু করতে গায়ে জ্বর। অথচ 'মাভৈ' বলে একটু শুরু করে দিলেই হ'ল। এই মুহূর্তে ঠিক সেই পর্বের মধ্যে দিয়েই চলেছি।

এদেশে এসেছিলাম মাথাপ্রতি দুটো স্যুটকেস নিয়ে। এখন আমাদের বাড়িতে জিনিসের বহর দেখলে সেটা বিশ্বাস করা খুব কঠিন। সব জড়ো করলে একটা পাহাড় তো হবেই। টুকটাক করে সংসার গড়তে শুরু হ'ল নতুন দেশে। যা দেখি তাই ভালো লাগে। ছেলে বড় হওয়ার প্রয়োজনের সাথে সাথে জিনিস ক্রমশ বাড়তে থাকল। থাকবার জায়গাও আয়তনে বাড়তে লাগল। প্রথমে ছোট অ্যাপার্টমেন্ট, তারপর আর একটু বড়। তারপরে বাড়ি।

অথচ আমি জিনিসপত্র গোছাতে গিয়ে হিমসিম। এদেশে ঘরের যে রানী, সেই বাঁদি, তা অক্ষরে অক্ষরে জানা থাকলেও টের পেলাম ঠেকে। তবে গুছিয়ে রাখবার জন্য এই দেশে কিছু ব্যবস্থা আছে বটে। তারিফ না করে পারা যায় না। অরগানাইজ করবার নামে নানান ব্যাসের বাক্স, ফাইল, আর লেবেল যখন স্টাডির তাক ছাপিয়ে যায়, তাদের লুকিয়ে রাখা হয় খাটের তলায়, ঘরের কোণে, এমনকি অ্যাটিকেও। তাতেও না কুলোলে নানা মাপের ভাড়া করা স্টোরেজ পাওয়া যায়। বছর বছর জিনিস বাদ দিয়েও অন্ত পাওয়া যায় না।

এখন প্রায় রিটায়ার করার মুখে, অতএব গুটিয়ে নেবার হাওয়া এসেছে জীবনে। রবীন্দ্রনাথের গান, "কুড়িয়ে নেবার ঘুচল পেশা, / উড়িয়ে দেবার লাগল নেশা – / আরাম বলে, এল আমার যাবার পালা" এখন আমার মন্ত্র। আরাম সম্বন্ধে অনেক তাত্ত্বিক কথা আছে কেন আরাম হারাম হ্যায় ইত্যাদি। সে প্রসঙ্গ আপাতত মুলতুবি থাক। কিন্তু এখন উড়িয়ে দিতে গিয়ে নিজেই উড়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। আর চব্বিশ ঘন্টা কোথা দিয়ে যে উড়ে যাচ্ছে সেটা টের পাচ্ছি না। দিনে পঞ্চাশবার দোতলা একতলা করতে করতে মেদের নিশ্চয়ই কিছুটা উড়ছে। তাতে আমি খুশি। আর যেটা উড়ছে সেটা হচ্ছে চুল – উস্কোখুস্কো বিভ্রান্তের মতন।

ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি। বিগত কয়েক বছর ধরে ছেলে বলে চলছে যে আমাদের বুড়ো হবার আগেই ছোট একটা বাড়িতে উঠে গেলে কষ্ট কম হবে। অতএব জিনিসপত্র একটু কমালে ভালো। খুব ভালো প্রস্তাব। কোভিড আমল থেকেই রোজ একটা করে জিনিস বাদ দিয়ে চলেছি। ভেবেছিলাম এই রোগে হয়তো শরীরটাই ছাড়তে হবে, তাই অন্তত মায়া ত্যাগ করবার একটা প্রচেষ্টা শুরু করা খারাপ নয়। সেফ্টিপিন থেকে দশাসই ডিক্সনারি, রোজ অন্তত একটা কিছু বাদ দিলেই খানিকটা কাজ হয়। তার জন্য ডজন খানেক ঝোলা আর বাক্সে নানারকম লেবেল লাগিয়ে কোনটা ডোনেশন, কোনটা ফেলে দেওয়ার, কোনটা এক বন্ধু খুব পছন্দ করবে তাকে দেওয়া, ইত্যাদি চলতে লাগল। কখনো কখনো একদিনে দশটা জিনিসও বেরিয়েছে, সে যত ছোটই হোক না কেন। কখনো শুতে যাওয়ার আগে মনে পড়ত, আরে আজ তো কিছু বাদ দেওয়া হ'ল না। যাই দেখি কী পাই। এঘর ওঘর ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চোখে পড়ে যেত কিছু একটা, যেটা ছাড়া আমাদের জীবন দিব্যি চলবে। অমনি সেটাকে তুলে এনে লেবেল লাগানো একটা বাক্সে দিতাম নিক্ষেপ করে। যেদিন পাঁচ-দশটা জিনিস বার করতাম, বেশ খুশি খুশি লাগত।

কিন্তু বললে কী হবে, সেসব হ'ল পাহাড়ের গায়ে ছোট এককুচি নুড়ির মতন। ওই দুটো স্যুটকেস জিনিস থেকে এখন দোতলা বাড়ি ঠাশা। যেমন তিলে তিলে জিনিস বেড়েছে, তেমনই চলল তিলে তিলে কমানো। এমনিতে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু যখন ছেলে বাড়িতে আসে, তখন ওর চোখে দেখি তারিফের দৃষ্টি। বলে, "বাড়ি বেশ হালকা লাগছে।"

ওই নুড়ি এখন প্রকান্ড চাঁইয়ের আকার নিয়েছে। তাকে গড়ানো দায়। কিন্তু হাতে ঠেলে যা হয় না, এক ঝড়ে দিব্যি তা হয়; তাই একটা আপদের আগমন দরকার ছিল। হ'লও তাই। আমাদের বাড়িতে বহুবার জলের লিক হয়েছে; তার ফলে হয় মেঝে, নয় দেয়ালের অংশ বদলাতে হয়েছে। টাকার

অঙ্কের কথা নাই বা তুললাম। ভাবলাম যেমন আটঘাট বেঁধে সব মেরামত করা হয়েছে আর বুঝি লিক হবে না। কিন্তু কপালে যা আছে, তা লঙ্ঘাবে কে? ছাদের এসি থেকে জল পড়ে বেশ ভালই ক্ষতির রেখা টেনে গেছে গোপনে। অতএব আবার হৈচৈ, ইনসিওরেন্সের দ্বারস্থ হওয়া, নানাদফা ইন্সপেকশন, মেরামতের জন্য উপযুক্ত লোকের খোঁজ। আর অবশেষে গোটা দোতলার কার্পেট এবং নিচে কাঠের মেঝের প্রায় পুরোটাই বদলানো। মনে হচ্ছিল এ আপদ কেন হ'ল। কিন্তু পিছন দিকে তাকিয়ে এখন মনে হচ্ছে ভাগ্যিস এটা হ'ল, নইলে আমাদের এই আমূল পরিবর্তন আর হতো না। বুড়ো বয়সে বাড়ি বদলাতে কুপোকাৎ হয়ে যেতাম। অর্থাৎ এক্কেবারে শাপে বর।

যা দাঁড়ালো, তা হ'ল এই – আসবাব, বইপত্র, ফাইল, টুকিটাকি ইত্যাদি সব সরিয়ে রাখতে হবে বাথরুমে, রান্নাঘরে, আর শোবার ঘরে। একফালি জায়গা যা থাকবে, কোনরকমে তাতেই কাজ চালাতে হবে তিনদিন। পছন্দ না হয়, হোটেলে গিয়ে থাকতে পারি। কাজের টীম কেবল আসবাব সরাবে, বই আর যাবতীয় আমাদের নিজের দায়িত্ব। বোঝো কান্ড!

বই-ই আছে প্রায় হাজারের উপর। ধীরে ধীরে এত বই যে এসে ঢুকেছে, সেটা টের পেয়েছিলাম কয়েক বছর আগে। ছেলে কলেজে যাওয়ার পরে অনেক বই বাদ দিতে হবে মনস্থ করে আমি ক্রিসমাসে বানিয়ে ফেললাম আমার থেকেও উঁচু একটা বইয়ের ক্রিস্টমাস ট্রি। বড় বই দিয়ে বেস্ তৈরি করে তার উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বই রেখে দিব্যি হয়েছিল বইয়ের গাছটি। নতুন বছরে সেটা ভাঙবার সময় উপর থেকে ছোট বইগুলো যখন নামছে তখনই আমি বাছাবাছি শুরু করে দিলাম কোনটা রাখব কোনটা ফেলব। যদি গত দশ বছরে পাতা না উল্টিয়ে থাকি বা একবার পড়া হয়ে গেছে, তাদের শ্রদ্ধার সাথে বিদায় জানানো হয়েছে। তবু এখনও এক পাহাড়।

আমাদের দেশে দুর্গাপুজো বা যে কোনো বড় উৎসবের আগে বাড়ি পরিষ্কারের রেওয়াজ ছিল। সেটা হয়তো মানুষ আজকাল ভুলেই গেছে। স্পষ্ট মনে আছে দোল আর দুর্গাপুজোর আগে মা বাড়ি পরিষ্কার করতেন, সবকিছু সরিয়ে সরিয়ে। তখন অনেক হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে পেতাম আমরা। আমারও ঠিক তাই হচ্ছে – অনেক খুঁজেও যা পাইনি বহুকাল, এখন তা অনায়াসে ধরা দিচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল যে আমাদের এত শত বই যাবে কোথায়? আর লেখালেখির যে কত কাগজ, ম্যাগাজিন, চিরকুটে হাতে-লেখা খসড়া, নোটখাতা, কনফারেন্সের কত নোটস, ড্রাফট লেখা, তা কেবল অন্য লেখকরাই হয়তো বুঝবে। সেগুলো যাবে কোথায়? আর এই ক্যাসেট-সিডি-ডিভিডির বোঝা, যা এককালে আমার প্রাণের বস্তু ছিল! কিন্তু কতই বা রাখব, আর কোথায়ই বা রাখব! ভাবি, আমি যদি এতকিছু এখানে সেখানে গুঁজে রেখে হঠাৎ পটল তুলি, তবে বেচারা বাড়ির মানুষদের চোখের জলের সাথে নাকের জল মিলেমিশে একাকার হবে।

অতএব গোছানো শুরু স্টাডিরুম দিয়ে। বার করে ফেললাম সব ফাইল আর বই। খালি হয়ে গেল বিভিন্ন স্টাইলের ডেস্কের ড্রয়ার আর আলমারি। এসব বিক্রি করতে গেলে ফেসবুক মার্কেটপ্লেস, নেবারহুড অ্যাপ্ – সে অনেক হ্যাপা। দূর, ওসবে কাজ নেই! স্বামী-স্ত্রীর কোনও বিষয়ে একমত হওয়া বেশ বিরল ব্যাপার। হঠাৎ কীভাবে জানি না, দৈব কৃপাই বলতে হবে, দুজনেই একমত হয়ে গেলাম। এই স্টাডির অর্নেট ফার্নিচার দান করে দেওয়াই হ'ল সবচেয়ে তাড়াতাড়ি খদ্দের পাওয়ার পথ। যে নেবে সে নিজে ব্যবস্থা করুক নিয়ে যাওয়ার। ব্যস, যেই না বলেছি আমার বাড়িতে যে মেয়েটি পরিষ্কার করতে আসে, মণিকা, সে রাজী হয়ে গেল। মণিকা খুব প্রশংসা করত এসব ফার্নিচারের। ও স্বপ্নেও ভাবেনি ভবিষ্যতে এগুলো ওর বাড়িতে শোভা পাবে। খুব আনন্দ পেয়েছি ওকে দিতে পেরে।

এখন সেই বাতিল কাগজের পাহাড় ছেঁড়ার পালা চলেছে। কাজ অনেকটা এগোনোর পর মনে হ'ল আমি যেন একটা উপত্যকার মধ্যে বসে ছিঁড়ে চলেছি। একপাশে ছেঁড়া কাগজের পাহাড়, অন্যদিকে যা এখনও বাছা বাকি। প্রয়োজনীয় কাগজ সামান্যই। ছেঁড়াগুলো সব যাবে আমাদের বাগানের রেইজড-বেড-এ। কাগজ নিমেষে রোদে-জলে, ধুয়ে মাটি তৈরী হয়ে যায়। বাড়ি খালির সাথে সাথে বাগানের সমৃদ্ধির যৌথ প্রকল্প ভালোই চলছে। পৃথিবীর তাতে কোন ক্ষতি হবে না ভেবে শান্তি পাচ্ছি। মহানন্দে চলেছে সেই কাজ। পাগলের মতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যদিও। মাঝেমধ্যে ওই উপত্যকা ডিঙিয়ে কোনভাবে নাওয়া-খাওয়া হচ্ছে। দুতলার সব বইয়ের আলমারিগুলো এখন চলে এসেছে নিচের স্টাডিতে। তারা স্টাডির নতুন সজ্জা। দোতলার ঘরগুলো হয় ফাঁকা ইয়োগা রুম বা এয়ারবিএনবি-

মার্কা গোছানো | তাতে শুধু স্বাস্থ্যের বইগুলো শোভা পাচ্ছে | গেস্টরুমেও রাখা ছিল অনেক বই, সেগুলো সব চলে এসেছে নিচে, কিন্তু ভাবছি ওইখানে একটা ছোট্ট বইয়ের আলমারি থাকলে মন্দ হয় না | আমার মতো রাতজাগা-পেঁচা অতিথিরা ঘুম না এলে নানা রসের কিছু বই পড়তে পারবে |

কাগজের পাহাড় দেখে চমকাচ্ছি বটে, হয়তো মারফি সাহেবের নিয়ম অনুযায়ী ফেলে দেওয়া মাত্রই তার প্রয়োজন বোধ করব | কিন্তু কবে সেটা হতে পারে ভেবে এই গন্ধমাদন পর্বত বাড়ির ভিতর রাখতে রাজি নই | সমস্যা হ'ল মিনিমাল হতে গেলে মিনিমালিজিমের বইগুলোও তো ত্যাগ করতে হবে! সেখানে বাদ সাধছে মায়া | নামিয়ে রেখেও তুলে নিচ্ছি | দ্বিতীয় নেশার জায়গা হ'ল পরিবেশ দূষণ থেকে পৃথিবীকে বাঁচানোর নানা রসের বই | এরা আমার প্রাণই বলা যায় | ভাবলাম পৃথিবীকে ভালোবাসা আমার বাড়বে বৈ কমবে না | বইগুলো বাড়িতে থাক বা না থাক পৃথিবীকে সম্মান করেই চলব | এই আশ্বাসটা যখন নিজেকে দিতে পারলাম তখনি এগুলো বিলিয়ে দেওয়ার সাহস হ'ল | অন্য কেউ পড়ে হয়তো যুগান্তকারী কাজ করে ফেলতে পারবে | আর তিন নম্বর নেশা হ'ল লেখালেখি কীভাবে করতে হয় তার ওপরে বই | এসব পড়ে আমার বহু বই লিখে ফেলা উচিত ছিল | তাই ভাবলাম এগুলো অন্য লেখকদের হাতেই যাক, তারাই লিখুক বেস্টসেলার | লেখক-বন্ধু-মহলে পেয়ে গেলাম একজনকে, যে এসব নিতে রাজি | যত নোটবই-পেন-পেন্সিল-ফোল্ডার সব যাচ্ছে মণিকার মেয়েদের কাছে | তিন চার মাস সময় হয়তো লেগেই যাবে এই দিয়ে দেওয়ার কাজ শেষ করতে | বইগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে, পাতা উল্টিয়ে চোখ বুলিয়ে বুকের কাছে ধরছি ঠিক যেন নিজের শিশুকে আদর করছি | সন্তানকে বড় করবার সামর্থ্য বা সঙ্গতি নেই বলে যে মাকে দত্তক দিতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে আমি এই বইগুলোকে দিয়ে দিতে শুরু করেছি ওরা ভালো পাঠকের সঙ্গ পাবে বলে |

এই উড়িয়ে দেওয়ার মজা হ'ল – শুরু হয় ইতস্তত দিয়ে | আসক্তি ছাড়তে মন চায় না, তুলে নিয়ে আবার রেখে দিই | কিন্তু যেই একটু একটু করে শুরু হয় বাঁধ ভাঙার আগে সামান্য এক ফাটল, সেই ফাটল আরেকটু বেশি চওড়া হতে হতে একদিন বাঁধ পুরো ভেঙে জলের প্রচন্ড প্রবাহ বেরিয়ে পড়ে | আমারও প্রথমে ইতস্তত ও আসক্তির টান ছিল, তারপরে যেই দিতে শুরু করলাম অমনি দেখি ঘন্টায় ঘন্টায় জিনিস বার করে রাখছি দিয়ে দেবার জন্য | যে জিনিস ছাড়া আমি কোনোদিন থাকতে পারব না ভেবেছিলাম, এখন নিজেই মহা আনন্দে, পরম তৃপ্তিতে দিয়ে চলেছি | জ্ঞান বাড়াবার চেষ্টা ছেড়ে যেন বেঁচেছি |

আরেক দিনের কথা মনে পড়ছে | 2010 হবে | গ্রীন কার্ড সবে হয়েছে | তার মানে আমেরিকা আমাদের পত্রপাঠ ফিরিয়ে দেওয়ার বিশেষ সুযোগ পাবে না | তাই ভাবলাম দেশের ছোট ফ্ল্যাটটা তাহলে খালি করে বিক্রি করা যাক | বিক্রির প্রস্তুতি হিসেবে গেলাম খালি করতে | সংসারের নানা জিনিস তখনও ওখানে ঠাসা | আমরা অনেকটাই নিয়ে এসেছি ঠিকই | কিন্তু সিংহভাগ তখনো দেশেই | দেশে ঘর খালি করা খুব সহজ ব্যাপার | একজনকে বলে দিলাম, "ভাই, আমি শুধু আজকের দিনটার জন্য এখানে এসেছি, খবর রাষ্ট্র করে দাও | এবাড়ির যাবতীয় জিনিস খালি করতে হবে আজই |" ব্যস্! পঙ্গপালের মতো কাজের মেয়েরা আসতে লাগল | আমি ততক্ষণে ঘুরে দেখে নিয়েছি আলমারিতে ঠাসা কত শখের জিনিস, যা কিনেছিলাম দীর্ঘ দশ বছর ধরে বিয়ের পরে | দু'চারটে জিনিস হয়তো স্যুটকেসে এঁটে যাবে কিন্তু বাকি সব মায়া ত্যাগ করার সময় এসেছে | ভালো ডাইনিং সেট, ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, বইয়ের তাক, আলমারি, স্টিলের ট্রাঙ্ক, বড় রাইটিং ডেস্ক – সবটা বিদায় দিতে হবে | বন্ধুরাও এসে গেল বইয়ের কালেকশন নিতে | সঙ্গে পেল বইয়ের তাকও | তাদের আনন্দের সাথে নিয়ে যাওয়াটাও আমার বিরাট পাওয়া | যেসব জিনিস কাউকে দেওয়ার মতো অবস্থাতে আর নেই সেসব আবর্জনা নিয়ে যেতে কাবাড়িওয়ালা এসে গেল |

সেবারও কত জিনিস হাতে নিয়ে মনে হয়েছে এটা কি দিয়ে দিতে পারব? কিন্তু সবার তৃপ্তি দেখে মনে হ'ল ভাগ্যিস আমার সাহস হয়েছিল! প্রথমে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল সেটা হাট ভাঙার মতো নিমেষে উধাও হয়ে গেল | ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, চেয়ার, ডিভান কতকিছু চলে যেতে লাগল | কত গরিব মানুষের বাড়ি সেজে উঠল এইসব জিনিসে | ঝামেলা একটাই ছিল, গেট দিয়ে যখন কাজের মেয়েরা এসব জিনিস নিয়ে বেরোয় তাদের এমনি যেতে দেওয়া হয় না |

চৌকিদার আটকে দেয়। তারা যে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে না, তার প্রমাণ হিসেবে যেগুলো আমি দান করে দিচ্ছি, সেসব জিনিসের ফর্দ বানিয়ে আমাকে সই করতে হয়েছিল, অতএব এদের যেতে দেওয়া হোক। কাজটা মোটেই সহজ নয়। এই দলিলের নাম হিন্দিতে 'পর্চি'। সকাল থেকে শুরু হ'ল পর্চি লেখা, চলল সারাদিন। সন্ধ্যেবেলা এক বন্ধুর বাড়িতে খেতে যাব; সে যখন এসেছে আমাকে নিতে, তখনও পর্চি লেখা চলছে শেষ কয়েকটা জিনিসের জন্য। মাটিতে বসে ক্লান্তিকর পর্চিগুলো লিখছি আর বন্ধু হাসছে। বলছে, "এ তো মৃত্যুর জন্য দারুণ প্র্যাক্টিস হচ্ছে। সবকিছু ত্যাগ করে, এমনকি শরীরটাও ছেড়ে চলে যেতে হবে এক লহমায়। আজ তুমি সারাদিনে পুরো বাড়িটা খালি করে অনেক মায়া ত্যাগ করলে বটে।"
বললাম, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। একদিনেই অনেক মায়া কাটল। তবে পর্চি লিখতে লিখতে আমার আঙুল আর পেন দুই-ই খুব মুষড়ে পড়েছে। আমি যখন মরব, অন্তত নিজের জন্য আর পর্চি লিখতে হবে না। ওটা ডাক্তারবাবু লিখবেন, এই বাঁচোয়া।"
সেই পর্চির নাম ডেথ সার্টিফিকেট।

দেশের জিনিসের মায়া ত্যাগ করলেও আমেরিকায় মায়া জমেছে ক্রমে ক্রমে। আর এই আলোড়নকারী বাড়ি হালকা করবার পরে এখনও চলেছে দিয়ে দেওয়া আর ফেলার পর্ব। আবার সেই আগের মতন ধীমে তালে, তিলে তিলে। পাহাড়ে ধস নামার পরেও সেই ঢালপথে ছোট বড় নানা মাপের নুড়ি সমানে নামতেই থাকে। আমাদেরও সেরকম দেওয়া আর ফেলার পর্ব চলতেই থাকছে। আমেরিকায় পর্চি লিখতে হয় না এই যা রক্ষে!

কিন্তু এরই অবসরে শরতের আগমনী গানের সাথে আমাদের জিনিসপত্রের গমন এক অপূর্ব সুর তুলেছে। রবি ঠাকুরের সেই গানটাই মনে বাজছে সারাদিন –

"উড়িয়ে দেবার লাগল নেশা,
আরাম বলে, এল আমার যাবার পালা..."



শাশুড়ির ছেলেকে সামলানো

রবি দে

এই গল্পের কোনো চরিত্রই কাল্পনিক নয়। কাহিনীর মুখ্য চরিত্র প্রবাস বন্ধু পত্রিকার সম্পাদিকা, আমাদের সবার পরিচিত মালাদি এবং তাঁর প্রিয়তম স্বামী দিলীপদা – ওরফে 'দিলীপচ্যা'; যে নামে মালাদি তাঁর শাশুড়ির ছেলেকে গোড়া থেকেই সম্বোধন করে এসেছেন। মালাদি তখন বালিকা বধূ। বয়সে কিছুটা বড়, বিলেত-ফেরৎ কৃতি স্বামী-দেবতা দিলীপ চ্যাটার্জীকে নাম ধরে ডাকাটা তাঁর কাছে সমীচীন বোধ হয়নি – অন্তত প্রথম দিকে। তাই এই মধুর সম্বোধনের উৎপত্তি।

গল্পের শুরু বহুকাল আগে। শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা শেষ করার আগেই বিয়ে হয়েছিল মালাদির। দিলীপদা তখন থাকেন হায়দ্রাবাদে। সংসারের ভার সাই-আম্মার হাতে। দিলীপদা তেলুগু জানেন না, রান্নাবান্না তো নয়ই। কাজেই বাজার, খাওয়াদাওয়া এবং সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব তখন সাই-আম্মারই হাতে।

এবার পড়াশোনার পাট চুকিয়ে মালাদি এলেন দুরুদুরু বক্ষে স্বামীগৃহে সংসারের হাল ধরতে। সারা জীবন হস্টেলে বড় হওয়া – সংসার চালানোর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাটুকু পর্যন্ত নেই।
একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দিলীপদা দেখেন, মালাদির কোন পাত্তা নেই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর চোখে পড়ল – ঘরের এক কোণে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন সদ্য স্বামীগৃহে আগত পরম আদরণীয় নববধূ, আমাদের মালাদি।
হয়েছিলটা কী?
মালাদি সেদিন কী অপরাধ করেছিলেন, বা গৃহপরিচারিকার কোন অপ্রিয় কাজ করেছিলেন, আমার ঠিক জানা নেই – বা মনে নেই। তবে দিলীপদার জেরায় মালাদি অবশেষে কবুল করেন, সাই-আম্মার কাছে তেলুগু ভাষায় জোর বকা খেয়েছিলেন! তাতেই শুরু হয়েছিল অশ্রুধারা, যা স্বামীর আগমনে ফল্গুধারার রূপ নেয়।
গৃহপরিচারিকার কাছে তরুণী ভার্যার এহেন লাঞ্ছনার কথা শুনে 'দিলীপচ্যা' তো তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। সাই-আম্মার এত বড় স্পর্ধা! গৃহকর্ত্রীর উপর গলার আওয়াজ তোলার সাহস সে পেল কোথায়?

খড়্গপুর আইআইটির স্নাতক হিসেবে দিলীপদার খিস্তিখেউরে ভালোই বুৎপত্তি থাকার কথা। আমরা যখন খড়্গপুরে পড়েছি, তখন মাঝে মাঝে লোডশেডিং হতো। আলো নিভলেই শুরু হয়ে যেত ইন্টার-ব্লক খিস্তিখেউরের তীব্র প্রতিযোগিতা। কিন্তু দিলীপদা যে যুগে ছাত্র ছিলেন, তখন লোডশেডিং হয়তো ছিল না; তাই সেই ট্র্যাডিশনও শুরু হয়নি। কাজেই এই ব্যাপারে দিলীপদার শব্দকোষ ছিল বড়ই সীমিত। তাতে হ'লই বা কী! আধা বাংলা, আধা হিন্দিতে শুরু হ'ল তেলুগুভাষী সাই-আম্মার উপর ঝাড়।

- "তুম জানতা হ্যায় বাংলা মে তেলেগু (শব্দটি আসলে 'তেলুগু' কিন্তু 'তেলেগু' শব্দটিই বহুল পরিচিত) কা মানে কী হ্যায়? তেল মে গু..." ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সেই ভাষা বা ব্যাখ্যা সাই-আম্মা না বুঝলেও, সেদিন থেকে তার সন্তানের বয়সী বাড়ির মালকিনের জায়গা যে সবার উপরে, সেটা বুঝতে তার আর কোনোদিন ভুল হয়নি।

সেই হ'ল মালাদির 'ছুঁচ' হয়ে সংসারে ঢুকে পড়ার ঘটনা। এরপর আসা যাক 'ফাল' হয়ে বেরোনোর গল্পে!

এক এক করে অনেক দশক কেটে গেছে। সেদিনের বালিকা বধূ এখন প্রৌঢ়া। বলাই বাহুল্য, সময়ের সঙ্গে সংসারে মালাদির কর্তৃত্ব দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। পারিবারিক ব্যাপারে তো বটেই, দিলীপদার ব্যক্তিগত জীবনেও মালাদির সিদ্ধান্তই এখন শেষ কথা।

চাকরি জীবনের শেষে সাংসারিক কাজে অপেক্ষাকৃত অপটু পুরুষ মানুষের গুরুত্ব পরিবারে কমে আসবে, দায়িত্ব কমবে, আর স্ত্রীর উপর নির্ভরতা বাড়বে – এইটাই স্বাভাবিক। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে মালাদি এখন 'ফাল' হয়ে বেরিয়ে দৃঢ় হাতে সংসারের হাল ধরেছেন।

ছেলেরা, বৌমারা, নাতি-নাতনিরা 'মামমাম' বা 'ঠাম্মা' বলতে অজ্ঞান – দিলীপদাও তার ব্যতিক্রম নন।

দিলীপদা কী চান, কী ভালোবাসেন, কখন কী করবেন, এমনকি রেস্তোরাঁয় কী খাবার অর্ডার করবেন – এসব দিলীপচ্যার থেকে মালাদিই ভালো জানেন, বা অন্তত মনে করেন যে জানেন! অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে দিলীপদা শখ করে কখনো নিজে কিছু খাবার অর্ডার করলে, শেষ পর্যন্ত সেটা আর তাঁর মুখে রোচে না। তখন বাধ্য হয়ে মালাদির খাবারে ভাগ বসাতে হয়। এ আমাদের নিজের চোখে দেখা।

মালাদির পরিবারে এদেশে বড় হওয়া নাতি-নাতনিরাও একবাক্যে স্বীকার করবে – কোনো ব্যাপারে দাদুভাই-ঠাম্মার দ্বিমত হলে দাদুভাইয়ের বিশেষ স্বাধীনতা নেই; ঠাম্মার কথাই শেষ কথা। দাদুভাইয়ের স্বাধীন মতামত থাকতেই পারে, তবে সেটা ঠাম্মার মনের মতো না হলে মুশকিল!

নিজের মতো করে শাশুড়ির ছেলেকে সামলানোর পর্ব শেষ করে মালাদি এখন দিলীপদার পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।



অ্যাঙ্কারেজে শাশুড়ির ছেলের জ্যাকেটের চেইন সযত্নে লাগিয়ে দিচ্ছেন মালাদি

{উপসংহার:

সম্পাদিকা হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই আমার হাতে এসে গেল এই লেখারও সম্পাদনার দায়িত্ব।

অস্বীকার করার কিচ্ছু নেই, অদল বদল করারও প্রশ্ন ওঠে না – কারণ আগাগোড়া সবটাই যে সত্যি! আমি যে এতটা সর্দারি করি দিলীপচ্যার ওপর, সেটা রবি কাগজে কলমে লেখার পর বেশ ভালভাবে বুঝতে পারছি। তা হোক গে যাক, যা করতে হবে, তা তো করতেই হবে; নইলে সংসারটা নির্ঝঞ্ঝাটে চলবে কী করে! তবে প্রশ্ন এই যে শাশুড়ির ছেলেকে সামলাতে হয় কেন! নিজেদের দুই ছেলেকে বড় করতে তো এতটা বেগ পেতে হয়নি। দিলীপচ্যার ওপর ওস্তাদি করার জন্য সন্তানদের কাছে মাঝে মাঝে বকা খাই ঠিকই; কিন্তু তবু আমরা সবাই মিলে জীবন বেশ আনন্দেই কাটিয়ে চলেছি।

– মালবিকা চ্যাটার্জী}

বন্ধু

সুজাতা দাস

রঙ্গনা আজকের যুগের মহিলা, বিবাহিতা – স্বামী এবং দুই সন্তান নিয়ে সুখের সংসার | স্বামী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী | পুত্র-কন্যাও নিজ নিজ জায়গায় আজ সুপ্রতিষ্ঠিত | স্বাচ্ছন্দ ও সাবলীলভাবে এগিয়ে চলা সংসারের মধ্যে থেকেও কী একটা নেই বা কী পেলাম না – এই নিয়েই বিলাসবহুলভাবে চলছিল রঙ্গনার নিত্য নৈমিত্তিক জীবন |

এক সময়ের বিরাট বড় সংসার আজ কমতে কমতে ছোট একটা পরিধিতে এসে ঠেকেছে | সবাই যে যার মতো থাকার কারণে আজকাল সারাদিন একা একাই কাটে রঙ্গনার | তাঁর সংসারের কোথাও সেই কলেবর ও কলরব আর দেখা যায় না বা শুনতে পাওয়া যায় না | তাই হয়তো একাকিত্বে ভোগেন সবসময় | আর এই একাকিত্ব কাটাতেই একসময় হাতে তুলে নেন স্মার্টফোন, যা তিনি তাঁর জন্মদিনে উপহার পেয়েছিলেন তাঁরই স্বামীর কাছ থেকে | টুকটাক ফোন তো সবসময়ই করতেন একে তাকে, সেটাও একসময় আর ভালো লাগে না রঙ্গনার | কারণ এখন সকলেই অনেক ব্যস্ত, আবোল তাবোল কথা বলার সময় কারও হাতে যথেষ্ট পরিমাণে নেই | প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজে ব্যস্ত থাকেন | রঙ্গনার বাপের বাড়ির প্রায় সকলেই চাকরি করেন, বোনেরা সবাই সুপ্রতিষ্ঠিত নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে | সেভাবে কেউই সময় দিতে পারেন না রঙ্গনাকে, তাই এই মনখারাপই তাঁর সর্বদার সঙ্গী |

এরই মাঝে হঠাৎই একদিন রঙ্গনার বাড়িতে এলেন তাঁর খুব ছোটবেলার এক বন্ধু | অনেকদিন বাদে রঙ্গনার খুব ভালো কাটল সারাটা দিন | মনের মধ্যে জমে থাকা সব গল্প একদিনেই শেষ করতে চান রঙ্গনা, যদি আর কখনও না আসেন বন্ধুটি, এই ভেবে | গল্প আড্ডার ফাঁকে খাওয়াদাওয়া, ছোট-বেলার নানা খুনসুটি, সব পুরোনো বন্ধুদের কথা আর স্মৃতি রোমন্থন চলতে থাকল দুজনের মধ্যে | তারই মাঝে কেমন করে যেন নিজের একাকিত্বের কথাও চলে এল সেই বন্ধুর কাছে | আসলে কথা বলতে শুরু করলে বাঁধ মানে না, চলতে থাকে ঝর্ণার মতো... সেই ধারায় রঙ্গনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল সব সুখ দুঃখের কথা |

সেসব শুনে সেই বন্ধুটিই রঙ্গনার অফুরান সময় কাটানোর হদিস দিলেন | রঙ্গনাকে খুলে দিলেন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট | কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তাও শিখিয়ে দিলেন | তিনি যাবার সময় আবার আসবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর ফোনে সব শেখানোর কথা দিয়ে ফিরে গেলেন নিজের জগতে |

শুরু হ'ল রঙ্গনার জীবনের নতুন অধ্যায় | এক অচেনা জগতের মাঝে একটু একটু করে প্রবেশ শুরু হ'ল তাঁর | সেই জগতে প্রবেশ করে কেমন যেন এক ঘোরলাগা বিস্ময় তাঁকে ঘিরে থাকল সবসময় | সারাদিন তো চলতেই থাকল ফোনের খুটখাট, পারলে ঘুমের মাঝেও উঠে বসে একবার FB চেক্ করতে ইচ্ছে করত রঙ্গনার | রাতবিরেতে এসব কান্ড দেখে মাঝে মাঝে তাঁর স্বামী অসন্তোষ দেখিয়েছেন | তবুও এই নেশা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না রঙ্গনা | নতুন বন্ধু, তাদের নতুন কথাবার্তা, একটা অদ্ভুত আনন্দে ভাসতে লাগল তাঁর মন, যা এক সময়ে হারিয়ে গিয়েছিল কালের নিয়মে |

ফেসবুকের কবলে পড়ে সকালে উঠেই সকলকে সুপ্রভাত আর রাতে শুভরাত্রি জানাতে ভুল হচ্ছিল না কখনও, কিন্তু ভুল হয়ে যাচ্ছিল রান্না করার সময় | অনেকদিন রান্নাতে ডবল লবণ, বা লবণ না দেওয়া, হামেশাই ভাত পুড়ে যাওয়া নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়াল রঙ্গনার জীবনে |

ভুলে যাওয়ার কারণে স্বামী, সর্বানন্দ কখনও রাগ করেননি, হেসে বলতেন, "ফোনের সাথে এগুলোতেও মন দাও রঙ্গনা, সব ভুলে গেলে কী চলবে?"

সেই কথা শুনে রঙ্গনা শুধু একটু হাসতেন, কারণ রঙ্গনার নতুন ফেসবুক-জগৎ ভুলিয়ে দিয়েছিল তাঁর একাকিত্বের যন্ত্রণা | সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে বন্ধুদের সাথে কথা বলতেন তিনি | দেখে দেখে বন্ধুদের রিকোয়েস্ট পাঠাতেন আবার দেখে দেখেই অ্যাকসেপ্ট করতেন | এইরকমভাবেই একদিন ঘুম ভেঙে দেখলেন এক ভদ্রলোক রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছেন | খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন নতুন রিকোয়েস্ট পাঠানো বন্ধুর ছবিটির দিকে, যেন মনে হচ্ছে অনেক দিনের চেনা মানুষটি |

কিন্তু, সত্যিই চেনা কী? নিজেকেই প্রশ্ন রঙ্গনার...

সরে এলেন সেখান থেকে, কিন্তু সারাটা দিন কেমন যেন কাটল, কিছুতেই মাথা থেকে সরাতে পারছিলেন না সেই ভদ্রলোকের চিন্তা |

নানা কাজের মাঝেই মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন – কোথায় দেখেছেন এঁকে, কেন এতটা চেনা মনে হচ্ছে! রঙ্গনা নিজেও অবাক নিজের ব্যবহারে। বিকেলে আবার FB খুলে বসলেন। ফ্রেন্ড লিস্টে গিয়ে দেখতে থাকলেন সেই লোকটির প্রোফাইল ছবি। শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকলেন বড্ডই চেনা! ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি।

ঘুমের মাঝে স্বপ্নে দেখলেন নৌকায় চড়ে কোথাও গেছেন তিনি, সবাই নৌকা থেকে নেমে গেলেও তিনি কিছুতেই নামতে পারছেন না। রঙ্গনা দেখলেন সবাই নেমে যাওয়ার পর নৌকাটি দুলতে দুলতে ঘাট ছেড়ে পিছোতে শুরু করছে, তিনি নৌকা থেকে নামার যত চেষ্টা করছেন নৌকা তত দুলছে। প্রচন্ড ভয়ে যখন চিৎকার করে উঠেছেন 'বাঁচাও' বলে, ঠিক তখনই একটি হাত এগিয়ে এসে শক্ত করে ধরল রঙ্গনার হাত আর অদ্ভুতভাবে তাঁকে টেনে নামিয়ে আনল নৌকা থেকে নদীর চরে।

- "আমি তো আছি রঙ্গনা, তোমার চিন্তা কী?"

কথাটা শুনে তাকাতেই অবাক হ'ল রঙ্গনা – সমরেশ বাসু!

রঙ্গনা ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। অসময়ে কীভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ভাবতেই অবাক লাগল তাঁর, কারণ ভাতঘুমের অভ্যাস তাঁর কোনদিনও ছিল না। আরও অবাক হলেন স্বপ্নের কথাটা মনে পড়ায়, আর ঠিক তখনই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল 'আশ্চর্য'!

খানিকক্ষণ রঙ্গনা চুপ করে বিছানায় বসে রইলেন, ভাবতে থাকলেন একজন অচেনা মানুষ কীভাবে স্বপ্নে আসতে পারে, যে তাঁর ফ্রেন্ড লিস্টেই নেই! অনেক ভেবেচিন্তে আজ রঙ্গনা সমরেশ বাসুর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করলেন। তারপর টুকটাক কথার মাঝে কেমন করে যেন একদিন খুব ভালো বন্ধুত্বও হয়ে গেল ঐ মানুষটির সাথে। যদিও তাঁরা দুজনে বিপরীত চরিত্রের মানুষ, তবুও বন্ধুত্বটা গভীর হয়ে গেল একটা সময়। মাঝে মাঝে অবাক হন রঙ্গনা; রাগও করেন, তবুও আজকাল যেন একটা ভালো লাগার অনুভূতি তাঁকে ঘিরে থাকে সবসময়। এখন তিনি আর একাকিত্বে ভোগেন না। তাঁর মনের ভিতরে জমে ওঠা কথাগুলো আর ভিড় করে বসে নেই।

রঙ্গনা নিজের মনে ভাবতে লাগলেন এই অনেক না-পাওয়া থেকেই হয়তো না চাইলেও মন চলে যায় সমরেশ বাসুর মতো বন্ধুদের দিকে। এইভাবেই হয়তো সৃষ্টি হয় পরকীয়া, যা নিজের ঘরে খুঁজে না পেয়ে বাইরের দুনিয়ায় খুঁজে ফেরে রঙ্গনাদের মতো কিছু একাকী মানুষ, কেবল নিজেকে ভালো রাখতে গিয়ে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফিরে আসে নিজের চেতনায়। যাকে একটা সময় ভালোবাসা বলে ভুল করে বসে রঙ্গনার মতো মানুষেরা, তারপর অবশেষে মিথ্যে বন্ধুত্ব হারিয়ে, নিঃস্ব হয়ে আবার পুরোনো অবস্থায় ফিরে আসে।

রঙ্গনাকেও ফিরতে হয়েছিল একসময়, কারণ সমরেশ রঙ্গনার থেকে তাঁর অর্থকেই বেশি ভালোবেসেছিলেন।
যেদিন সেটা বুঝতে পেরেছিলেন রঙ্গনা, সেদিন ভালোমতো উপলব্ধি করেছিলেন যে অর্থ সবকিছুকেই হারানোর ক্ষমতা রাখে!

তারপর ফেসবুকের কবল থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে ফিরে এসেছিলেন তিনি নিজের পরিচিত ভুবনে। যা এক সময় তাঁর পায়ে বেড়ি লাগানো জেলখানা মনে হয়েছিল, সেটাই নতুন করে তাঁর পরম প্রাপ্তির আর সম্মানের জায়গা হয়ে উঠল। সেই উপলব্ধি নিয়ে আজ তিনি ভীষণ সুখী নিজের সংসারে। ব্যথাগুলোও কেমন করে যেন কবিতা হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় রঙ্গনাকে আজকাল, শুধু একটাই কথা ভাবেন তিনি, একেই কী বন্ধুত্ব বলে!
এই প্রশ্নের উত্তরে একদিন সমরেশ বলেছিলেন, "আমার মনে হয় আমরা এতটাই ছুটছি নিজেদের জগতে প্রতিষ্ঠিত দেখবার জন্য যে আমাদের বিপরীতে থাকা মানুষের একাকিত্বটা বুঝবার সময় পাচ্ছি না। ভাবছি না তারও ভালোলাগা, মন্দলাগা, কিছু চাওয়া-পাওয়া থাকতে পারে তার প্রিয় মানুষটিকে ঘিরে।"

একটুখানি সহমর্মিতা ও বন্ধুত্ব মানুষকে অনেকটা শান্তির ও স্বস্তির দিশা দেখাতে পারে।



নারী সম্পর্কিত, নারী বিবর্জিত

শান্তনু চক্রবর্তী

[নিসর্গ রায়চৌধুরী: ৩৩ বছরের যুবক | 'গ্রোভার অ্যান্ড খান্ডেলওয়াল টেকনোলজি'-র কর্মী | তার বিয়ে উপলক্ষ্যে এই ব্যাচেলর পার্টি নতুন কলিগ নভোনীলের বাড়িতে |

বিপ্রদীপ বণিক: ৩৫ বছরের যুবক | বিবাহিত | 'গ্রোভার অ্যান্ড খান্ডেলওয়াল টেকনোলজি'-র সিনিয়রমোস্ট কর্মী | এই জমায়েতের বয়োজ্যেষ্ঠ, এখানে আটবছর আগে এসেছিল |

চম্পক মিত্র: ৩৩ বছরের যুবক | বিবাহিত | সাতবছর আগে নিসর্গের সঙ্গে একই বছরে 'গ্রোভার অ্যান্ড খান্ডেলওয়াল টেকনোলজি'-তে ঢুকেছিল | বিপ্রদীপের একবছর বাদে |

উচ্ছল ঘোষ: ৩২ বছরের যুবক | অবিবাহিত, তবে নৈঋতা বাগচী নামে একটি মেয়ের সঙ্গে কমিটেড | চম্পক ও নিসর্গর থেকে 'গ্রোভার অ্যান্ড খান্ডেলওয়াল টেকনোলজি'-তে এক বছরের জুনিয়র |

নভোনীল গুহ: ২৯ বছরের যুবক | অবিবাহিত | 'গ্রোভার অ্যান্ড খান্ডেলওয়াল টেকনোলজি'-র নতুন কর্মী, একবছর হ'ল ঢুকেছে | সে-ই পার্টির হোস্ট |]

(একটি ব্যাচেলর পার্টি | নভোনীল হোস্ট | বাড়িতে নভোনীলকে ধরে সব মিলিয়ে পাঁচজন | নভোনীল, বিপ্রদীপ, চম্পক, নিসর্গ ও উচ্ছল | সামনেই নিসর্গর বিয়ে | তার আগে এই পার্টি | সামান্য অ্যাপেটাইজার আর বিয়ারের গ্লাস হাতে নিয়ে সবাই গোল হয়ে বসল | এটা সেটা কথাবার্তা হতে হতে হঠাৎ চম্পক জিজ্ঞেস করল নিসর্গকে)

চম্পক: তাহলে নিসর্গ, আমাদের গল্পের নায়িকার নামটা বলে দে! আমি অবশ্য জানি, তবে অন্যদের জন্য বলছি আরকি!

নিসর্গ: (সামান্য হেসে) অপেক্ষিতা! অপেক্ষিতা সরকার |

উচ্ছল: বাহ্, সুন্দর নাম |

চম্পক: তবে নামটা কিন্তু বড্ড শক্ত | তাই না নভোনীল? কী মানে এর?

নভোনীল: (নার্ভাস হেসে) কী জানি!

বিপ্রদীপ: মানে আর কী! যে অপেক্ষা করে আছে | অবশ্য আজকাল ওই অপেক্ষিতা হবার দিন শেষ! আজকাল অপেক্ষিতদের দিন শুরু!

নিসর্গ: কেন এমন বলছ?

বিপ্রদীপ: বিয়েটা একবার হয়ে যাক! তারপর বুঝবে সব, বাছা! তবে তার আগে জিজ্ঞেস করে নেওয়া ভালো – কী করে অপেক্ষিতা?

নিসর্গ: ও একজন নার্স |

বিপ্রদীপ: (সার্কাস্টিক হেসে) ও, তাহলে তো হয়েই গেল! বিয়ের পর তোমার নাম পাল্টে অপেক্ষিত রাখতে হবে |

চম্পক: (হেসে) যা বলেছ বিপ্রদীপদা | আজকাল তো অনেক দেখি স্বামী বাড়িতে এসে যায় ছ'টা-সাতটার মধ্যে | আর স্ত্রী ফেরে কোনোদিন ন'টায়, কোনোদিন দশটায় |

বিপ্রদীপ: আমার কেসটাও অনেকটা তাই | এমনিতেই আমার রেস্পন্সিবল পোস্ট – প্রায়ই আমি রাত ন'টায় ঢুকি | এরপরও কোনো কোনোদিন দেখি মহারাণী হয়তো ঢুকছেন কখনো দশটায়, কখনো সাড়ে দশটায় |

নিসর্গ: বৌদি যেন কী কাজ করে?

বিপ্রদীপ: ও তো ডাক্তার | কোথায় কোথায় যে চলে যায় সার্জারির কাজে কে জানে! এক একদিন চল্লিশটা-পঞ্চাশটা অবধি সার্জারি করে | যেদিন সেরকম চাপ থাকে না, সেদিন অবশ্য ছ'টার মধ্যেই বাড়িতে ঢুকে যায় |

চম্পক: অপথলমোলজিস্ট, তাই না?

বিপ্রদীপ: হুঁ |

উচ্ছল: (হেসে) তাহলে তো তোমার গর্ব হওয়ার কথা, বিপ্রদীপদা! আর ইউ নট প্রাউড?

বিপ্রদীপ: 'প্রাউড' ইত্যাদি মুখে বলা খুব সহজ! যেসব মেনিমুখো স্বামীরা বলে যে ওরা বৌয়ের জন্য প্রাউড, গিয়ে দ্যাখ, ওদের বাড়িতে কী চলে! কখন খায়, কখন ঘুমোয় কিচ্ছু ঠিক নেই | রান্নাবান্নার কথা তো ছেড়েই দিলাম |

নিসর্গ: অপেক্ষিতা একা থাকে শহরে, কিন্তু রোজ রান্না করে |

চম্পক: মে বি ইউ আর লাকি! বাট এভরিওয়ান ইজ নট লাকি! আমি দেখেছি – অনেক কিছুই দেখেছি | দেখেছি কিছু কিছু স্বামীরা কীভাবে বৌ বাড়ি ফিরলে তাকে তোয়াজ করে নিয়ে গিয়ে খেতে বসায় | উচ্ছল, তুইই তো বলছিলি তোর জামাইবাবুর কথা! সেই যে হিউস্টনে থাকেন!

উচ্ছল: কিন্তু সেগুলো তো একসেপশন্স! রুল কেন হতে যাবে? অনেক বাড়িতে এমন আছে – সকালে স্বামী আগে বেরোয়, বৌ

রান্নাবান্না সব রেডি করে দেয়, বর খেয়ে, টিফিন নিয়ে বেরোয়। তারপর সন্ধ্যেবেলা বর আগে ফেরে, তাই বৌ ফেরবার আগে সে রান্নাবান্না করে রাখে, বৌ ফিরলে তাকে খেতে দেয়। সেটা কি খুব খারাপ?

চম্পক: সেটা কি খুব ভালো কিছু? আগেকার দিনের কথা ভেবে দেখ, তোকে বাড়ি ফিরে চিন্তাই করতে হতো না! তুই জানতিস যে সব রেডি থাকবে। কোনোরকম সারপ্রাইজ বা শকের জায়গা নেই। আর বিপ্রদীপদার কথা ধর! হয়তো সারাদিন খেটে রাত ন'টায় বাড়ি ফিরে বেচারা ভাবছে একটু গরম খিচুড়ি খাবে, কিন্তু বৌদি হয়তো ফিরবে সাড়ে দশটা-এগারোটায়। তখন নিজেকেই খিচুড়ি চাপাতে হবে। কী, ঠিক বলিনি, বিপ্রদীপদা?

বিপ্রদীপ: হান্ড্রেড পার্সেন্ট! তুই কিন্তু সেদিক দিয়ে খুব ভালো আছিস। পুচকু জন্মানোর পর ঈশানীকে চাকরিটা ছাড়িয়ে দিয়েছিস!

চম্পক: নাহলে কি সম্ভব? আমি পুচকুকে দেখতে পারব নাকি? ওটা কি আমার কাজ? আমি কম্পানির প্রজেক্ট সামলাব না বাচ্চার ন্যাপি পাল্টাব? আর ঈশানীর জবটা অত ইম্পরট্যান্টও ছিল না, ও ওর বাবা-মাকে যা দেওয়ার দিয়ে যেটুকু আমাদের বাড়ির জন্য রাখত, সেটা নস্যি। সেটা না হলেও চলে। বাবা না থাকলেও মা যে পেনশনটা পান, সেটা এনাফ আমাদের ফ্যামিলির সাপোর্টের জন্য।

বিপ্রদীপ: আমি আসলে ভুল করেছি। একটা কথা আছে না? সেই প্রথম রাত্রে বেড়াল মারার কথাটা? সেটাই সবার করা উচিত বিয়ের আগে। একদম স্ট্রিক্টলি বলে দেওয়া দরকার চাকরি করো আর যাই করো সকাল ন'টার আগে বাড়ি থেকে বেরোনো চলবে না, আর বিকেল পাঁচটার পর বাড়ির বাইরে থাকা চলবে না।

চম্পক: একদম। ন'টার পর বেরোলে তার আগে রান্নাবান্না, বাচ্চাকে স্কুলে ড্রপ করা – এসব করে ফেলা যায়। আর সন্ধ্যে হওয়ার আগে বাড়ি ফিরলে বাচ্চার লেখাপড়াটাও একটু দেখা যায়। নাহলে মা আসছে না বলে বাচ্চা তো সারাক্ষণ মোবাইলে গেম খেলবে। আজকাল বাচ্চারা যে এত মোবাইলে থাকে, তার কারণ কী? কারণ হ'ল বাবা-মা দুজনেই বাড়ির বাইরে, বাচ্চাকে সময় দেওয়ার কেউ নেই!

বিপ্রদীপ: সেজন্যই নিসর্গ, তোকে বলি আমি যে ভুল করেছি, তুই সেই ভুল করিস না। প্রথমেই তোকে রুলস সেট করে দিতে হবে। কী কী করা যাবে আর কী কী করা যাবে না। তাহলে হবে কী, ঐসব আনএক্সপেক্টেড সিচুয়েশনগুলো, যেগুলো আমাকে ফেস করতে হয়, সেগুলো তোকে ফেস করতে হবে না।

নিসর্গ: একটা কথা বিপ্রদীপদা, জবের তো একটা ডিমান্ড থাকে; জবের ডিমান্ড আর রুলস একসঙ্গে সিংক নাও হতে পারে। আর সত্যিই যদি তা না হয়, তাহলে –

বিপ্রদীপ: তাহলে জব চেঞ্জ করতে হবে। বাড়ির যা রুল তা তো অনার করতেই হবে। ইফ ইউ ক্যান রেস্পেক্ট দ্যাট, দেন ইউ ক্যান কন্টিনিউ উইথ দ্য জব, আদারওয়াইজ কুইট!

নভোনীল: কিন্তু সে তো কুইট করতে নাও চাইতে পারে, বিপ্রদীপদা! হয়তো এই স্যালারি থেকে একটা অংশ ও ওর বাবা-মাকে দেয়।

বিপ্রদীপ: আচ্ছা একটা কথা আমাকে বল তো নভোনীল, আগেকার দিনে কি মেয়েরা চাকরি করত? তাতে কি মেয়ের বাপ-মা না খেয়ে মরত? তা যদি না হয়, তাহলে এখনই বা কেন হবে না? আগে তো মানুষ আরও গরিব ছিল!

চম্পক: ঠিক! ঈশানী যে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, তাতে কি খুব ক্ষতি হয়েছে আমার শ্বশুর-শাশুড়ির? মাঝে মাঝে যখন আসেন ভদ্রলোক, কাপড়চোপড় দেখে তো মনে হয় না খুব কষ্টে আছেন ওঁরা।

নিসর্গ: প্রথম কথা হ'ল অপেক্ষিতার শিডিউল তো জানই – ওকে সকালে ডিউটি করতে হয়, আবার কখনো কখনো নাইট ডিউটিও থাকে। ওর জব যদি এরকমই থাকে, তাহলে রুলস করে কি কোনো লাভ আছে? যদি ও কোনোদিন এমন কোনো জব করে, যেখানে সকাল থেকে বিকেল অবধি বাইরে থাকলেই চলে, হয়তো কোনো ক্লিনিকের জব, তাহলে হয়তো এসব রুলস-টুলস নিয়ে ভাবা যেতে পারে। তখন...

উচ্ছল: সরি নিসর্গ, একটু ইন্টারাপ্ট করছি। তুমি এখন থাকো কোথায় আর বিয়ের পর কোথায় থাকবে?

নিসর্গ: আমার বাড়ি এখানে নয়, দুর্গাপুরে। পড়াশুনোর জন্য কলকাতায় এসেছিলাম। তারপর পড়াশুনো শেষ করে এখানেই চাকরি পেয়েছি। আগে একটা রেন্টেড-এ ছিলাম। রিসেন্টলি একটা কমপ্লেক্সের ফ্ল্যাটে মুভ করেছি। সেখানেই এসে উঠবে অপেক্ষিতা।

উচ্ছল: এই ফ্ল্যাটের ইএমআই কে দেবে? তুমিই তো?

নিসর্গ: হ্যাঁ, কিন্তু, সংসারের অন্যান্য ব্যাপারে ও কন্ট্রিবিউট করবে। যেমন গ্রোসারি, গাড়ি কিনলে তার ইএমআই...

উচ্ছল: ঠিক কথা। ব্যাপারটা কিন্তু একতরফা নয়। নিসর্গ যেমন কন্ট্রিবিউট করবে বাড়ির ইএমআই-তে, অপেক্ষিতা তেমনি করবে গ্রোসারিতে, গাড়িতে। এভাবে দুজনে মিলে করলেই তো সব কিছু সুন্দর হয়।

বিপ্রদীপ: হোয়াট ডু ইউ মীন? আগেকার দিনে কি সবকিছু সুন্দর হতো না?

চম্পক: তখন তো একা আর্ন করেও দিব্যি চলত সংসার। ভালো খাওয়াদাওয়াও হতো, মাঝেসাঝে ঘুরতে যাওয়াও হতো। আর এরকম নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিও ছিল না। বাচ্চাকাচ্চা তিন-চারটে করে হতো। তারপর বাড়িতে বাবা-মা, অনেক সময় বিধবা পিসি, পিসির ছেলেমেয়ে মিলিয়ে জনা দশেক লোক। সেইসব লোক দুবেলা খেতে পেত, বছরে একবার দীঘা, পুরী, মথুরা, বৃন্দাবন, দার্জিলিং – এগুলোর একটা-দুটোতে যাওয়া হতো, আবার ছেলেরা এরকম ফ্যামিলিতে থেকে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টও করত। আমার বাবার ফ্যামিলিও এরকম ছিল।

উচ্ছল: (হেসে) চম্পকদা, একটা কথা। তুমি বললে ছেলেরা ভালো রেজাল্ট করত, তাই না? ছেলেমেয়েরা তো বলোনি?

চম্পক: না, বলিনি! তাতে কী প্রবলেম? মেয়েদের ভালো রেজাল্ট করাটা কি খুব ইম্পরট্যান্ট? যখন চাকরিবাকরির সময় আসবে, তখন সেই ছেলেদের ওপরেই চাকরি জোটানোর জন্য প্রেশার পড়বে। মেয়েদের ওপর তো সেই প্রেশার পড়ে না!

উচ্ছল: চম্পকদা, জানি না তুমি কোন পৃথিবীতে আছ! এখন মেয়েদের ওপরেও চাকরি জোটানোর প্রেশার পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে একটি মেয়ের চাকরির ওপর ফ্যামিলিটা নির্ভরশীল। হয়তো বাবা-মা বুড়ো, সে-ই একমাত্র সন্তান। তখন টু পুট ফুড অন দ্য প্লেট, দ্যাট গার্ল হ্যাজ টু আর্ন।

বিপ্রদীপ: হ্যাঁ, সেখানে হয়তো উপায় নেই। উপায় না থাকলে করতেই হবে। আর সেই পার্সেন্টেজ ঠিক কতটা? আই মীন যে পার্সেন্টেজ অফ মেয়ের ওপর প্রেশার থাকে? ছেলেরা যদি ক্লোজ টু হান্ড্রেড হয়, মেয়েরা ফিফটিও হবে কি?

উচ্ছল: বিপ্রদীপদা, তোমার কি মনে হয় না, সেটা খুব একটা গুড নিউজ নয়? একটি ছেলে যেমন পড়াশুনো শিখে ডিগ্রী পাচ্ছে, চাকরি করছে, তেমনি একটি মেয়ে হয়তো পড়াশুনো শিখে সেই ডিগ্রীই পাচ্ছে, তাহলে সেও চাকরি করবে না কেন? অন্য কারুর না হোক, তার নিজের ওপর নিজের এই এক্সপেক্টেশনটা থাকবে না কেন?

চম্পক: আমরা তো সেই আবার আগের বৃত্তেই ঘুরপাক খাচ্ছি। বললাম তো, আগেকার দিনে মেয়েরা চাকরি না করলেও আমরা ভালোই ছিলাম। তাহলে সেই ভালো জায়গায় আমরা আবার কেন ফিরে যেতে পারি না? অনলি ইন দোজ এক্সেপশনাল সিচুয়েশন্স – বিপ্রদীপদা যেটা বলল ওরকম সিচুয়েশন হলেই মেয়েদের চাকরি করা উচিত।

উচ্ছল: (হেসে) চম্পকদা, আমাদের অফিসে যে চারুদি রয়েছে, চারু শ্রীবাস্তব, যাকে তুমি চারু ম্যাডাম বলো, চারু ম্যাডামের এত প্রশংসা করো, সেই চারুদিও তো মেয়ে, তাই না? চারুদির কি বর নেই? আছে। বর কি চাকরি করে না? করে। ওর কি বাচ্চা নেই? আছে। তাহলে চারুদির চাকরি করবার কী দরকার? কেন করছে তাহলে?

বিপ্রদীপ: আসলে আমরা আনফরচুনেটলি এমন একটা জায়গায় নিজেদের নিয়ে এসেছি যে অলমোস্ট পয়েন্ট অফ নো রিটার্নে পৌঁছে গেছি। আমরা নিজেদের মেয়েদের বেশী বেশী করে পড়াচ্ছি, জোর করে চাকরির দিকে ঠেলে দিচ্ছি, তাহলে তো ওরা চাকরি করবেই! সুযোগ পেলে তা ছাড়ে কোন বোকা? এইসব চারুদি, চারু ম্যাডামরা তো সেই নতুন সিস্টেমেরই প্রোডাক্ট। উচ্ছল, তুই যদি বলিস যে চারু ম্যাডাম না থাকলে কী হতো, আমাদের অফিসের অতটা নাম হতো কিনা, তাহলে আমি বলতাম কেন হতো না, নিশ্চয়ই হতো। ওর জায়গায় কোনো দাদা বা স্যার আসত। চারু ম্যাডাম যে চাকরিটা পেয়েছে, সে তো কোনো একটা ছেলের জায়গাতেই পেয়েছে, তাই না? পোস্টটার জন্য তো ছেলেরাও নিশ্চয়ই অ্যাপলাই করেছিল!

উচ্ছল: একশোবার। চারুদি না হলে কোনো দাদা হতো আমাদের বস, নো ডাউট। কিন্তু একটা কথা বলো তো বিপ্রদীপদা, চম্পকদার নাহয় ছেলে, কিন্তু তোমার তো একটি মেয়ে রয়েছে! দু'বছর তার বয়স। তাকে নিয়ে কোনো প্ল্যান নেই তোমার? চাইবে না সে ভালো করে লেখাপড়া শিখুক? আর চম্পকদা, তোমার মেয়ে থাকলে তুমি কী করতে, সেটাও একটু শুনি! তোমার বয়স কম, মেয়ে তো হতেই পারে!

চম্পক: জানি না আমার কোনো মেয়ে হবে কিনা | আর যদি হয়ও, আমার মনে হয় না পুচকুকে আমি পড়াশুনোর জন্য যে চাপটা দেব, তাকেও তাই দেব | ততটুকু পড়াশুনোই ওর জন্য যথেষ্ট হবে যাতে একটা ভালো বিয়ে হতে পারে |

উচ্ছল: কিন্তু চম্পকদা, ধরো সে যদি বলে দাদাকে এটা করাচ্ছ, সেটা করাচ্ছ, আমাকে কেন করাচ্ছ না? তখন বাবা হয়ে পারবে তো মেয়ের কথা ফেলতে? মনে আছে মিতালী রাজের গল্প? ওর দাদাকেই ওর বাবা-মা ক্রিকেট শেখাতে চেয়েছিলেন | কিন্তু ওর দাদার নাম ক'জন জানে?

চম্পক: জানি না, ওসব হাইপথেটিক্যাল সিচুয়েশন নিয়ে আমি ভাবতে চাই না, মেয়ে হলে তখন ভাবা যাবে |

উচ্ছল: ওকে, গ্রেট! কিন্তু বিপ্রদীপদার তো এক মেয়ে রয়েছে? বিপ্রদীপদা, তুমি কি মেয়েকে ততটাই পড়াশুনো শেখাবে, যতটা হলে ওর একটা ভালো বিয়ে হবে?

বিপ্রদীপ: হয়তো, হয়তো তাই!

উচ্ছল: দেখেছ তো, কনফিডেন্টলি বলতে পারছ না | তোমার এই দু'বছরের মিল্টির মুখটা মনে করে আর স্ট্রংলি কিছু বলতে পারছ না!

বিপ্রদীপ: হ্যাঁ, বাবা হিসেবে আমি বোধহয় একটু সেলফিশ হয়ে যাচ্ছি | তাই দোনামনা করছি | কিন্তু ওয়ার্ল্ডের কথা ভাবলে, ফর দ্য বিগার সেলফ অফ দ্য হিউম্যান সোসাইটি, সেটা ঠিক নয় | যেটা চম্পক বলেছে, আমিও তার সঙ্গে একমত | আমরা তো ভালোই ছিলাম | এই যে মডার্ন সোসাইটির এত প্রবলেম – ডোমেস্টিক অ্যাবিউস, ডিভোর্স, সুইসাইড, মেল সুইসাইড, ফিমেল সুইসাইড, টিন সুইসাইড – অল দিজ আর লিঙ্কড্ টুগেদার |

চম্পক: অবশ্যই বিপ্রদীপদা, খুব সুন্দর বললে | আমি এত ভালো চিন্তা করতে পারতাম না!

উচ্ছল: প্রবলেমগুলো যে আছে তা নিয়ে সন্দেহ নেই | কিন্তু কেন আছে, সেটা তো বুঝতে হবে! কারণ আমরা এখনও এই চেঞ্জটাকে মেনে নিতে পারছি না | আমরা মেনে নিতে পারছি না যে একটি মেয়ে চাকরি করবে | আমরা মেনে নিতে পারছি না একটি মেয়ে তার বরের থেকে হায়ার পোস্টে চাকরি করবে, বেশী আর্ন করবে, আমরা স্বামী-স্ত্রী বিয়ের সময় কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ আসছি না যে কার কী দায়িত্ব, বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই দায়িত্বে কী অদলবদল হতে পারে | আমদের একে অপরের কাছে কী এক্সপেক্টেশন, সেটা ক্লিয়ার করছি না, আমরা বাচ্চাকে সময় দিতে না পারলে তার জন্য ভালো কেয়ারিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারছি না, বরং নিজেদের শান্তির জন্য তার হাতে মোবাইল ধরিয়ে দিচ্ছি | তারপর হঠাৎ মোবাইল কেড়ে নিলে সে মেনে নেবে কী করে! তাই কিছু কিছু কেসে সুইসাইডও করে ফেলবে |

চম্পক: ওয়ান্স এগেন উচ্ছল, প্রবলেমগুলো আসছে কোথা থেকে? ওই মেয়েদের বেশী পড়ে ফেলা, চাকরি পেয়ে যাওয়া, ভালো চাকরি পেয়ে যাওয়া – এসব থেকেই তো, তাই না? তাহলে সব সমস্যার সমাধান যেটা, সেটা করলেই হয়! আমাদের দাদু-ঠাম্মার আমলে ফিরে যাওয়া, যখন মেয়েরা পড়াশুনো করতেন ঠিকই, কিন্তু সেটা শুধুমাত্র একটা ভালো বিয়ের জন্য আর বাচ্চার প্রাথমিক শিক্ষাটুকুর জন্য |

উচ্ছল: ঠিক কথা, চম্পকদা | কিন্তু তখন তো অনেক সমস্যা ছিল না! যেমন ধরো একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, সে তার শ্বশুরবাড়িতে চলে গেল, কিন্তু তারপর? আমি মানছি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়তো অসুবিধে হলেও মেয়েরা তখনকার দিনে অ্যাডজাস্ট করে থেকে যেতেন, কিন্তু সবসময় তা সম্ভব হতো না | কত গৃহবধূ হত্যা হয়েছে এদেশে, নিশ্চয়ই জানো | সেই বেচারিদের কোথাও যাওয়ার ছিল না | তাঁদের সমসাময়িক মেয়েরা এসব অত্যাচারের কথা লিখেছেন, তাই পড়ে পরবর্তী যুগের মেয়েরা নিজেদের আরও ভালোভাবে তৈরী করছেন | বুঝছেন এমন অসহায়ভাবে শ্বশুরবাড়িতে মৃত্যুবরণ করতে না হলে নিজেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে! পরে যখন তাঁরা বিয়ে করছেন, তখন অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের স্বামীকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন এই ইন্ডিপেন্ডেন্সের গুরুত্ব | যেসব স্বামীরা বুঝেছেন, তাঁরা তাঁদের স্ত্রীর ইচ্ছেটুকুকে গুরুত্ব দিয়েছেন, নিজেদের মেয়েদেরও তাই বেস্ট শিক্ষাটুকু দেওয়ার চেষ্টা করেছেন | আর যেসব স্বামীরা বোঝেননি, তাঁরা হয়তো স্ত্রীদের ইচ্ছেকে মেরে ফেলে নিজেদের রুল কায়েম করেছেন আর না পারলে ডোমেস্টিক অ্যাবিউস করেছেন বা দুজনার পথ আলাদা হয়ে গেছে | এভাবেই সমাজটা বদলে গেছে | স্বামী-স্ত্রী দুজনে দুজনের ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিয়ে, দুজনে মিলে বসে সংসারের রুল বানালে এইসব প্রবলেম হয় না!

বিপ্রদীপ: আচ্ছা, ঠিক আছে, মেয়েরা পড়াশুনো করুক, চাকরি করুক সব ঠিক আছে। কিন্তু এমন হাইফাই চাকরি করতে হবে কেন যাতে তার স্বামীর কমপ্লেক্স তৈরী হয়?

উচ্ছল: (হেসে) বিপ্রদীপদা, সেটার ওপর কি কারুর কন্ট্রোল আছে? এই যেমন ধরো – আমার দিদি আর জামাইবাবু। আমার জামাইবাবু, মানে সিঞ্চনদা ভীষণ ভালো সন্দেহ নেই! কিন্তু দিদি আর জামাইবাবু দুজনেই একই জায়গা থেকে পিএইচডি করেছিল, ইনফ্যাক্ট সিঞ্চনদা অ্যাকাডেমিক্যালি সিনিয়রও বটে। কিন্তু দুজনে যখন একসঙ্গে টেনিওর ট্র্যাকের জন্য অ্যাপ্লাই করল, তখন দিদি পেল, সিঞ্চনদাকে লেকচারার হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল। এখানে কারুর কোনো কন্ট্রোল ছিল কি? দিদির কি সিঞ্চনদার অনারে বলা উচিত ছিল – 'না সিঞ্চন, তুমি পাওনি টেনিওর ট্র্যাক, আমিও নেব না এই চাকরি।' কী মনে হয়? ওরা সংসার করবে, ওদের সন্তান আসবে! একজন টেনিওর ট্র্যাক পেলে কতটা আর্থিক সুবিধে হয় সেটা কি ওরা জানত না? জানত! তাই দুজনে মিলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওরা। দিদি একটু ডমিনেটিং – সেটা একটা এক্সেপশনাল সিচুয়েশন। বেশীরভাগ জায়গায় এখন মিউচুয়াল কোএগ্জিস্ট্যান্সের পথই স্বামী-স্ত্রীরা বেছে নেয়।

বিপ্রদীপ: আমার মনে হয় তুই যেটা বলছিস তোর দিদির এটা করা উচিত ছিল। বলা উচিত ছিল – 'তুমি পাওনি, আমিও নেব না।'

উচ্ছল: সেটা যার যার পার্সোনাল চয়েস। যেখানে দিদি আর সিঞ্চনদা মেনে নিয়েছে, সেখানে আমি-তুমি বলার কে?

চম্পক: উচ্ছল, ফার্স্ট অফ অল, তোর দিদিকে অতটা পড়তে হ'লই বা কেন? মিনিমাম পড়লে কি না খেয়ে থাকত ওরা? ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবার মানে এই নয় যে ম্যাক্সিমাম পাবার চেষ্টা করতে হবে!

উচ্ছল: আগে মেয়েরা এরকম স্যাক্রিফাইস অনেক করেছে। বরের জন্য নিজের পড়াশুনো ইনকমপ্লিট রেখে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছে, বরের জন্য নিজের চাকরিকে স্যাক্রিফাইস করেছে। অনেকে আবার করেওনি। অনেকে স্যাক্রিফাইস করেও বরের কাছে সম্মান পায়নি। অনেকে আবার না করেও পেয়েছে। মোদ্দা কথা, আমরা ছেলেরা যদি ম্যাক্সিমামটা পাবার চেষ্টা করি, তাহলে মেয়েরাই বা কেন করবে না!

চম্পক: ম্যাক্সিমামটা? কটা মেয়ের এই কেপেবিলিটি রয়েছে? আমি নাহয় সব মেনে নিলাম। ছেলে আর মেয়ে সমান সমান, ছেলের আর মেয়ের একই ব্রেন ইত্যাদি। তাহলে আমাকে বল স্টেট বা ন্যাশনাল বোর্ডের পরীক্ষায় টপের দিকে ছেলের সংখ্যা বেশী না মেয়ের সংখ্যা বেশী! IIT-র পরীক্ষায়, জয়েন্টের পরীক্ষায়, মেডিক্যাল বোর্ডের পরীক্ষায়, পাবলিক সার্ভিসের পরীক্ষায় কারা বেশী – ছেলেরা না মেয়েরা?

উচ্ছল: (হেসে) ওই যে বলে না? জগদ্দল পাথর? এতগুলো সেঞ্চুরির জগদ্দল পাথরকে কি মাত্র দুটো সেঞ্চুরিতে ঠেলে সরানো সহজ? সময় লাগবে! তুমি দেখো না যে যে পরীক্ষাগুলোর নাম করলে, সেগুলোতে অ্যাপিয়ারেন্স কীরকম? ক'টা ছেলে এই পরীক্ষাগুলো দিচ্ছে আর কটা মেয়ে এই পরীক্ষাগুলো দিচ্ছে। দেখবে প্রত্যেকটা কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় ছেলের সংখ্যা অনেক বেশী। তুমি অ্যাবসোলিউট নম্বরে না গিয়ে পার্সেন্টেজটা দেখো, চম্পকদা, তারপর আমাকে বলো। আমার তো মনে হয় সাকসেস পার্সেন্টেজ যদি ক্যালকুলেট করো উইথ অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাজ দ্য ডিনোমিনেটর, তাহলে ছেলে আর মেয়ের বেলায় খুব একটা তফাৎ হবে না।

বিপ্রদীপ: আচ্ছা ধরে নিলাম পার্সেন্টেজ একই, একদিন হয়তো ডিনোমিনেটরটাও মোর অর লেস এক হয়ে গেল। তারপর? তাহলে কি সব সমস্যার সমাধান (হাসি)?

উচ্ছল: সমাধান কিনা জানি না, আমাদের সামনে কোনো উদাহরণ তো নেই! ওয়েস্টার্ন দেশগুলোই এখনো পর্যন্ত ডিনোমিনেটরটাকে এক বানাতে পারেনি। সেখানে আমরা তো আরও অনেকটাই পেছনে! আর সমস্যার সমাধান যদি বলো তো, ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টিই করেছেন মানুষের জীবনে সমস্যা আনবার জন্য। তাই যতদিন এই মানবজাতি থাকবে, ততদিন সমস্যা থাকবে।

চম্পক: এত কিছু করে যদি সমস্যা থেকেই গেল, তাহলে এত ইকোয়ালিটির খেলা খেলে কী হবে (হাসি)?

উচ্ছল: (হেসে) চম্পকদা, সমস্যা থাকা মানে সেই এক সমস্যাই থেকে গেল, তা কিন্তু নয়, অনেকরকম সমস্যা রয়েছে! এক সেট অফ সমস্যার সমাধান হয়তো আমরা এই প্রজন্ম করলাম, কিন্তু পরের প্রজন্মকে হয়তো সম্পূর্ণ অন্যরকম সমস্যা সামলাতে হবে। আমরা যে কোভিড দেখেছি, আমাদের থেকে

চার পুরুষ আগের লোকেরা দেখেছে কি? কিন্তু আমাদের তো দেখতে হ'ল! তার সমাধানের জন্য খাটতেও হ'ল | সেই সমাধানের কাজে মেয়ে বিজ্ঞানীদের অবদান কিছু কম ছিল না | কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে, আমরা যে জিনিসটার জন্য লড়ে যাব, তা হ'ল ফেয়ারনেস! একজন সাদা লোক যদি দেশের রাষ্ট্রপতি হতে পারে, একজন কালো লোকও পারবে | একজন ব্রাহ্মণ যদি পুজোআচ্চা করতে পারে, একজন শূদ্রও পারবে | একটি ছেলে যদি উপবীত ধারণ করে বিয়ের মন্ত্র পড়াতে পারে, একটি মেয়েও পারবে | এই ধরনের ফেয়ারনেসের দিকে আমাদের মন দিতে হবে এবং সেই চেষ্টাই মানবজাতি করছে | একজনের স্যাক্রিফাইসের মূল্যে আরেকজনের সাকসেস পাওয়ার থেকেও বড় হ'ল পারস্পরিক স্যাক্রিফাইসের মধ্যে দিয়ে একে অপরের পাশে দাঁড়ানো |

চম্পক: তুই কি বলতে চাইছিস ছেলে আর মেয়ে সবদিক দিয়ে একদিন ইকুয়াল হয়ে যাবে?

উচ্ছল: চম্পকদা, ছেলে আর মেয়ের বেসিক বায়োলোজিতেই যেখানে তফাৎ রয়েছে, সেখানে তো আর সবদিক দিয়ে তারা সমান হতে পারে না! কিন্তু যেটা ইম্পরট্যান্ট, তা হ'ল মানব ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ | একটি ছেলে যে দেশের, জাতির, বর্ণের, আর্থিক ক্ষমতার হোক না কেন, তার যেটুকু ক্ষমতা তাকে সেই ক্ষমতার পুরো রিয়্যালাইজেশনের সুযোগ দিতে হবে | তেমনি একটি মেয়ে, সে যে দেশের, বর্ণের, জাতির, বা আর্থিক ক্ষমতার হোক, তাকেও তার সেই ক্ষমতার পূর্ণ রিয়্যালাইজেশনের সুযোগ দিতে হবে | একেই বলে মানব ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ | কিন্তু সেই ক্ষমতা একটি ছেলের বা মেয়ের একই জিনিসের ব্যাপারে নাও হতে পারে | একটি ছেলের হয়তো একটা রেডিওর নাটবল্টু খুলে ফেলে আবার নতুন করে জুড়ে জুড়ে বানাতে ভালো লাগে, সেটা তার ইনবর্ন ভালো লাগা হতে পারে | তেমনি একটি মেয়ের হয়তো একটা আলপনা দেখে নিজের মনের মতো কোনো ইমাজিনেশন দিয়ে নতুন আলপনা বানাতে ইচ্ছে করবে – সেটা তার ইনবর্ন ভালো লাগা | কিন্তু আজ সেই মেয়েটিকে দমিয়ে রাখলে তার এই আলপনার ইমাজিনেশন বাস্তবায়িত হবে না | মানব ক্ষমতার পূর্ণবিকাশও হবে না | আজ থেকে আরও একশো বছর বাদে যদি ডিনোমিনেটর দুটো এক হয়ে যায়, তখনও এই তফাৎগুলো হয়তো থেকে যাবে | তার মানে এই নয় যে এরকম কোনও মেয়ে নেই যার রেডিওর নাটবল্টু নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালো লাগে না, আর এরকম কোনো ছেলে নেই যার আলপনা নিয়ে ইমাজিন করতে ভালো লাগে না | ওই রেয়ার একসেপশন ছেলে বা মেয়েটিকেও কিন্তু তার ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিতে হবে | কিন্তু তাদের পারসেন্টেজ কম | সেজন্য সেঞ্চুরি আফটার সেঞ্চুরি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কিছু কিছু তফাৎ থেকেই যাবে | আমাদের তা মেনেও নিতে হবে |

(সবাই চুপ | প্রত্যেকেই যেন কিছু একটা ভাবছে | এমন সময় নভোনীল কথা বলে উঠল)

নভোনীল: (হেসে) কী চম্পকদা, বিপ্রদীপদা, কিছু বলো! উচ্ছলদা কত কী বলে গেল! নিসর্গদা, তোমার কী মনে হয়!

নিসর্গ: (হেসে) মনে হয় জব্বর প্যাঁচে পড়েছে বিপ্রদীপদা আর চম্পক! কী বলবে বুঝতে পারছে না |

উচ্ছল: না না, কাউকে প্যাঁচে ফেলা আমার উদ্দেশ্য নয় | এটা কোনো লড়াইও নয় যে কাউকে জিততে বা হারতে হবে | আসল কথা হ'ল আমাদের এই হিউম্যান সিভিলাইজেশন জিতল না হারল!

বিপ্রদীপ: (হেসে) আচ্ছা আচ্ছা, কারুর জেতা বা হারাটা উদ্দেশ্য না হলেও আমার বা চম্পকের যে চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা – তার তো মনে হয় হার হয়েছে | জয় হয়েছে সেই চিন্তাধারার যা মানুষে মানুষে সমতার কথা বলে | সত্যি বলছি, যখন থেকে উচ্ছল আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে যে আমিও এক মেয়ের বাবা? তখন থেকেই আমার সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে | বারবার মিল্টির মুখটাই মনে পড়ছে | আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছি উচ্ছলকে কাউন্টার করবার, কিন্তু বলতে বাধা নেই আমার মনের একটা দিক চাইছিল উচ্ছল যাতে জিতে যায়! কী চম্পক, ঠিক বলিনি?

চম্পক: হুঁ |

উচ্ছল: আসলে চম্পকদা, তোমাকে মেয়ের বাবা হবার দরকার নেই | তোমার ওই হাইপথেটিক্যাল সিচুয়েশনে যাবারই দরকার নেই | একবার চোখ বুজে মনে মনে চিন্তা করো এই পৃথিবীতে যাদের তুমি ভালোবাস, তাদের মধ্যে কি কোনো মেয়ে নেই? সেই ভালো লাগার মেয়েটি – যে তোমার মা হতে পারে, বোন হতে পারে, মাসি-পিসি-কাকি-জ্যেঠি-ঠাকুমা-দিদা-ভাগ্নী-ভাইঝি

– অনেক কিছুই হতে পারে | তাকে গিয়ে তুমি কি এসব কথা, যা আজকের গ্যাদারিংএ বলেছ, বলে উঠতে পারবে?

চম্পক: (কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে) ওহ, এরকম করে বললে চলবে নাকি? আর কাউকে পেলি না (হাসি)? শেষমেশ আমার দিদাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া? আমার দিদা এই পৃথিবীতে আমার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেভারিট মানুষ! বুড়ি এই অষ্টআশি বছর বয়সেও অ্যাক্টিভ! তাকে গিয়ে এসব বলবার আগে আমি বোধহয় দুবার হোঁচট খাব | এটা জিত বা হার না হলেও আমি হার স্বীকার করছি, উচ্ছল! ব্র্যাভো! আমি দেখব পুচকু একটু বড় হলে যদি ঈশানী আবার কোনো কাজে জয়েন করতে পারে | সত্যি, আমাদের চিন্তাভাবনার অনেক রিভিশন দরকার |

বিপ্রদীপ: আমি যখন সকাল সকাল বেরোই, তখন নীপশ্রী রীতিমতো সবকিছু রেডি করে দিয়ে আমাকে পাঠায় অফিসে | তারপর নিজে রেডি হয়ে যায় হাসপাতালে সার্জারি করতে | আমিও এখন থেকে দেখব নীপশ্রী যখন অতগুলো অপারেশন করে ফেরে তখন যাতে আমি তার দিকে ভাতের থালাটা এগিয়ে দিতে পারি |

নভোনীল: গুড! তাহলে আমাদের যে নতুন বর হতে চলেছে, সেই নিসর্গদার খাতিরে এতক্ষণ ধরে যা যা বললে উচ্ছলদা, তা যদি একটু সামারাইজ করে দাও |

উচ্ছল: (হেসে) নিশ্চয়ই | আসলে নারী এবং পুরুষের ব্যাপারটা এতটাই বিরাট যে আমরা এরকম দশটা গ্যাদারিং করলেও বলে শেষ করে উঠতে পারব না | সেজন্য আমাদের ডিসকাশনের পরিধি খুব সীমিত | আমরা এখানে এসেছিলাম নিসর্গর আগামী শুভবিবাহ উপলক্ষ্যে এবং আমাদের এই অত্যন্ত আরবান এডুকেটেড সোসাইটিতে এরকম একটা আরবান এডুকেটেড জুটি কীভাবে সবদিকে ব্যালেন্স রক্ষা করতে পারবে তাই নিয়েই কিছু কথাবার্তা বলতে | একটাই তো জীবন! তাই, সেখানে কারুর স্যাক্রিফাইসটাই যেন এত বেশী মাত্রায় হয়ে না যায় যেখানে অন্যজন একটা আনডিউ অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যায় | যখন ব্যাপারটা পরিচয় বা প্রেমের স্তরে থাকবে, তখন থেকেই গ্রাউন্ডওয়ার্ক করে রাখতে হবে | বিয়ে হলে কোথায় থাকতে হবে, সেক্ষেত্রে কোনো একজন একটু বেশী অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাচ্ছে কিনা দেখতে হবে | যদি দেখা যায় যে মেয়েটিকে এসে ছেলেটির বাড়িতে উঠতে হচ্ছে, তখন মেয়েটিকে সেই বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের ব্যাপারে ভালো করে ওয়াকিবহাল করে রাখতে হবে | তাদেরও মেয়েটির সম্পর্কে আগেভাগে জানিয়ে রাখতে হবে | আর দুজনে মিলে যদি নতুন কোনো জায়গায় সংসার পাততে হয়, তাহলে দেখতে হবে যাতে দুজনে মিলে সেই সংসারে ইকুয়ালি কন্ট্রিবিউট করে – সে টাকাপয়সা দিয়ে হোক বা সংসারের নানান কাজকর্ম দিয়েই হোক | কোনো কাজেই লিঙ্গভেদ রাখার দরকার নেই | কোনো বাড়িতে হয়তো স্ত্রী রান্না করবে, স্বামী বাসন মাজবে; কোনো বাড়িতে আবার স্বামী রান্না করবে, স্ত্রী বাসন মাজবে – যে বাড়ির যা নিয়ম ঠিক করা হবে | কাউকে যেন অন্যজনের জন্য চাকরি বা হবি ছাড়তে না হয় | আর তা যদি হয়ও, সেটা যেন হয় খুবই সাময়িক | একবার সংসারে বাচ্চা এসে গেলে তাকে মানুষ করার ভারও দুজনেরই হওয়া উচিত | অফিসে প্রজেক্ট সামলেও বাচ্চার ন্যাপি পাল্টানো যায় – সে স্বামী হোক বা স্ত্রী হোক | দুজনকেই বাচ্চার ব্যাপারে সবরকম দায়িত্ব নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে | একটা দু'বছরের বাচ্চাকে একজনের কেয়ারে রেখে অন্যজনকে দু-তিনদিনের জন্য কোনো কনফারেন্স বা অফিসিয়াল ট্যুরে যেতে হতেই পারে | তখন অন্যজনকে কিন্তু ওই দু-তিনদিন বাচ্চার সব দায়িত্ব নিতে হবে | ছুটি নিতে পারলে ভালো, নাহলে উপযুক্ত ডেকেয়ারের ব্যাপারে আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রাখতে হবে | কারুরই অন্যজনের ব্যাপারে হাই এক্সপেক্টেশন রাখা চলবে না | মনে রাখতে হবে সবাই রক্তমাংসের মানুষ, ভগবান নয় | একজন পরিশ্রান্ত হলে অন্যজনকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে | দুজনেরই হয়তো কিছু কিছু লিমিটেশন থাকবে | অন্যজনকে চেষ্টা করতে হবে সেসব সামলে নেবার | অর্থাৎ একজন আরেকজনের পরিপূরক হতে হবে – একজন আরেকজনকে কমপ্লিমেন্ট করতে হবে | একজনের সামনে বড় কোনো সুযোগ এলে অন্যজনকে দেখতে হবে খুব সাংঘাতিক স্যাক্রিফাইস না করেও কী করে তাকে সেই সুযোগ নেবার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় | ব্যস, এটুকুই মোটামুটি বলবার ছিল | (হেসে) এ সবকিছুই আমাদের জানা, তবে মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নেওয়াও ভালো | আমি আর নৈঋতা মাঝে মাঝে সে চেষ্টাও করি | অনেক বড় বড় কথা বলে ফেললাম, কিন্তু নৈঋতাকে নিয়ে যখন আমার জার্নি শুরু হবে, তখন দেখা যাবে এসব বাস্তবে পালন করতে পারছি কিনা!

তখনই বোঝা যাবে কত ধানে কত চাল।

নিসর্গ: নৈঋতা মানে আই এস আই-এর নতুন ফ্যাকাল্টি ডঃ নৈঋতা বাগচী তো? যে দু বছর হ'ল জয়েন করেছে!

উচ্ছল: (হেসে) হ্যাঁ, তুমি কী করে জানলে?

নিসর্গ: আমাদের পাড়ার মেয়ে! আমার থেকে দু'বছরের ছোট বোন নিশির ক্লাসমেট! গ্রেট! সী, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ সো স্মল!

নভোনীল: (হেসে) তাহলে শিগগিরই আরেকটা ব্যাচেলর পার্টির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কবে বিয়ে?

উচ্ছল: এটা তো সেপ্টেম্বর, মানে ভাদ্র। অগ্রহায়ণ পড়লেই বিয়ে। আর নিসর্গ, তোমার তো আশ্বিনে, তাই না?

নিসর্গ: হ্যাঁ, পুজোর ঠিক আগেই।

চম্পক: গুড, কংগ্রাচুলেশন্স টু বোথ অফ ইউ!

বিপ্রদীপ, নভোনীল: ইয়েস, ইয়েস, কংগ্রাচুলেশন্স!

নিসর্গ: থ্যাংক ইউ!

উচ্ছল: থ্যাংক ইউ!

নভোনীল: এবং লাস্টে উচ্ছলদার এই দারুণ স্পীচের জন্য জোরে হাততালি।

(সকলে হাততালি দেয়।)

নভোনীল: নাও গাইজ, ডিনার ইজ রেডি। কাম অ্যান্ড হেল্প ইওরসেল্ফ প্লিজ।



আরো কিছু স্মৃতি

স্যমন্তক দত্ত

আমার জন্মদিনের মৃত্যু

অনেক যুগ আগে, আমি তখন শান্তিনিকেতনে পাঠভবন ইস্কুলে বোধহয় ক্লাস এইটে পড়ি। খেলার পিরিয়ড চলছিল; ছেলেরা নীল প্যান্ট, সাদা শার্ট। মেয়েরা নীল স্কার্ট আর সাদা ব্লাউজ। হঠাৎ আমাকে কেউ একজন ডাকল। দেখি আমার সামনে আমার ক্লাসের কল্পনা নায়েক, আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে কাউকে বলছে, "এইটা – এইটা, এইটা স্যমন্তক।" ফিরে দেখি একজন, আমার এক ক্লাস সিনিয়ার, রীতা হুই। সবসময় হাসি হাসি মুখ। সেদিনও সে হেসে বলল, "তুই আমার সহ-সম্পাদক হবি?" কিচ্ছু না বুঝে আমি বলে দিলাম 'হ্যাঁ'। কীসের সম্পাদক, কেন সম্পাদক কিছুই জানি না।

সেইক্ষণ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রীতাদি ক্রমে ক্রমে আমার দিদি, আমার মা, আমার বান্ধবী, আমার সঙ্গিনী, আমার পরামর্শদাতা, আমার গল্প করার বন্ধু হয়ে গেল। রোজ খেলার মাঠ সেরে ওর সাথে হাঁটতে হাঁটতে ওকে শ্রীসদনে পৌঁছে দিয়ে আমি সাইকেলে বাড়ি ফিরতাম।

আজও মনে পড়ে সেবা বিভাগের কাজে ক্যানাল টপকে দূর গ্রাম থেকে সন্ধ্যেবেলা একদল ছাত্রছাত্রী ফিরছি। অনেক ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমি কিন্তু রীতাদির পাশে। কোন কথা নেই। শুধু পাশে পাশে। অন্ধকার গ্রাম, দাওয়ায় মিটমিটে লণ্ঠন, খড়ের ঘরের ভেতর খকখক কাশির আওয়াজ, আকাশে চাঁদ, ঠাণ্ডা হাওয়া, খালি পা। গরুর গাড়ির রাস্তার নরম ধুলো আঙুলের ফাঁকে পাউডারের মতো ঢুকছে। অনেক পথ একসঙ্গে হেঁটে আশ্রমে পৌঁছালাম।

অল্প বয়সে কিছু বুঝতাম না, কিন্তু একটা নিরাপত্তা বোধ হতো। শান্তিনিকেতন আমাকে বহু জিনিসের মধ্যে রীতাদিকেও দিয়েছিল। সেই ছেলে বয়স থেকে এই মাতৃরূপিণী দিদি প্রতি বছর আমাকে রাখী পরাত, আমার জন্মদিনে স্নেহাশিস জানাত। তারপর আমি চলে গেলাম দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে এয়ারফোর্সে। তবুও ছুটিছাটায় শান্তিনিকেতনে যেতাম। সেই সময় রীতাদির সব সমস্যার কথা আমাকে ধৈর্য ধরে শুনতে

হতো | কোন ছেলে ওকে বিব্রত করে, ওর দিদির বাড়ি ছিল 'নোয়ামুন্ডি কোলিয়ারি'-তে | সেখানে গিয়ে নাকি রোজ জঙ্গলের ছবি আঁকতে হয় | এইরকম সব কথা | এরপর রীতাদির বিয়ে হ'ল | শ্বশুরবাড়ি জামশেদপুরে | জীবন চলতে থাকল | রাখী পাঠাবে, কোথায় কোন শহরে আমি আছি কিছুই জানে না; চারিদিকে ফোন করে আমার ঠিকানা জোগাড় করত |

২০২০ সালের কোভিড, জীবনের অনেককিছুই নিয়ে গেল | একদিন আমি তখন উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ে, খবর পেলাম রীতাদি আর নেই | মানুষের দুর্ভাগ্য এমনই যে জীবন তার প্যাঁটরাভরা স্মৃতি সঙ্গে রাখে, আলাদা করে যে সরিয়ে রাখব তার জো নেই | ছোটখাটো কত কি আজও মনে পড়ে!

গোমাংস ও আদি সনাতন ধর্ম

আমি ইচ্ছে করলে আর প্রয়োজন পড়লে গরু খাই | একথা লিখেছিলাম | তাতে অনেকেই কান্নার ইমোজি পাঠিয়েছেন | তাদের জন্য আমি বলতে চাই যে বৈদিক সনাতন ধর্মে পুরুষ গরুর মাংস (বৃষের মাংস) ভক্ষণে কোন অপরাধ ছিল না | যেহেতু সনাতন ধর্ম একটা চির পরিবর্তনশীল বিবর্তিত চিন্তা, যেহেতু গঙ্গা উপত্যকায় গরুর অর্থনীতি অতি মূল্যবান ছিল – সেইহেতু অতি শীঘ্রই গরু রক্ষার জন্য গোমাংস ভক্ষণ অধার্মিক বলে বিবেচনা করা হয় | সেই থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এটি শক্ত হাতে প্রচার করতে থাকে | এর ফল অতি বিপদজনক হয় | ভারতে মুসলমান আক্রমণ দ্রুত করতে সুবিধা হয় | ইতিহাসে লেখা আছে যে মহম্মদ ঘোরীর মতো জঘন্য আতঙ্কবাদী এই কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে তাদের সেনা বাহিনীর সম্মুখে হাজার হাজার গরু নিয়ে ভারত আক্রমণ করত | হিন্দু রাজারা গোমাতা রক্ষা করতে গিয়ে পরাজিত হতেন | এই কুসংস্কারের জন্য ভারত কতই না রক্তদান করেছে! আসলে উপনিষদে লেখা আছে যে বলবান হতে গেলে ষাঁড়ের মাংস ভক্ষণ জরুরি |

আপনারা গুগুলে দেখবেন বৃহদারণ্য উপনিষদের ছয় নম্বর চ্যাপ্টারে চার নম্বর সেকশনে আঠারো নম্বর শ্লোকে কী বলা আছে – "যে ব্যক্তি সাহসী-শক্তিশালী-বুদ্ধিমান সন্তান চায় সে যেন মোষের মাংস চালের সঙ্গে সেদ্ধ করে ঘি দিয়ে খায় |"

Here I quote – Brihadaranya Upanishad Chapter 6. Section 4. Shloka 18. 6.4.18 "He who wishes that a son should be born to him who would be a reputed scholar, frequenting the assemblies and speaking delightful words, would study all the Vedas and attain a full term of life, should have rice cooked with the meat of a vigorous bull or one more advanced in years, and he and his wife should eat it with clarified butter. Then they would be able to produce such a son."

দুগ্ধ উৎপাদনকারী গোমাংস খেলে চলবে না | লেখা আছে Bull, গরুর মাংস নয় | কারণ সে দুধ উৎপন্ন করতে সক্ষম | কিন্তু তাছাড়া সকল মাংস খাদ্য | এবিষয়ে কান্নার কিছু নেই |

আমরা হিন্দুরা এক বিশাল যুদ্ধের সামনে এগিয়ে চলেছি | আমদের শরীর মন তৈরি রাখতে হবে | পশ্চিম বাংলার পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে যুদ্ধ হবে | বিশ্বে ভারত একমাত্র সনাতন ধর্ম; তাকে রক্ষা করতেই হবে | এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বিশাল | আমেরিকা, সৌদি আরব – সবাইয়ের বিরুদ্ধে | আমাদের নিজেদের রক্ষা নিজেদেরই করতে হবে | ন্যাকা হয়ে থাকলে চলবে না | লড়াইয়ের জন্য তৈরি হোন |

রান্না

আমাদের ছেলেবয়সে রান্না হতো কয়লার উনুনে | উঠোনের কোণে কয়লার স্তূপ, সেখানে মাটিতে বসে কয়লা ভাঙো, এককোণে শিল নোড়াতে মশলা বাটো, এরপর বড় বঁটিতে মাছ কাটো | মা, মাসিরা শাড়ি/ন্যাকড়া দিয়ে ধরে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ফ্যান ঢালতেন | জীবনযাত্রা মুশকিল ছিল ঠিকই কিন্তু রান্নার স্বাদ ভালো ছিল | মা/মাসিদের স্বাস্থ্য ভালো ছিল, অবশ্য কাজের মানুষ মিলত |

আজকাল সবকিছুই বাজার থেকে রেডিমেড কেনা যায় | মাছ কাটা, কিছু কিছু সবজিও (ডাঁটা, শাক, থোড়, এঁচোড় ইত্যাদি) প্রয়োজনমতো কাটা, মশলার গুঁড়ো, পোস্ত গুঁড়ো সবই সহজে পাওয়া যায় | আর উনুনের তো কথাই নেই – গরম, বেশী গরম, কম গরম, কী না হয়! সবজি কুঁচো করার মেশিনও আছে | বঁটি ব্যাপারটা গৃহস্থের ঘরে আর নেই | বাজারে অঙ্কুরিত ছোলাও কেনা যায়! এর ওপরে আবার ইউ টিউব (You Tube) আছে | পোস্ততে ধনে, জিরে দেবে নাকি শুধু হলুদ তাও দেখিয়ে দেবে | ফলে মা/মাসি/মেয়েদের সময় অঢেল | কেউ

কেউ, যেমন আমার স্ত্রী একটা 'কুইক কুকিং কোর্স' (QCC) চালান, ৫০ মিনিটে দুপুরের রান্না শেষ | বাকি সময় যা ইচ্ছে করো |

তাই আমি ভেবে দেখলাম যে শাক/সবজি/মাছ রান্না – এগুলো জলভাত | শিখে লাভ নেই | একমাত্র কঠিন রান্না হ'ল গোল ফুলকো, হাতে গড়া আটার রুটি | ক'দিন ধরে সেই নিয়েই লড়ে যাচ্ছি | খুব অল্প সংখ্যক সংসারী পুরুষ আছে, যারা চটপট ফুলকো রুটি বানাতে পারদর্শী | আস্তে আস্তে আমিও এক্সপার্ট হয়ে উঠছি | নিচের ছবিতে এই উন্নতির প্রমাণ রইল |



দৈনন্দিন

কলকাতায় সকাল সকাল বাজারে যাতায়াত করাটা আমার সাংসারিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ত | অন্তত চারবার তো যেতামই; মাছ কিনলাম, কিন্তু শাশুড়ির পছন্দ হ'ল না | বদলে আনলাম | সব শেষে আরো কিছু ভুলে যাওয়া মশলাপত্তর নিয়ে, দিনে মোটামুটি চারবার যাতায়াত |

রাস্তায় পড়ত রাধুবাবুর চায়ের দোকান | সাত সকাল থেকে দুপুর বারোটা অবধি, আবার বিকেল সাড়ে চারটে থেকে রাত অবধি | লক্ষ লক্ষ চা আর সঙ্গে মামলেট, মাটন স্যুপ খেতো লোকে | সকালে নইলে বিকেলে একজন পড়ন্ত যৌবনা সিনেমার নায়িকা, বাংলা গায়ক থাকবেই থাকবে | ব্যস্ত আমি হনহন করে যেতে যেতে ভাবতাম – লোকগুলোর কোন কাজ নেই নাকি! ইউসলেস বাঙালির দল!

তারপর জীবন বদলাল | গুরগাঁও-এ এলাম | স্ত্রী গত হলেন, বাড়িটা খালি লাগছে | নাতনির দল বিদেশ বিভূঁইয়ে | একাকিত্ব জিনিষটা আমার নেই বললেই চলে | আমি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে পারি | তবু...

এই সময় দেখা পেলাম Senior Citizen Club (SCC) | একটা দোতলার ঘরে বিকেলে দু'ঘন্টা আড্ডা | আজ প্রায় এই SCC-র ওপরেই ২০/২২ জন বুড়োর মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভরশীল | সময়টা যে কীভাবে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে বুঝিনি |

পুরাতনী

আমরা যারা প্রায় বাবরের যুগ থেকে পাঠভবন শান্তিনিকেতনে বড় হয়েছি তারা হয়তো ভুলিনি অবনীন্দ্রনাথের 'হংসনামা পালা'র কথা |

আমি যখন আনন্দ পাঠশালায় (preschool) যাই, তখন উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটা বিরাট টিন দিয়ে ঢেকে নন্দন বলে একটা স্টেজ করা হয়েছিল | আমি সেখানে মাটিতে শতরঞ্চির ওপর বসে এই 'হংসনামা পালা' দেখেছিলাম |

অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে বহুদিন | সেই সময় নেতৃত্বে ছিলেন বিরুদা, অবনীন্দ্রনাথের নাতি, আমিতেন্দ্রনাথ | সে ছিল এক অভিজ্ঞতা! হল ঘরে ঢুকতেই ট্যাঁট্যাঁ করে দেশি সানাই আর প্যাঁপোঁ করে হারমোনিয়াম বেজে উঠল | হঠাৎ দর্শকদের পেছন থেকে তাদের ভিড়ের মধ্য থেকেই প্রকাশিত হলেন বিরুদা | গলায় রুমাল, মাথায় টুপি | হাতে ছিল একটা সিল্কের রঙিন রুমাল | সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে নাচতে নাচতে ঢুকতেন | উনি হতেন 'বংশীবদন অধিকারী' যাত্রা পালার ম্যানেজার | গান গাইতেন "কলাভবনের যাত্রা সদনের বংশীবদন অধিকারী" | ব্যাঞ্জো মাস্টার...(ভুলে গেছি) |

উনি ঢুকলেন মানেই দর্শকের মধ্যে হৈহৈ পড়ে গেল | জোরে জোরে দামামা বাজতে শুরু করল | হারমোনিয়াম দ্রুত হতো | আমরা ছোটরা দাঁড়িয়ে উঠতাম |

শুনেছি অমর্ত্য সেন নাকি একবার এই পালায় এক নারীর ভূমিকায় শাড়ি পরে নাচতে নাচতে স্টেজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন |

সেসব বড় অবিমিশ্র আনন্দের দিন ছিল |



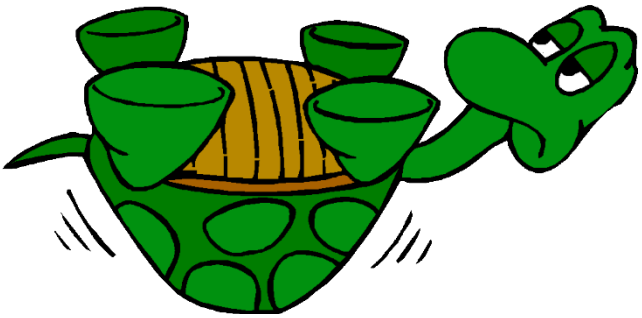
উত্তর

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

বয়সের ভিত্তিতে রিটায়ারমেন্টের গন্ডি পেরোলেও, যতদিন নিজেকে যোগ্য করে রাখতে পারব ততদিন চাকরি করে যাব বলে স্থির করেছি | ২০২১ সালে যে নতুন কম্পানিতে জয়েন করেছি, তার হেড অফিস New Jersey-তে হলেও, হিউস্টনের দুর্গাবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে না বলেই আরও জয়েন করা | মন দিয়ে কাজ করছি, উপভোগ করছি | মাঝে মধ্যে পেনসিলভেনিয়া বা মিসিসিপিতে যেতে হয়, সেটাও গৃহে শান্তি বজায় রাখার জন্য মন্দ লাগে না! প্যান্ডামিকের পর থেকে এখন বেশ কিছু অফিসে হাইব্রিড work culture! আমার কাজ সোমবার আর শুক্রবার WFH – অর্থাৎ Work From Home আর বাকি তিনদিন অফিসে যাওয়া | পৌঁছানোর সময় নিয়েও খুব বাধ্যবাধকতা নেই, তবে আমি চেষ্টা করি সকাল দশটা নাগাদ পৌঁছাতে | বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় একটা মিটিং থাকে, তাই সেদিন অবশ্যই দশটার আগেই অফিসে পৌঁছানোর চেষ্টা করি |

সেদিন বৃহস্পতিবার, বাড়ি থেকে বেরোতেই প্রায় সকাল ন'টা পঁচিশ হয়ে গেল | ট্র্যাফিক ঠিক থাকলে মোটামুটি তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিটে পৌঁছে যাওয়া যায় | তবুও একটু তাড়াতাড়িই যেতে হবে | আমাদের সাব-ডিভিশন ছাড়িয়ে যেই বড় রাস্তা ধরেছি, দেখি রাস্তার ধারে একটি মাঝারি মাপের কচ্ছপ উল্টে পড়ে আছে | গাড়ির গতিতে তাকে ছাড়িয়ে চলে গিয়েই ভাবতে শুরু করেছি, যে কেও না দেখে, না বুঝে তাকে চাপা দিয়ে যেতে পারে | এর আগেও রাস্তায় গাড়িপিষ্ট রক্তাক্ত কচ্ছপ দেখেছি! এদিকে হাতে আর সময় নেই বললেই চলে, আর একটু দেরি হলেই আমার সকাল দশটার মিটিংয়ের আগে অফিসে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব হবে! তবুও, এই অসহায় কচ্ছপের একটু সাহায্যের জন্য পরের U-Turn থেকে গাড়ি ঘোরালাম | অনতিদূরেই এক ট্র্যাফিক পুলিস তার গাড়ি নিয়ে speeding টিকিট দেবে বলে অপেক্ষা করছিল | গাড়ির emergency blinking light জ্বালিয়ে তার কাছে গিয়ে দেখি তিনি মহিলা পুলিস | সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতেই তিনি তাঁর গাড়ি নিয়ে এগোলেন | আমিও আবার গাড়ি ঘুরিয়ে তাঁর গাড়ির পেছনে যেতেই দেখি তিনি অনায়াসে রাস্তার ধারে উল্টে পড়ে থাকা কচ্ছপটিকে সনাক্ত করতে না পেরে তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন! আমি আবার আমার গাড়ির emergency blinking light জ্বালিয়ে সেই কচ্ছপটির সামনে গিয়ে থামলাম | গাড়ি থেকে সাবধানে নেমে কচ্ছপটিকে দুই হাতের তালুবন্দি করে সামনের জলাশয়ে (এখানে যাকে bayou বা বায়ু বলে) ছাড়তে গেলাম | ফিরে এসে দেখি সেই পুলিস অফিসার ততক্ষণে তাঁর গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে এসে রাস্তার ধারে দাঁড় করানো আমার গাড়ির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন | তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে পুনরায় আমার অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম |

বুঝতেই পারছিলাম যে সেই বৃহস্পতিবার আমার আর সকাল দশটার আগে অফিস পৌঁছানো সম্ভব হবে না! দেশে মায়ের সাথে ফোনে কথা বলে ঠিক ন'টা আটান্ন মিনিটে স্মার্ট ফোনের teams মিটিং-এ dial করতে গেলাম | বিস্মিত হয়ে দেখি সেই মিটিং rescheduled হয়ে সকাল এগারোটায় হয়েছে! মনে পড়ল, ও হ্যাঁ তাই তো, গতকালই কেভিনের এই মিটিং rescheduled করা ইমেইল পেয়েছিলাম বটে | গতকাল কারণটা বুঝতে পারিনি, তার উত্তর মিলল তখন!



অর্ধেক আকাশ

বিষ্ণুপ্রিয়া

সকাল সকাল প্রথমে গানটি এল হোয়াটস্অ্যাপে | তারপর থেকে কথাগুলো মাথার মধ্যে লুপে ঘুরছে তো ঘুরছেই | এই সময় দেবীপক্ষের কাশ-শিউলি ভাইবের হাতছানি অগ্রাহ্য করা অসম্ভব | আসলে এ হচ্ছে বাঙালির ফিয়েস্টা~কার্নিভাল টাইম, তা সে অ্যালাস্কা বা অ্যানটার্কটিকা যেখানেই হোক না কেন, সে একই ব্যাপার | দুর্গাভাব বাঙালি মনের অতলে সারাবছর গুটিশুটি মেরে চুপটি করে শরতের অপেক্ষায় বসে থাকে | তারপর ঠিক এই সময়টিতে চনমনে হয়ে ওঠে |

যদিও উত্তরপূর্ব যুক্তরাষ্ট্র থেকে দুর্গোৎসবের এপিসেন্টার কলকাতা প্রায় ৮৫০০ মাইল দূরত্বে এবং পৌঁছাতেও লাগে অন্তত দিন দুয়েক লেওভার/টেওভার নিয়ে, তবুও এসময় মনে মনে ঢাকের বাদ্যি বাজে অজান্তেই | দ্য ফ্লেভার, দ্য মুড ক্যান্ট বি মিস্ড | তাই অ্যালগো মিলিয়ে ইউটিউব মশগুল হয়ে উঠেছে ওই একই সুরে – দুর্গা তুমি থেমো না অর্ধেক আকাশ তোমার, তুমি ছেড়ো না, ইত্যাদি | সারাদিন মেজাজটাও তাই দোদুল্যমান হয়ে আছে আবেগ আর কাজের নানা রুটিনের চাপের মাঝখানে |

প্রতিবছর এদেশে পুজো আসে পুজোর মতোই | শনি ও রবি জুড়ে অজস্র পুজো নিউ জার্সির নানা শহরের ক্লাবগুলোতে | বেশিরভাগ হয় মিডল বা হাই স্কুলের ক্যাফেটেরিয়া বা অডিটোরিয়ামে | তাই পুজোর আগে পুজো, পুজোর পরেও পুজো, যখন এসব হল খালি পাওয়া যায় তখন | সেইজন্য হয় বিফোর টাইম নয়তো ডিলেইড রেসপন্স | যাইহোক, কলকাতা মুম্বাইয়ের নামী দামি শিল্পীদের আগমন ঘটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে | হ্যাপিমুড জেনারেটার | গানটি তাই গুনগুন করতেই হয় | গানের অভিঘাত কোথায় কী প্রতিক্রিয়া ঘটায় কেউ কি বলতে পারে, ভাবে সম্পূর্ণা |

গত ২২ বছর বিদেশ যাপনের দৌলতে পুজোর কেনাকাটার অনেক রকমফের ঘটেছে পূর্ণার জীবনে | ছোট-বেলায় কী উত্তেজনাই না হতো পুজোর নতুন জুতো জামাকাপড় পেয়ে | বন্ধুদের সাথে রীতিমতো কম্পিটিশন ছিল কার ক'টা জামা হ'ল নিয়ে | এখন ওসব ছেলেমানুষি উত্তেজনা ম্যাটমেটে মনে হয়, সেটাই স্বাভাবিক | তাছাড়া শপিংও অনেকটাই অনলাইনে মাইগ্রেট করেছে | তার সুবিধা যে আছে তা অবশ্য অনস্বীকার্য | কিন্তু সবকিছু কি আর ভার্চুয়ালি উপভোগ করা যায়? তাই এবার পূর্ণার অন্য প্ল্যান | শাড়ি গয়না কেনাকাটা নয়; বরং এক্কেবারে ব্যতিক্রমী আইডিয়া | মধ্যবয়সের দুঃসাহসী খেয়াল-খুশি | একটু অন্যরকম নতুনত্ব | আগামী উইকএন্ড পুজোতে বন্ধুদের একটু অবাক করে দেওয়ার ইচ্ছে | সৌরভকে রাজি করাতে পেরে নিজেই অবাক | এত উদাসীন একজন মানুষকে যে দলে টানতে পারবে ফর এ মিড লাইফ ডেয়ারিং ভেনচার ভাবতেই পারেনি পূর্ণা | যাইহোক, আপাতত তাতে পুজোর উত্তেজনা বেশ কিছুটা বেড়েছে বৈকি |

মা'র এমন প্ল্যান শুনে সোহিনী গ্র্যাড স্কুলের রেসিডেন্স হলে বসে খিলখিল করে হেসে উঠল |

- "উইশ আই ওয়াজ দেয়ার মাম | অ্যাম অলরেডি ক্র্যাকিং আপ ইম্যাজিনিং ইউ অ্যান্ড বাবিন | ক্যান্ট ওয়েট টু সী ইট অ্যাট থ্যাংক্সগিভিং |"

পূর্ণাও গলা মিলিয়ে ফোনের এপাশে হেসে উঠেছে – "পুজো গিফ্ট কি বল!"

- "ইয়া! রাদার অ্যানিভারসারি গিফ্ট বলো | পার্টি শকার!"

- "ওই হ'ল! এত বছর পর বিবাহ বার্ষিকীর কি আর স্পেশাল কিছু থাকে? ওই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড় |"

- "হোয়াট থোড় বড়ি? অ্যাম নট শিওর |"

- "আরে বাবা, তোরা যেমন বলিস না, নো বিগ ডীল? ওরকমই; বৈচিত্র্যহীন... দ্য সেম ওল্ড, সেম ওল্ড |"

- "নো ওয়ে মাম... তাহলে আমায় কেন বলো যে স্টেডি রিলেশনশিপে থেকে ইভেনচুয়ালি বিয়েতে রাজি হতে? ইউ হ্যাভ সাচ কনট্রাডিকটরি আইডিয়াজ মাম! বাবিন ইজ সো মাচ মোর ওপেন অ্যান্ড কনসিস্টেন্ট অ্যান্ড কুল |"

- "ধ্যাৎ! এত তর্ক করতে পারি না তোর সাথে | অত ওপেন হওয়া কিছু কাজের কথা নয় | নৌকো ভেড়াতেই হয় | নোঙর বাঁধতে হয় | সারাক্ষণ ভাসা যায় না সোনাই |"

- "উফ! আবার তোমার যত কমপ্লেক্স মেটাফর | এনিওয়ে, আমাকে তো ভীষণ বকেছিলে তখন | মনে আছে? বাট বেটার লেট দ্যান নেভার মাম | যেখানেই হোক না কেন সুন্দর জিনিস

সব সময় সুন্দর, রাইট?"

- "হ্যাঁ রাইট | তখন অন্যরকম ছিলাম যে | আমরা কত বদলাই রে |"

- "একজ্যাক্টলি | নাথিং ইজ সেট ইন স্টোন | নাথিং ইজ অ্যাবসোলিউট | অ্যাম গ্ল্যাড দো ইউ আর বিকামিং মোর কুল অ্যান্ড নট এ গ্রিঞ্চ |"

- "তাই বলে আমি মোটেই গ্রিঞ্চ না সোনাই | একটুও গ্রাউচ করি না | সে তো তোর বাবিন করে সারাক্ষণ | এনিওয়ে, এবার এলে সামথিং নিউ ফর ইউ | যা এবার পড়াশোনায় মন দে |"

- "দেখলে, কেন আমি তোমায় স্টিক ইন দ্য মাড বলি | সব সময় শুধু পড়া আর পড়াশোনা | উফ! গিভ ইয়োরসেল্ফ এ ব্রেক মাম | আমি এখন জ্যামি পরে এক বাকেট পপকর্ন নিয়ে যাচ্ছি সোররিটি সিস্টার্সদের সাথে বিঞ্জ ওয়াচিং-এ | বাই!"

যাক, সব মেয়েরা মিলে হুলুতে শো দেখছে | ভালই তো | তারই আবার এত গালভরা নাম | কত কিছু যে শুনতে হয়, শিখতে হয় অহরহ!

*****

প্রায় আধঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছে পূর্ণা | সৌরভের দেখা নেই | বাড়ি ফেরার কথা | মেসেজের উত্তরও দেয়নি | কোনো সেন্স অফ আর্জেন্সি নেই | সব ব্যাপারে ঢিলেমি | হচ্ছে হবে টাইপ | অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবার মানেই বা কী তবে? রিস্কেডিউল করতে হবে কিনা কে জানে! ভাল্লাগে না | মায়ের ভাবগতিক বোঝার চেষ্টা করে ওয়ালনাট জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকল পূর্ণার দিকে | সোফার পাশে বসে ল্যাজ নাড়াতে লাগল | হয়তো স্ন্যাকস পাবে না এখন, কারণ মা'র মেজাজ খুব ভালো বোঝে এই অতি স্মার্ট গোল্ডেন রিট্রীভার | কিন্তু আশায় আশায় থাকা ভালো | যদি মা'র মনোভাব পাল্টায় | ওর ভাইটামিনের বাক্সে আসা মিনি ব্লিস্টার প্যাকের গোল্লাগুলোকে একের পর এক বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর চাপ দিয়ে পটাপট ফাটিয়ে চলল পূর্ণা | স্ট্রেসবাস্টার, বোর্ডম, টাইম পাস – কোনটা? নাকি তিনটেই! তারপর বুঝল এবার না বেরোলে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাবে | সৌরভকে ঠিকানাটা আবার টেক্সট করে সোজা ওখানেই চলে আসতে বলে বেরিয়ে পড়ল পূর্ণা |

শিল্পীদের অপেক্ষা করানোটা খুব অসম্মানের ব্যাপার পূর্ণার মতে | অসাধারণ ট্যাটু শিল্পী লরেনজো | অসম্ভব ব্যস্ত | বহু দূর থেকে অনেকেই ওর সূক্ষ্ম রুচির নিদর্শন ধরে রাখতে ছুটে আসে | প্রথম চোখে পড়েছিল অপূর্ব এক প্রজাপতি সোহিনীর ঘাড়ে | তখন সাত পাঁচ না ভেবেই বকেছিল মেয়েকে শরীরে স্থায়ীরূপে আঁকিবুকি করাবার জন্য | এখন ভাবলেই আক্ষেপ হয় | মেয়েরা বড় হলে মা'র সবচেয়ে কাছের বন্ধু হয় | কী যে বোকার মতো কান্ডকারখানা বাঁধিয়ে বসে পূর্ণা মাঝে মাঝে | যাইহোক, এবার প্রচুর কাঠখড় পুড়িয়ে দুজনের জন্য লরেনজোর সাথে এই সিটিং যোগাড় করতে পেরেছে | তাই দেরি করে সুযোগ হাতছাড়া করতে পারবে না পূর্ণা কিছুতেই |

ট্যাটু স্টুডিওতে ঢুকতেই একমাথা ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে একগাল হেসে লরেনজো অভ্যর্থনা জানাল পূর্ণাকে | বলল জরুরি মিটিং আছে বলে সৌরভ আজ আসতে পারবে না | রিস্কেডিউল করেছে | কাল কাজের পর এসে করিয়ে নেবে | ম্যাচিং কাপল ডিজাইন তো জানাই আছে তাই নো প্রবলেম | অবশ্য ক্যাটালগ দেখে আরো অনেক ডিজাইন দেখতে পারে পূর্ণা | সৌরভও একটা নিজের ডিজাইন সাজেস্ট করেছে ইমেলে |

- "Must say he has an eye for details. Was thinking of a damn ornate ink for you. He said you like embellished ones; so, you can take a look, you know. And see if you like the one he drew better. It's a pair of two intricately drawn swans forming an exquisite heart on the wrist. Your man is something girl! But whatever you choose, of course I am cool with either."

অবাক না হয়ে পারছে না পূর্ণা | এতসব ইমেল চালাচালি, ফোনে কথাবার্তা হয়েছে, অথচ তার কিছুই জানে না ও! সারপ্রাইজ ফর পূর্ণা | মাঝে মাঝে সৌরভের শিল্পীসত্ত্বার ঝলক, যা খুব ইনটেন্সলি পূর্ণা দেখতে পায়, তার তুলনা হয় না | কাজের ভিড়ে বেশিরভাগ সময় ওর নান্দনিক মনন চাপা পড়ে থাকে | ওর ওয়াটার কালার আর অয়েল্সের যত্ন তো পূর্ণাই করে | সৌরভ উদাসীন চোখে তাকিয়ে শুধু বলে, "এদেশে না এলেই হতো | যাঁতাকল!"

অদ্ভুত লোক যাহোক সৌরভ! মিটিং-এর খবরটা পূর্ণাকে দেওয়া যেত না? লরেনজোর কাছে শুনতে হ'ল!

আসলে ঘর কা মুরগি ডাল বরাবর | অভিমান হয় একেক সময় যদিও মুড নষ্ট করে কোনো সুরাহা হয়নি গত পঁচিশ বছরে | তদুপরি বউ পুরোনো হলে একেবারে অকেজো হয়ে যায় | তাই রাগ চেপে হাসি মুখে "ও, ওকে" বলে লরেনজোর জাদুর জন্য রেডি হ'ল |

কী অপরূপ হংসযুগল এঁকেছে সৌরভ! ডিজিটালি আঁকা সূক্ষ্ম আলপনা | মুখোমুখি জুটির বিজড়িত মরাল গ্রীবা তৈরি করেছে এক অভিন্ন হৃদয় | শুধু মুগ্ধ বিস্ময়! চোখ ফেরানো যায় না | এক শিল্পীর কল্পনাকে এবার রূপায়িত করবে লরেনজো পূর্ণার বাঁ হাতের কব্জিতে | দুজনের যৌথ শিল্পে পূর্ণার মণিবন্ধ হয়ে উঠবে এক অসামান্য ক্যানভাস | এ হ'ল সৌরভের ইউনিক বিবাহ বার্ষিকী উপহার পূর্ণাকে | ওদের প্রেম আমরণ ধরে রাখার উদ্‌যাপন এই ট্যাটু | ঘরময় হুইটনি হিউস্টনের "I want to dance with somebody, I want to feel the heat with somebody" ছড়িয়ে দিল লরেনজো | স্টুডিওর অ্যাকুস্টিক্সও দারুণ! পার্ফেক্ট অ্যাম্বিয়েন্স |

*****

ডিনার টেবিলে সৌরভের ট্যাটু দেখে যা হবার তাই হ'ল | পূর্ণা প্রথমে থতমত হয়ে থম মেরে বসে থাকল | ভাবতেই পারছে না ডান হাতে কেন এক অত্যন্ত সাবেকি কারুকার্য করা চাবি আঁকিয়ে এসেছে সৌরভ | অবশ্যই নিজের আঁকা | ও তো জানত ম্যাচিং কাপল ডিজাইনের প্ল্যান করা হয়েছিল | লরেনজোও তো তাই বলল | তবে, এসবের মানে কী? তারপর ক্রমাগত হাতা হাতা ডাল ঢেলে পূর্ণা একটা ছোটখাট পুকুর তৈরি করে ফেলল নিজের প্লেটে | দরকার পড়লে তাতে ডুবে যেতে অসুবিধে হবে না |

ট্যাটু যে সারা জীবনের মতো এঁটে থাকবে চামড়ায়, মনে, মাথায়, অন্যের কৌতূহলে, আলোচনায় এবং সমালোচনায় তা কে না জানে! বন্ধুবান্ধবের প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে কী করে যে সৌরভের এই চাবি চয়ন বোঝাবে তা ভেবেই মাথা গুলিয়ে গেল | এক তো এই বয়সে ট্যাটু, তারপর আবার কোন গুপ্তধনের সিন্দুক খোলার জন্য এই চাবির প্রয়োজন হয়ে পড়ল তা জানার ঔৎসুক্য সবার হতে বাধ্য | প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতেই হবে | কী যে চলে সৌরভের ওই ইউনিক মস্তিষ্কে, তার নাগাল পাওয়া দুষ্কর | আজ অবধি পায়নি পূর্ণা |

- "টিকিটের নম্বর কী? পাওয়ারবল?"

- "লটারি? কিনিনি তো! কিনি না জানই তো | হার্ড আর্ন্ড ডলারের অপচয় | শিকে ছেঁড়ে না, ছেঁড়েনি | আশা করি না |"

- "তবে?"

- "তবে কী?"

- "ওই অর্নামেন্টাল চাবি কীসের? কোন গুপ্তধনের সন্ধান পেলে শুনি?"

- "Key to the heart, বুঝলে?"

- "কার হার্ট?"

- "আজ অনেক ঝঞ্ঝাট গেছে অফিসে | তারপর বহুক্ষণ ডান হাত ছিল অন্যের কবলে | অনেক রাত হ'ল | চিনচিনে ব্যথাও আছে মাথায় | অ্যাডভিল খেয়েছি | ঘুমিয়ে পড়ো পুপে | কাল হবে |"

সামান্য ঝিলিক খেলে গেল চশমার আড়ালে | এত সূক্ষ্ম যা শুধু পূর্ণার চোখেই ধরা পড়ে | কী হবে কাল? বললেই তো হয় | না-বলা কথার পাহাড় নিয়ে কি রাত কাটে? উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত যে পূর্ণার ঘুম আসতে পারে না সেটা দুজনেই জানে | জানলেই যেন সমস্যার সমাধান হয় | উত্তর পাওয়া যায়? মোটেই না |

*****

ঠিক বেরোনোর মুখে সোহিনীর ফোন এল বলে বেশ কিছুটা দেরি হয়ে গেল | উইকএন্ডের নানা দরকারি অদরকারি কথাবার্তা মেয়ের সাথে না বললে বাবা মা দুজনেরই প্রাণ হাঁসফাঁস করে | তাই যখন পুজো-মন্ডপে পৌঁছাল তখন প্রথম রাউন্ডের অঞ্জলি শেষ | পরেরটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে পূর্ণাকে | সৌরভ যথারীতি হলের বাইরে স্মোক করতে বেরিয়ে গেছে | কোনবারই অঞ্জলি দেয় না, এবারও ব্যতিক্রম হবে না নিশ্চয়ই | নিবিষ্ট মনে অঞ্জলি দিলে মা ঠিক শোনে আকুতি | সোনাই কি শুধু মেধার জোরে চান্স পেয়েছে UMass Boston-এর ডেটা অ্যানালিটিক্সের মাস্টার্স প্রোগ্রামে? মা'র কৃপা ছাড়া হতোই না | আজকাল বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই রীতিমতো মেধাবী | প্রচন্ড প্রতিযোগিতা এবং প্রতিযোগীদের গুরুভাগ দখল করে বসে আছে ভারতীয় ও অন্যান্য এশিয়ান ছেলেমেয়েরা | মেয়ের আগামী দিনগুলো যাতে সর্বাঙ্গ সুন্দর, সুস্থ ও কৃতি হয় সেই প্রার্থনাই করল পূর্ণা | চোখ খুলেই অবাক! পাশে ফুল হাতে দাঁড়িয়ে আছে সৌরভ, ভিড় হালকা হলে মা'র

পায়ে নিবেদন করবে বলে। হ'লটা কী? আবারও চোখে সেই ঝিলিক। ঠোঁটে আলগা হাসি। গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অনুনিতা। অনুনিতার তৃতীয় স্বামী কৌস্তভ কাছেপিঠে নেই। অনুনিতা মিটিমিটি হেসেই আছে। উফ! ওর এই ২৬ ইঞ্চি কোমরে ঢেউ তুলে গায়ে ঢলে পড়ার অভ্যেসটা অত্যন্ত অপছন্দ পূর্ণার। সারা বিশ্বের তৃষ্ণা যেন ওর দুচোখ ছাড়া অন্যত্র বাসা বাঁধার সুযোগ পায়নি। "ফাম ফাটাল!" ঘর ভাঙা-গড়ার নৈপুণ্য রন্ধ্রে রন্ধ্রে। আর পুরুষরাও তেমন, সরু কোমরের প্রেমে হাবুডুবু, আত্মসংযমবিহীন।

এতক্ষণ চোখে পড়েনি। এবার পড়ল। অনুনিতা পারেও বটে! পিঠজুড়ে সর্বসাকুল্যে দুটো ফিনফিনে দড়ি। দেখাই যাচ্ছে না প্রায়। কাঁধ অবধি ছড়ানো হাইলাইটেড্ চুলের তলায় বাঁধা হয়তো। বাকি বিস্তৃত মসৃণ উপত্যকার মধ্যে কী যেন একটা। যত কার্পণ্য শুধু ব্লাউজের বেলায়। শকুন্তলার প্রাচীন কাঁচুলি কালচার ফিরে এসেছে। কিছু দূরে বসে ফল প্রসাদ খাচ্ছে অনুনিতার প্রাক্তন স্বামী পার্থপ্রতিম ও তার বর্তমান স্ত্রী পারমিতা। মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখছে অনুনিতাকে। কৌস্তভের প্রাক্তনী স্বাতীও উপস্থিত জাপানি প্রেমিকের সঙ্গে। ওহ! কী যে অস্বস্তিকর। ওদের অবশ্য কারুরই কোনো বিকার নেই।

হঠাৎ জল খেতে গিয়ে বিষম খেয়ে নিঃশ্বাস আটকে গেল পূর্ণার। চোখ উল্টেটুল্টে একাকার কান্ড! সৌরভ জলের গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে। উদ্বিগ্ন হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে পূর্ণার দিকে। 911 কল করবে কিনা ভাবছে। পুজোর আসন ফেলে ছুটে এসেছেন ওদের অ্যামেচার ঠাকুরমশাই, পলাশ। কৌস্তভ, নীলাদ্রি, দেবাংশুর চোখেমুখে দুশ্চিন্তা। মেয়েরা পেপার টাওয়েল দিয়ে হাওয়া করছে। পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

*****

- "কী হ'ল পুপে? তালা-চাবি কী বলছ? দুঃস্বপ্ন? ঘেমে গেছ তো। জল দেব?"

ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়ে চাদরে পা জড়িয়ে আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিল পূর্ণা। সৌরভ টেনে ধরল।

- "ওগো নীতার পিঠে যে তালা দেখলাম।"

- "কী মুশকিল! রাত তিনটে বাজে পুপে। শেষমেষ নীতার তালার জন্য ঘুমের বারোটা বাজবে? মিউজিয়ামের বিরল স্যাম্পল নিয়ে কথা কাল হবে। আমাদের হোম সিকিউরিটি সিস্টেম অ্যাক্টিভেটেড্ আছে। রিং ক্যামেরা দেখলেই হবে। ভয় নেই। ঘুমিয়ে পড়ো।"

ভালো করে পূর্ণার গায়ে চাদর টেনে পাশ ফিরেই ঘুমিয়ে পড়ল সৌরভ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চিরপরিচিত সেই অতি নিশ্চিন্ত নাক ডাকার মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল।

আগে চোখে পড়েনি কিন্তু চশমা পরতেই দেখতে পেয়েছিল অনুনিতার পিঠের মাঝখানে মাঝারি মাপের হার্টের ট্যাটু এবং তার ঠিক সেন্টারে ছোট্ট নিটোল একখানি তালা! দেখে খাবি খাওয়ার জোগাড় পূর্ণার। জলে বিষম খেয়ে নিঃশ্বাস আটকে যায় যায় অবস্থা। এখনো বুঝতে পারছে না হঠাৎ ওদের সবার একসাথে এত ট্যাটু আঁকাআঁকি কি একেবারেই কাকতালীয়? নাকি সিংক্রোনাইজড? নীতার নিখুঁত হার্টলক ট্যাটুর ডিজাইনই বা কার আঁকা? স্টাইলটা কেমন চেনা চেনা। নাকি মনের ভুল? আশ্চর্য, কিছুই কি দেখেনি সৌরভ! নাকি দেখেও পাত্তা দেবার প্রয়োজন নেই? নাকি এড়িয়ে যেতে চায়? সবই কাল হবে! চোখে যে রহস্যময় ঝিলিক দেখেছিল, আলতো হাসি? তারই বা অর্থ কী? আর ওর হাতের ওই চাবি! ঘুমিয়ে পড়ো বললেই যেন ঘুম আসবে।

সোহিনীকে বললেই বলবে, "মাম স্টপ ওভারথিংকিং। ইটস নট দ্য ডা ভিঞ্চি কোড টু ক্র্যাক। আস্ক বাবিন ইন্সটেড। নো বিগ ডীল।"

ধুর! কিছু বোঝে না সোনাইটা। জিজ্ঞেস করলেই যেন সোজা উত্তর দেবে সৌরভ। চোখের কোণে হাসি খেলিয়ে এমন ক্রেজি কিছু একটা বলে প্রশ্নটা ডিফ্লেক্ট করে দেবে যে আরো ধোঁয়াশায় পড়ে যাবে পূর্ণা। কখনোই ও পেরে ওঠে না সৌরভের সরস হাজির জবাবের সামনে। ওর অর্ধেক আকাশে ছিটেফোঁটা মেঘ থাকবেই। সৌরভের দিকটা ঝকঝকে ঝলমলে।

তাই প্রশ্ন হ'ল কোন হ্রদকমলের চাবিকাঠি হাতে নিয়ে ঘুরছে সৌরভ? হংসমিথুনের নাকি হ্রদকুলুপের? রীতিমতো ট্যাটু ট্রাবল! ধুত্তোর! সুখে থাকলে ভূতে কিলোয়!





বিস্মরণ

আনন্দিতা চৌধুরী

- **"মা**, আমার সবুজ কাঞ্জিভরমটা কোথায়?"

- "সবুজ কাঞ্জিভরম?"

- "আঃ, আগেরবার এসে বিয়েবাড়িতে গেলাম, মাংসের ঝোল পড়ে দাগ লেগে গেল, তোমাকে বললাম কাচিয়ে রাখতে, কোথায় সেটা?"

- "ওহো, লন্ড্রি থেকে আনা হয়নি তো!"

- "এনে রাখোনি? আজ তো লন্ড্রি বন্ধ, আজ আনাও যাবে না! জানো, কাল রাজের কাজিনের বিয়ে, শাশুড়ির দেওয়া ওই শাড়িটা পরে যাব বলেছি ওঁকে, আর তুমি এনে রাখতে পারোনি!"

রিয়ার চেঁচামেচি শুনে অন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সুবীর। মেয়ের গলা বাড়ে – "দেখো বাবা, মা কী কাণ্ড করে! একটা কাজ বলেছিলাম, সেটাও করে রাখতে পারেনি!"

- "তোর মায়ের কথা আর বলিস না, রিয়া! সব কিছুই সে ভুলে মেরে দিচ্ছে। আজ তুই আসবি বলে দু'রকমের মাছ আনলাম, রাজের জন্য পোস্ত, ধোঁকার ডালনা করতে বললাম, সে নাকি কিছুই রেঁধে রাখেনি। সকাল থেকে শুয়ে বসে কাটিয়ে এখন বলছে হোম ডেলিভারি থেকে খাবার আনিয়ে নিতে।"

- "হোম ডেলিভারি! মা, তুমি জানো আমার শ্বশুর বাড়িতে নিরামিষ, সপ্তাহে এই একটা দিন এখানে এসে একটু মাছ খাই। রাজ রাতে আসবে, ও তোমার হাতের বাঙালি নিরামিষ রান্না ভালবাসে। সেটুকুও তুমি করতে পারোনি! রান্না করতেও ভুলে গেছ নাকি?"

বাবা মেয়ের যৌথ শ্লেষের সামনে চুপ করে থাকে সুমনা। স্বামীর থেকে এর চেয়ে অন্যরকম ব্যবহার সে পায়নি কোনোদিন, এখন আর আশাও করে না। রিয়াকেও মানুষ করতে পারল না। সেও কেন তার বাবার মতো, প্রয়াতা ঠাকুমার মতো সুমনাকে যা ইচ্ছে তাই বলে যাওয়াতে কোনো দোষ দেখে না!

সে কেন রান্না করেনি, সে কেন শুয়ে ছিল, এরা কেন জানতে চায় না? তার আজকাল মাথা ঘোরে, শরীর অস্থির লাগে, এরা খেয়াল করে না কেন!

বাবা মেয়ের হাসিঠাট্টা চলতেই থাকে।

- "আরে, কী যে কাণ্ড করে তোর মা আজকাল তুই জানিস না, রিয়া! স্মার্টফোনের ব্যবহার এখনও শিখল না ঠিক করে, অ্যাপ-এ কিছু অর্ডার করতে পারে না, নতুন কিছুই শিখিয়ে উঠতে পারি না। সেদিন মল-এ এস্কেলেটরে উঠতে গিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, জানিস!"

- "সত্যি মা, তুমি এমন গাঁইয়া হয়ে থাকো কেন বলো তো? আমার শাশুড়িকে দেখো, ড্রাইভ করছে, কিটি পার্টিতে যাচ্ছে, এই তো সামনের মাসে ইউরোপে বেড়াতে যাবে দুজনে। তুমি কেন এমন, মা!"

অনেকদিন অনেকবার এই অভিযোগ শুনেছে সুমনা। এড়িয়েই যায়, চুপ করে থাকে। বউয়েরা, মায়েরা চুপ করে থাকলে সংসারে শান্তি থাকে, তার শাশুড়ি বলতেন বারবার। আজ কেন যেন রিয়ার মুখ বেঁকিয়ে ব্যাঙ্গ আর সহ্য হ'ল না। অস্থির শরীরটা কি আজ তার মনটাকেও অস্থির করে তুলেছে?

- "জানিস রিয়া, আমি একবার আমার কলেজের কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বইমেলায় গিয়েছিলাম। তুই কলেজ থেকে ফেরার পর খেতে দিয়ে তারপর বেরিয়েছিলাম, ফিরতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে ছিলাম। বাড়ি ঢুকেই রোজকার মতো গরম চা পাননি তোর বাবা। একদিন – শুধু একদিন গরম চা পাননি। তারপর বোধহয় একমাস আমাকে সেই নিয়ে কথা শুনতে হয়েছে। আর বেরোইনি রে, রিয়া। আর বেরোইনি। তাই আজকাল বেরোতে হলে স্মার্টলি পথ চলতে পারি না।" গুন গুন করে বলতে শুরু করে সুমনা। থমকে যায় রিয়া আর সুবীর। কখনও, কক্ষনও সুমনাকে এভাবে বলতে শোনেনি তো তারা!

- "মনে আছে রিয়া? স্কুল থেকে এসে রোজ তোর খাওয়া ছিল মাছের ঝোল আর ভাত? একদিনও অন্যরকম কিছু চলত না? একদিন আমার খুব শরীর খারাপ, কোনমতে একটু সেদ্ধ ভাত করতে পেরেছিলাম। সেই নিয়ে সন্ধ্যেবেলা তোর বাবার কাছে তুই কত নালিশ করেছিলি ? আর তোর বাবা কী যাচ্ছেতাই কথা শুনিয়েছিল আমাকে?"

- "তুমি সেই কবেকার কথা মনে করে বসে আছ মা? দেখো বাবা, মা ওই সামান্য কথা এতদিন মনে করে রেখে দিয়েছে!"

- "না রে, ভুলতেই তো চেয়েছিলাম। যখন তুই রাজের সঙ্গে তোর সম্পর্কের কথা আমাদের জানালি, বললি যে ওকে বিয়ে

করতে চাস, আমার তখন তোর এতদিনের খাওয়াদাওয়ার অভ্যাসের কথা ভেবে চিন্তা হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, ওদের কিন্তু নিয়ম-কানুন, ওঠা-বসা সব আলাদা, ওরা নিরামিষ খায়, তুই পারবি রোজ নিরামিষ খেয়ে থাকতে? তুই বললি, খাওয়া খাওয়া করো না তো মা, জীবনে মাছ খাওয়াটাই সব নয়। অথচ এই মাছ না রেঁধে দেওয়ার জন্য তোর ছোটবেলায় কথা শুনেছি, আজও কথা শুনলাম। তাই আজকাল আর বুঝতে পারি না রে মা, কোনটা মনে রাখব, কোনটা ভুলে যাব।"

- "তোমার আজ কী হয়েছে সুমনা? এত বকবক করছ কেন? কবেকার পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে চলেছ!"

- "একদিন একটু বলি না! চুপ করেই তো থাকি রোজ, চুপ করেই তো থাকলাম চিরটা কাল।"

- "বেশ, বলেই ফেলো কী এত তোমার অভিযোগ! ভালোই তো হিসেব রেখেছ দেখছি, রোজকার কাজকম্ম ভুলে গেলেও সেগুলো ভুলে যাওনি কিন্তু।" চিবিয়ে চিবিয়ে বলে সুবীর।

- "নাহ, নতুন করে আর কী অভিযোগ করব! তবে বারবার ভুলে যাওয়া নিয়ে খোঁটা দিচ্ছ না? মনে আছে, আমার মায়ের যখন অসুখ করল, তোমার মা কিছুতেই আমাকে বাপের বাড়িতে যেতে দিলেন না। মায়ের কাছে একটু বসার, সেবা করার সুযোগ পেলাম না। অথচ পরে তোমার মায়ের অসুখে তোমরা আমার কাছে সেবা আশা করলে। ভুল বললাম, দাবি করলে। নিজের মায়ের সেবা করতে না পারার দুঃখ ভুলে দিনের পর দিন তোমার মায়ের সেবা করেছি। এমনকি আয়া না এলে বেডপ্যান পর্যন্ত দিয়েছি।

নিজের বাচ্চা হওয়ার আগে-পরে একটু যত্নও পাইনি, ভাল করে খেতে পাইনি, হাসপাতালে যাওয়ার আগের দিন পর্যন্ত কাজ করেছি, আঁতুড় কাটতে না কাটতেই আবার রান্নাঘরে ঢুকেছি। অথচ তোমার বোন যখন বাচ্চা হতে বাপের বাড়িতে এল, নিজের না পাওয়াগুলো ভুলে তাকে ভালোমন্দ রেঁধে খাইয়েছি, যত্ন করেছি কত মাস।"

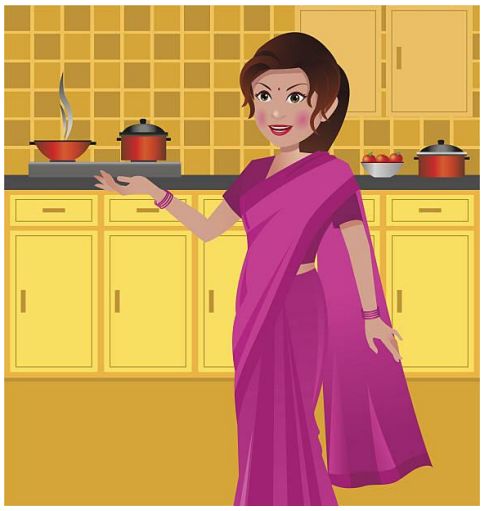
- "মা, তুমি...!"

- "সুমনা, এসব কী...!"

- "না, শোনো; একবার হলেও শোনো। শোনা দরকার। আর আমারও বলা দরকার।"

স্তব্ধ সুবীর। রিয়াও নিশ্চুপ। এই প্রথম।

এবং এই প্রথম সোজা তাদের দিকে তাকিয়ে ঋজুকণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারণে বলে সুমনা, "ভুলে যাওয়া নিয়ে আমাকে খোঁচা দেওয়ার আগে, আমার মতো বৌদের, আমার মতো মায়েদের, কতরকম অপমান ভুলে থাকার ওপর তোমাদের সংসার টিকে আছে, টিকে থাকে, সেই কথাটা তোমরাও কোনদিন ভুলে যেও না যেন!"



বন্ধুত্ব

নন্দিতা ভট্টাচার্য্য

এমএ পড়তে পড়তে ভালো সম্বন্ধ এসেছে বলে সুনন্দার বাবা-মায়ের জোরেই অভির সাথে সুনন্দার বিয়ে হয়ে গেল | আর অভির বাবা-মা বলেছিলেন বিয়ের পরে সুনন্দা পড়াশোনা করলেও ওঁদের আপত্তি নেই তাই আর দেরি না করে অভির সাথে বিয়ে দেওয়া হ'ল|

অভির নিজের ব্যবসা-বাড়ি-গাড়ি – বলা যায় বেশ অভিজাত স্বচ্ছল পরিবার | যৌতুক কিছুই নেননি অভির বাবা-মা, তবুও সুনন্দার বাবা-মা তাঁদের একমাত্র মেয়েকে কোনকিছু দিতে বাকি রাখেননি | অভির বাড়িতে ওর বাবা-মা ছাড়া অভির বাল্যবন্ধু জয় থাকে | জয় অভির ব্যবসার পার্টনার, খুব বন্ধুত্ব দুজনের|

অভির মুখে সুনন্দা শুনেছিল ছোটবেলায় জয় আর অভিরা একই পাড়ায় থাকত | জয়দের পরিবার ওদের পাড়া থেকে চলে যাবার কিছু বছর পর জয় অভিদের বাড়িতে থাকতে শুরু করে কারণ ওদের বাড়ি বেশ দূরে আর দুই বন্ধু দুজনকে ছেড়ে থাকতে রাজি হয়নি|

সুনন্দা আর অভির বিয়ে হয়েছে প্রায় দু'সপ্তাহ হ'ল, অভির বাবা-মা বৌমাকে মাথায় করে রেখেছেন, স্বামী হিসেবে অভিও খুব ভালো, খুব খেয়াল রাখে – সুনন্দাকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়া, শপিং, গয়না কিনে দেওয়া সবই করে | সবটাই ঠিক আছে, কিন্তু বিয়ের পর থেকে সুনন্দা একটা জিনিস লক্ষ্য করছে যে ওর ঘুমটা খুব বেড়ে গেছে, সন্ধ্যে হলেই খুব ঘুম পায় | সুনন্দা মনে করে খুব বেশি ঘোরাঘুরি হচ্ছে, তাইজন্যই হয়তো ক্লান্তিতে সন্ধ্যে থেকেই দু'চোখ ভরে ঘুম নেমে আসে|

মাসদুয়েক পর আস্তে আস্তে ঘোরাঘুরি কমতে থাকে, বেশিরভাগ সময় সুনন্দা বাড়িতেই থাকে| সন্ধ্যেবেলায় জয় আর অভি কাজ শেষে বাড়ি ফিরে ফেরে | অভির একটা জিনিস সুনন্দাকে খুব আকর্ষণ করে, সে বাড়ি এসে নিজের হাতে কফি তৈরী করে সুনন্দার আর নিজের জন্য| কিন্তু এই একটা ব্যাপারে সুনন্দা লক্ষ্য করেছে ওর শ্বশুরমশাই আর শাশুড়িমা বেশ বিরক্ত হন| হ্যাঁ, মুখে কিছু বলেন না অবশ্য, তবে দুজনের মুখ চাওয়া-চাওয়ি আর অভিব্যক্তি দেখে সুনন্দা বুঝতে পারে | কফিটা খাওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই সুনন্দার চোখ ঘুমে ঢুলে আসে| একটু পর রাতের খাবার খেয়ে বই পড়তে পড়তে সুনন্দা ঘুমিয়ে পড়ে আর ঘুম ভাঙ্গে একদম পরদিন সকালে|

এইভাবে মাস ছয়েক চলার পর সুনন্দার একটু সন্দেহ হয় | সারাদিন চনমনে থাকে, অথচ অভি কফি খাওয়ানোর পরেই ওর কেন ঘুম পায়? একদিন অভি আর জয় কাজ থেকে ফিরে রোজকার মতো ফ্রেশ হয়ে কফি করতে আসে | কিন্তু আজ সুনন্দা বলে কফিটা ও নিজে বানাবে| কিন্তু অভি কিছুতেই রাজি হয় না|

অভির বাবা-মা বলেন, "কেন? আজ সুনন্দা কফি করুক না! রোজ তো তুই করিস, আজ আমরাও ওর তৈরী কফি খাব|"

সুনন্দা খুব আনন্দ পায় | সবার জন্য কফি বানায় | সবাই গল্প করতে করতে কফি খায় কিন্তু আজ অভি যেন একটু আনমনা! জয় বারবার অভিকে ডাকছে, "কিরে, কী হ'ল?"

আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার সুনন্দা লক্ষ্য করল আজ কিন্তু ওর একটুও ঘুম পাচ্ছে না | বেশ রাত অবধি সুনন্দার ঘুম এল না, অভির চোখেও ঘুম নেই তবে ভান করছে ঘুমের | সুনন্দা একবার অভির কাছাকাছি হবার চেষ্টা করল, কিন্তু অভির দিক থেকে সাড়া না পেয়ে নিজেকে সরিয়ে নিল|

পরদিন আবার অভি আর জয় কাজ থেকে ফিরল আর আবারও অভি কফি করে আনল সুনন্দার জন্য | অভির বাবা-মা তাতে বেশ বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন|

সুনন্দা আজ কফিটা খাচ্ছে না দেখে অভি বলে, "আরে ঠান্ডা হয়ে গেল তো, কফিটা খাও |"

- "এই তো খাচ্ছি |" বলে সুনন্দা কাপটা হাতে নেয় | অভিকে অনুরোধ করে, "একটু জল খাওয়াবে?"

- "নিশ্চয়ই |"

যেই অভি জল আনতে গেছে অমনি সুনন্দা ফুলদানিতে কফিটা ফেলে কাপ ফাঁকা করে দেয় | ফাঁকা কাপ দেখে অভি বলে, "আরে, তুমি যে জল খাবে বললে, কফি খেয়ে নিলে?"

সুনন্দা বলে, "ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল তো তাই, আর তোমার হাতের কফি বলে কথা, বলে হাসতে থাকে |"

আজ সুনন্দা, ডিনার করল না 'খুব ঘুম পাচ্ছে' বলে ও নিজের ঘরে ঢুকে ঘুমের ভান করে শুয়ে রইল|

পাশের ঘর থেকে অভির সাথে ওর বাবা-মায়ের বেশ তর্কাতর্কির আওয়াজ আসতে লাগল, কিন্তু কী বিষয়ে বুঝল না সুনন্দা।

অভি ঘরে ঢুকল, সুনন্দা ঘুমের ভান করে আছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দরজায় হালকা টোকা। অভি দরজা খুলল সামনে জয়। সুনন্দা ভাবল হয়তো ব্যবসার ব্যাপারে কিছু বলতে এসেছে।

কিন্তু, একী! সুনন্দাকে ঘুমন্ত ভেবে অভি ওকে খাট থেকে মেঝেতে নামিয়ে দিল, আর ওই খাটে এসে জয় শুয়ে পড়ল। অভি আর জয় স্বামী-স্ত্রীর মতন আচরণ করতে লাগল, সুনন্দার বুঝতে বাকি থাকল না ওরা দুজনে সমকামী। ওদের দুজনের এমন আচরণ দেখে সুনন্দার গা ঘিনঘিন করতে লাগল, ও বুঝল বিরাট সর্বনাশ হয়ে গেছে ওর সাথে।

সুনন্দা মেঝেতে উঠে বসল। অভি আর জয় হকচকিয়ে গিয়ে নিজেদের অবস্থার কারণে চরম অস্বস্তিতে পড়ে লজ্জিত হ'ল।

সুনন্দা বলল, "এই কারণে তুমি আমাকে ঘুমের ওষুধ মেশানো কফি খাওয়াও? বন্ধুত্ব অনেক দামি জিনিস অভি, তোমাদের মধ্যে যেটা আছে সেটা বন্ধুত্ব নয়, সমকামিতা।"

সুনন্দা ঘর থেকে বেরিয়ে শ্বশুর-শাশুড়িকে ডাকল এবং জিজ্ঞাসা করল, "আপনারা তো সবই জানতেন, তাহলে আমার এই সর্বনাশ কেন করলেন?"

শ্বশুর-শাশুড়ি মাথা নিচু করে বললেন, "অনেক বুঝিয়েছি। সবাই বলেছিল বিয়ে দিলে ঠিক হয়ে যাবে।"

সুনন্দা বলল, "আর সেইজন্য আপনারা আমার সর্বনাশ করে দিলেন? ঠিক আছে, এই বিষয়টার ফয়সালা আদালতেই হবে।" বলে সুনন্দা শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।



কীভাবে একটি সাধারণ বাস্কেটবল কোর্টকে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা যায় এবং তুমি থাকবে বক্তৃতামঞ্চে

মূল গল্প: "How to Transform an Everyday, Ordinary Hoop Court into a Place of Higher Learning and You at the Podium"

Written by – Matt de la Peña

অনুবাদ: নূপুর রায়চৌধুরী

শেষমেশ গরমকাল এসে গেছে। যাও, এবার গভীর শ্বাস নাও; তুমি এখন মুক্ত। সারাবছর ধরে তোমার মা বীজগণিতের অনুশীলনপত্র, বিজ্ঞান মেলার প্রকল্প আর মিসেস বেকার ইংরেজি ক্লাসের জন্য যে হাঁটু সমান উঁচু বইয়ের স্তূপ দিয়েছিলেন, সেগুলো নিয়ে আঠার মতো তোমার পেছনে লেগেছিলেন। আর তুমিও তোমার যা করণীয় তা করেছ। দুটো এ এবং চারটে বি। সত্যি বলতে, তুমি আসলে বেশ বুদ্ধিমান। পড়াশোনা তোমার কাছে সোজা। বছরের শেষের সেই পাঁচ পৃষ্ঠার প্রবন্ধে তুমি বেকারকে বুঝিয়ে দিয়েছিলে যে এস্পেরানজার স্বপ্ন আর ম্যাঙ্গো স্ট্রিটের বাড়ির প্রতীকীবাদ নিয়ে কী ব্যাপার ছিল, আর তুমি ৯৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলে – যা ক্লাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গ্রেড। কিন্তু যখন তুমি সেই প্রবন্ধটা টাইপ করছিলে, তখনও তোমার কোলে একটা ইনডোর-আউটডোর বল ছিল। বাক্যগুলোর ফাঁকে ফাঁকে তুমি প্রসারিত হাতের ওপর আঙুলের কারিকুরির দিবাস্বপ্ন দেখছিলে।

দেখো, যারা হোমওয়ার্ক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, তারা এই ব্যাপারটা বোঝে না। তোমার মতো মানুষদের জন্য, বাস্কেটবল শুধু একটা খেলা নয়। এটা মুক্তির পথ। টিভিতে অহরহ দেখানো সেইসব গাছপালাঘেরা সুন্দর জীবনের দিকে যাওয়ার একটা রাস্তা। তুমি হিসাব করে দেখেছ এবং পরিস্থিতি বিচার করেছ। সত্যিটা হ'ল, তুমি কখনোই বয় জিনিয়াস জেরেমায়া ভিলার মতো পড়াশোনা করতে পারবে না। সিলভিয়া দিয়াজের মতোও না। এমনকি পাশের ঘরে তোমার বন্ধু ফ্রান্সিসকোর মতোও না। এই পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছে যারা নানা রঙের হাইলাইটার দিয়ে বিশ্ব ইতিহাসের গোদা

বই দাগিয়ে পড়তেই ভালোবাসে। তুমি তাদের একজন নও। প্রতিযোগিতা করার জন্য গলির মধ্যে বল ড্রিল করার পেছনেই তুমি অনেক বেশি সময় ব্যয় করো। বাস্কেটবল খেলাই তোমার জন্য সেরা সুযোগ।

তোমার বাস্কেটবল দক্ষতার ভবিষ্যৎ

গত তিন বছর ধরে তুমি তোমার বাড়ির পাশের রাস্তার একটি আউটডোর কোর্টে প্রতিটি অবসর মুহূর্ত বাস্কেটবল খেলে কাটিয়েছ – স্কুলের পর, খেলার পর, সপ্তাহান্তে যখনই সুযোগ পেয়েছ। বেশিরভাগ রাতেও তুমি সেখানে শট প্র্যাকটিস করেছ একা একা, যখন সূর্য সাগরের ওপারে অস্ত যায় এবং পার্কের স্বয়ংক্রিয় বাতিগুলো মিটমিট করে জ্বলে ওঠে, আর সেই অদ্ভুত হলুদ আবছা আলো ফাটল ধরা কংক্রিটের ওপর ছড়িয়ে পড়ে। বাস্কেটবলও অন্য যেকোনো কিছুর মতোই। পরিশ্রম করতে থাকো, তোমার খেলা দুর্দান্ত হয়ে উঠবে। তোমার জাম্প শট এখন প্রায় পঁচিশ ফুট দূর থেকেও নিখুঁত হয়। তুমি লেনের মধ্যে একটা ফ্লোটার শট রপ্ত করেছ, যা ধীরগতির বড় খেলোয়াড়দের অসহায় করে তোলে। কিন্তু তোমার বল কন্ট্রোলই তোমাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখে। তোমার ক্ষিপ্রতা – যেভাবে তুমি যখন খুশি পেইন্টের মধ্যে ঢুকে যেকোনো হাতে শট শেষ করতে পারো। গত মরসুমে তুমি কাউন্টির অন্য অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রের চেয়ে বেশি পয়েন্ট স্কোর করেছ। অ্যাসিস্টে তুমি দ্বিতীয় ছিলে। তো কী হয়েছে? এটা যথেষ্ট ভালো নয়, এবং তুমি তা জানো; বিশেষ করে যদি তুমি পরের বছর হাইস্কুলে আরও বেশি প্রভাবশালী হতে চাও। এই কারণেই বালবোয়া পার্কের মিউনি জিম নিয়ে দুজন নতুন ছেলেকে কথা বলতে শুনে তোমার কান খাড়া হয়ে যায়। তুমি শুনতে পাও সিঁড়িতে বসে থাকা চর্বি-পেটের ছেলেটা তার বন্ধুকে বলছে, "এটা গোটা শহরের সবচেয়ে সেরা খেলার জায়গা। আমি জেনেই বলছি।"

- "তুমি কি তাদের র‍্যাঙ্কিং করেছ?" অন্য ছেলেটা বলে।

- "না, আমার পিঠে আঘাত পাওয়ার আগে আমি সেখানেই সব সময় খেলতাম। তুমি যদি মিউনির ওই বড় ছেলেগুলোর সাথে খেলতে পারো... তাহলে তুমি আর যে কারুর সাথেই খেলতে পারবে।"

সেই রাতে অতিরিক্ত জাম্প শটের অনুশীলন বাদ দিলে তুমি। তার বদলে তুমি পাড়ার লাইব্রেরিতে গেলে, যেখানে অনলাইনে তুমি মিউনি জিম খুঁজে নিতে পারবে। গুগল আর্থ-এ ঠিকানা টাইপ করে তুমি দেখতে পেলে যে এটা এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়ামের ঠিক পাশেই, যেখানে তোমার মা তোমাকে আর তোমার বোনকে ছোটবেলায় নিয়ে যেতেন। আর তোমার হিসাব যদি সঠিক হয়, তাহলে এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়ামটি তোমার বাবার কারখানার চাকরি থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। সেই রাতে খাবার পর তুমি তোমাদের ছোট্ট বসার ঘরে গেলে। তোমার বাবাকে সেরা খেলোয়াড়দের সাথে প্রতিযোগিতা করার গুরুত্ব বোঝানোর সাহস সঞ্চয় করলে। তুমি তোমার স্থানীয় দৌড়ের স্তর পার করে এসেছ। এবার গভীর জলে নামার সময় হয়েছে। তাতে কী হয়েছে যদি তোমার বাবা খেলার নিয়মকানুন না জানেন, যদি তিনি শুধু টিভির সামনে চুপচাপ বসে থাকেন আর দাঁতে টুথপিক কাটেন?

- "আচ্ছা, কী ভাবলে তবে, বাবা?"

- "কী নিয়ে?"

- "কেমন হয় যদি আমি প্রতিদিন সকালে তোমার সাথে কাজে যাই? তাহলে আমি ওখানে গিয়ে একটু বল খেলতে পারতাম?" তিনি তোমার দিকে একবার সন্দেহের চোখে তাকাবেন, তারপর আবার তাঁর পুলিসি শো আর টুথপিকে মনোযোগ দেবেন। তুমি এটাকে 'না' হিসেবে ধরে নেবে এবং অনুমান করবে যে তোমার বাস্কেটবল দক্ষতা বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রীষ্মের ভাগ্য এখন কাউন্টি বাস ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করছে। কিন্তু তোমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হবে। কয়েক মিনিট পরেই তিনি বিড়বিড় করে বলবেন, "পাঁচটার মধ্যে তোমার ওই রোগা শরীরটা নিয়ে গাড়ির কাছে চলে আসতে হবে, এই আমি বলে দিচ্ছি। নইলে কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়াই চলে যাব।" এই কথাগুলো বলার সময় তিনি কিন্তু তোমার দিকে ফিরেও তাকাবেন না। তাতে কিছু যায় আসে না। উত্তেজনায় তোমার বুক জোরে ঢিপঢিপ করবে । তুমি ছুট্টে তোমার বোনের সাথে ভাগ করে নেওয়া ঘরটিতে যাবে এবং উচ্ছ্বসিত এক স্কুলছাত্রীর মতো নিজের বাস্কেটবলের সরঞ্জামগুলো বিছানার পাশের চেয়ারে গুছিয়ে রাখবে – ঠিক এমনই অনুভূতি হবে তখন তোমার।

আজকের দিনটাই শুধু আছে

জেনে রাখো, পরের দিন ভোর সাড়ে চারটায় যখন তোমার অ্যালার্ম বাজতে শুরু করবে, তখন তুমি বুঝতেই

পারবে না তুমি কোথায় আছ বা কী ঘটছে | বাইরে তখনও অন্ধকার | তোমার বোনের নাক ডাকবে | অবশেষে যখন বাস্তবতা তোমার মাথায় আসবে, তোমার মস্তিষ্কের অলস অংশটা তোমাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে আবার ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করবে – হয়তো আমরা আজ মিউনি ট্রিপটা বাদ দিতে পারি... তার বদলে পার্কে গিয়ে বল খেলতে পারি... কাল তো আছেই | নিজের মাথার খুলির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে মস্তিষ্কের এই অংশটাকে একটা কষে চড় মারো | যদি তুমি ওকে সুযোগ দাও, মস্তিষ্কের এই অংশটা তোমার দেখা প্রতিটি স্বপ্ন থেকে তোমাকে পিছিয়ে দেবে | আমার কথা বিশ্বাস করো | বিছানা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসো, নিজেকে মনে করিয়ে দাও যে তোমার বাবা প্রতিদিন কাজের জন্য এভাবেই ঘুম থেকে ওঠেন | বৃষ্টি বা রোদ, অসুস্থতা বা সুস্থতা, সব অবস্থাতেই | তোমার কাকারাও তাই করেন | এইজন্য তাঁদের সম্মান করো | তাঁদের মতো হওয়ার চেষ্টা করো | দক্ষিণে ত্রিশ মিনিটের পুরো যাত্রাপথে তোমার বাবা তোমাকে বড়জোর দুটো বাক্য বলবেন | সেটা ব্যক্তিগতভাবে নিও না | জিমটা কোথায় অবস্থান করছে এবং তুমি কীভাবে সেটার কথা শুনেছ, সেই বিষয়ে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দাও | যখন তিনি তাঁর সেই পরিচিত কড়া দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকাবেন, তখন সিট বেল্টটা বেঁধে নিও | হাইওয়ের প্রবেশপথে ওঠার আগেই তোমাদের কথা বলা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু তাতে কোনো সমস্যা নেই | তোমার মনোযোগ গাড়ির যাত্রার অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে সরিয়ে নাও | তিনি যে রেডিওর সংবাদ অনুষ্ঠানটি চালু করেছেন, তার কথা ভাবো | তাঁর গরম কালো কফির গন্ধের কথা ভাবো | অন্ধকার হাইওয়েতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গাড়িগুলো এবং যখনই তিনি লেন পরিবর্তন করেন, তখন তাঁর টার্ন সিগন্যালের মৃদু টিক টিক শব্দের কথা ভাবো | গ্রীষ্মের শেষ নাগাদ, এই আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ বিষয়গুলো তোমার মস্তিষ্কে গেঁথে যাবে |

যখন তিনি তাঁর কারখানার কাছের রাস্তার ধারে গাড়ি পার্ক করবেন, তখনও মিউনি জিম খুলতে পুরো তিনঘন্টা বাকি থাকবে | "পৌনে চারটার মধ্যে তোমার রোগা শরীরটা নিয়ে এখানে ফিরে আসবে", এই কথা বলে তিনি পেছনের সিট থেকে তাঁর দুপুরের খাবারের টিফিন ক্যারিয়ারটা তুলে নেবেন | "বাড়ি ফেরার হাঁটাপথটা কিন্তু অনেক লম্বা, সেটা আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি |" তিনি মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর, সেই পুরোনো ভোক্সওয়াগন বাগ গাড়িটার দিকে মনোযোগ দাও | তুমি ভাববে, এত ছোট গাড়ির ভেতরে তুমি কীভাবে ঘুমাবে, কিন্তু একটু চেষ্টা করার পরেই তুমি একটা উপায় খুঁজে বের করে ফেলবে | এর জন্য তোমার ছয়ফুট একইঞ্চি লম্বা শরীরটাকে এক ধরনের মানুষ প্রেটজেলের মতো করে ভাঁজ করতে হবে | তোমার শরীরের অর্ধেকটা থাকবে পেছনের সিটে, আর বাকি অর্ধেক সামনের যাত্রী-সিটে কুঁকড়ে থাকবে | তোমার ব্যাগটা সেন্টার কনসোলে এমনভাবে রাখা থাকবে যাতে হ্যান্ড ব্রেকটা তোমার পাঁজরে বিঁধে না যায় | তৃতীয় দিনের মধ্যে, এই উচ্চ-স্তরের যোগাসন ভঙ্গিটি তোমার কাছে পুরোপুরি স্বাভাবিক বলে মনে হবে |

শুরুতেই একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া যাক | মিউনি জিমের এই গ্রীষ্মকালটা 'এক উজ্জ্বল মুহূর্ত'-র মতো একটানা সুখের হবে না | খারাপ সময়ও আসবে | কোর্টের ভেতরে এবং বাইরে – সবখানেই | আমার কথা বিশ্বাস করো | কয়েক সপ্তাহ পরেই, মোটাসোটা মুখের একজন পুলিস অফিসার তার লাঠির গোড়া দিয়ে গাড়ির উইন্ডশিল্ডে টোকা দেবে | সে তার অ্যাভিয়েটর কালো চশমার ভিতর দিয়ে তোমার দিকে তাকাবে, তার ডান হাতটা থাকবে কোমরের খাপে রাখা পিস্তলের ওপর | আতঙ্কিত না হওয়ার চেষ্টা করো | দুটি সাধারণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে তার সন্দেহ হবে –

১. তার টহলের সময় এই প্রথম সে এমন একটি ছেলের দেখা পেল যে একটি VW Bug গাড়ির ভেতরে নব্বই ডিগ্রি কোণে ঘুমিয়ে আছে |

২. তোমার গায়ের রঙ বাদামী |

২এ. (তার গায়ের রঙও বাদামী হবে – হয়তো আরও বেশি বাদামী – কিন্তু এটা নিয়ে নিজেকে খুব বেশি চিন্তিত করে তুলো না | এই ঘটনার পেছনে একটি জটিল মনস্তত্ত্ব আছে, যা বোঝার জন্য তুমি এখনও প্রস্তুত নও |)

তোমার বিনয়ী ব্যাখ্যা শেষে পুলিস অফিসারটি ধীরে ধীরে তার হাত বন্দুক থেকে সরিয়ে নেবে | পরিবর্তে সে তোমার বাম কনুই ধরে তোমাকে কারখানার সামনের অফিসের দিকে নিয়ে যাবে | তোমার বাবাকে বেশ বিব্রতভাবে লাউডস্পিকারের মাধ্যমে ডেকে পাঠানো হবে | দুই মিনিট পর তিনি পেছন থেকে বেরিয়ে

আসবেন এবং তাকে দেখে প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন মনে হবে। এর কারণ এই নয় যে তুমি কিছু ভুল করেছ। এর কারণ হ'ল পুলিসের সাথে তাঁর নিজেরই কিছু অতীত অভিজ্ঞতা আছে। এমন কিছু ঘটনা যা তোমার জন্মের অনেক আগেই ঘটেছিল। এমন কিছু ঘটনা যা নিয়ে কেউ কখনো কথা বলে না। পুলিসটি পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পর, তোমার বাবা মুখে একটা অস্বস্তিকর হাসি ফুটিয়ে তোমার পক্ষ নেবেন। তিনি বলবেন যে তুমি একটা ভালো ছেলে, আর তুমি শুধু বালবোয়া পার্কের একটা জিমে বল খেলতে এসেছ। তিনি উৎসাহের সাথে পুলিসটির সাথে করমর্দন করবেন, তার পরিষেবার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাবেন এবং তুমি কোনো সমস্যা করে থাকলে তার জন্য ক্ষমা চাইবেন।
কিন্তু পুলিসটি চলে যাওয়ার সাথে সাথেই তোমার বাবা আবার আগের রূপে ফিরে আসবেন। তোমার কাঁধে হাত বুলিয়ে তিনি বলবেন, "ওই ক্ষমতা দেখানো বদমাশটাকে নিয়ে চিন্তা করো না। তুমি কোনো ভুল করোনি।"
- "আমি তো শুধু ঘুমাচ্ছিলাম।"
- "মেক্সিকানদেরও ঘুমানোর অধিকার আছে।" তিনি তোমার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে মাথা নাড়বেন। আর এই মুহূর্তে তুমি তোমার বাবার সাথে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা অনুভব করবে।

সৌভাগ্যবশত, সেটাই হবে একমাত্র সকাল যখন তোমাকে লাঠির খোঁচায় ঘুম থেকে জাগানো হবে। অন্য সব সকালে তোমার ফোনের অ্যালার্মেই ঘুম ভাঙবে, এবং তুমি নিজের ইচ্ছামতো আরাম করে VW Bug থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। তোমার শক্ত হয়ে যাওয়া হাত-পাগুলো টানটান করে নাও। হিলক্রেস্টের (স্যান ডিয়েগোর একটি জায়গা) উষ্ণ বাতাসে শ্বাস নাও এবং তোমার ব্যাগ থেকে পাথরটা বের করো। এবার এগিয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে। মিউনি যাওয়ার সব শর্টকাটগুলো জানতে তিন দিনের বেশি সময় তোমার লাগবে না।

মিডল স্কুলের খেলার মাঠের মধ্যে দিয়ে ড্রিবল করতে করতে এগিয়ে যাও, যেখানে গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পের বাচ্চারা ডাবল ডাচ, হপস্কচ আর ডজবল খেলে। স্যান ডিয়েগো চিড়িয়াখানার বিশাল পার্কিং লটে ঘুমন্ত গাড়ির সারিগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ড্রিবল করো। ক্যামেরা হাতে পর্যটকদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ড্রিবল করতে করতে চিড়িয়াখানার প্রধান ফটকের দিকে এগিয়ে যাও। বিভিন্ন হট ডগের দোকান, দুটো চাকা পাংচার হয়ে যাওয়া আইসক্রিমের ট্রাক, আর তোমার প্রয়াত দাদুর মতো দেখতে লোলচর্ম লোকটার রাস্পা (জনপ্রিয় মেক্সিকান শেভড্ আইস ট্রিট) বিক্রির দোকানের পাশ দিয়ে ড্রিবল করো। গ্রীষ্ম শেষে এই দোকানিরা সবাই তোমাকে চিনতে পারবে এবং হাত নাড়বে। তালাদেওয়া দুটো সবুজ দরজাওয়ালা সেই বড়, জরাজীর্ণ বাড়িটাতে পৌঁছাতে তোমার একঘন্টার একটু বেশি সময় লাগবে। তোমার বুকের ভেতর প্রজাপতি উড়তে শুরু করবে প্রথমবার এবং তার পরের প্রতিবারই। এমনকি বহু বছর পরেও। আর এমনই তো হওয়া উচিত। কারণ তুমি তা অনুভব করতে পারছ... এখানেই তুমি পৃথিবীকে চিনতে শিখবে।

গ্যালারিতে বসে শাস্তি ভোগ করা

তুমি যখন বিশাল ঝনঝনে চাবির গোছা হাতে সাইকেলে করে আসা জিম ম্যানেজার, জিমির জন্য অপেক্ষা করছ, তখন তোমার চারপাশের প্রাপ্তবয়স্ক লোকেদের কথা শোনো। যারা তাদের চেনে না, তাদের চোখে এরা অশিক্ষিত। এরা গরিব, কৃষ্ণাঙ্গ, অভদ্র, ধূর্ত, ইস্পাত-কঠিন দৃষ্টির অধিকারী। এমন মানুষ, যাদের দেখলে রাস্তা পার হয়ে অন্য পাশে চলে যেতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু গ্রীষ্মের এই সময়ে তুমি তোমার চারপাশের সবকিছুকে আত্মস্থ করে নেবে। এবং তুমি তাদের মেধা, তাদের কাব্যময়তা, তাদের দর্শন, কোর্টের ভেতরের খুনসুটির বাচনিক ছন্দ শুনতে পাবে। তোমার পরিচিত যে কোনো মানুষের চেয়ে তারা আরও জোরে এবং আরও বেশি করে হাসবে, তুমিও হাসবে; বিশেষ করে গ্রীষ্মের কয়েক সপ্তাহ পর, যখন তারা তাদের রোষ তোমার দিকেই ঘুরিয়ে দেবে। তারা তোমাকে মেক্সিকো বলে ডাকা শুরু করবে (যদিও তোমার স্প্যানিশ জ্ঞান খুবই সন্দেহজনক)। তারা জিজ্ঞেস করবে তুমি কেন জিমে আছ, কেন কোনো মাঠে বসে স্ট্রবেরি তুলছ না। অথবা ফুটবল খেলছ না। তারা তোমাকে বলবে যে তাদের সাথে খেলার জন্য তুমি বড্ড ছোট। বড্ড রোগা। তোমার পকেটে টাকা কম। তুমি খুব নরম গোছের। তারা বলবে, তিন বছর পর ফিরে এসো। অথবা হয়তো দশ বছর পর। তুমি এসব শুনে হাসতে থাকবে,

কারণ তুমি বুঝতে পারবে যে, তাদের এই খোঁচাগুলো আসলে এক ধরনের বিকৃত স্বীকৃতিরই প্রকাশ।

এক সপ্তাহ পর, একজন লোক যাকে সবাই মিস্টার আনলেডেড বলে ডাকে (কারণ সে কাছের একটা গ্যাস স্টেশনের নাইট ম্যানেজার), সে তোমার লম্বা, রোগা, 'পেশিহীন' হাত সম্বন্ধে তোমাকে খোঁচা দেবে এবং তুমিও এক মুহূর্ত দেরি না করে তার ডান হাতের বাহুতে আঁকা মহল্লার সুপারম্যানের ট্যাটুটা নিয়ে পাল্টা খোঁচা দেবে, আর বলবে, "জেনেশুনে ক্রিপ্টোনাইটে ভরা একটা জিমে তুমি কেন এসেছ?"

সেদিন সকালে জিমের বাইরে জিমির জন্য অপেক্ষা করা সবাই হো হো করে হেসে উঠবে, তারা পায়ের পাতা দিয়ে মাটিতে আঘাত করবে এবং একে অপরের সাথে মুষ্টিবদ্ধ হাতে ঠোকাঠুকি করবে, আর তোমার কাছে অবাক করা ব্যাপার হবে, মিস্টার আনলেডেডই সবার চেয়ে জোরে হাসছে। কিন্তু কোর্টের বাইরে তুমি যতই সবার সাথে মিশে যাও না কেন, কোর্টের ভেতরে পরিস্থিতিটা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথম দিন তুমি একটাও খেলায় সুযোগ পাবে না। একটাও না। তুমি সবার সাথে অন্ধকার জিমে ঢুকবে, ওদের মতোই গ্যালারিতে নিজের জিনিসপত্র রাখবে, সবার সাথে কোর্টে নেমে কয়েকটি ওয়ার্ম-আপ জাম্পার শট নেবে, কিন্তু যখন দল বাছাইয়ের সময় আসবে, তুমি নিজেকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে। যখন তুমি খেলার জন্য ডাক দেবে, তারা তোমাকে উপেক্ষা করবে। তুমি হাঁটুতে ব্রেস পরা সেই মোটাসোটা লোকটাকে জিজ্ঞেস করবে যে তুমি তার দলের সাথে খেলতে পারবে কিনা। তার খেলা শুরু হতে তখনও তিনটে ম্যাচ বাকি, কিন্তু তোমার হাতে সারাদিন সময় আছে। সে মাথা নেড়ে ভারি, ধূমপায়ীর মতো গলায় বলবে, "ঠিক আছে, হে ছোকরা। আমি তোমাকে দলে নিচ্ছি।" কিন্তু একঘন্টা পর, যখন তার দল অবশেষে মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত হবে, তখন সে তোমাকে বাদ দিয়ে একজন টাকমাথা লম্বা লোককে দলে নেবে। প্রথমদিকে বাস্কেটবলে এই ব্রাত্য হয়ে পড়াটা তোমাকে ভেতর থেকে ভেঙে দেবে। তুমি জানো যে তুমি অন্যদের সাথে পাল্লা দিতে পারো। জিমের অন্য সবার মতোই তোমার শট নিখুঁত (হয়তো দান্তে নামের ছেলেটি ছাড়া, যে কখনো কোনো শটই মিস করে না)। ঠিক আছে, এই ছেলেগুলো নাহয় চেহারায় অনেক বড়, শক্তিশালী এবং বেশি আক্রমণাত্মক, কিন্তু অন্তত পক্ষে একজন নির্ভরযোগ্য পাসার তো তুমি হতেই পারো। তুমি জানো ফাস্ট ব্রেকে কোথায় লব পাস (বাস্কেটবল খেলায় একটি উচ্চ-তীরবর্তী পাস) দিতে হয়, যাতে তোমার দলের লম্বা খেলোয়াড়টা একটা জোরালো গর্জনের সাথে বলটা সোজা বাস্কেটে ঢুকিয়ে দিতে পারে। তুমি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেগুলোর কাছে কাকুতি-মিনতি করো। - "তোমরা আমাকে খেলতে দাও, ভাই। আমি ভালো খেলতে পারি। আমি সত্যি বলছি।"

তোমার এই আত্মপ্রচারের বাড়াবাড়ি কারো কানেই যাবে না। প্রথম দিন তুমি শুধু খেলার ফাঁকে কয়েকটি জাম্পার শট নেবে, তারপর বসে বসে দেখার জন্য ফিরে আসবে গ্যালারিতে। পরের দিনও একই ব্যাপার ঘটবে। তার পরের দিনও। প্রথম দুই সপ্তাহে তুমি সব মিলিয়ে মাত্র একটি দৌড়ে অংশ নেবে – যদি দিনের শেষে হওয়া সেই তিন-বনাম-তিনজনের বিশৃঙ্খল খেলাটাকে আদৌ দৌড় হিসেবে ধরা যায়, যেখানে তুমি শুকতলাবিহীন টিম্বারল্যান্ডস (শক্তপোক্ত, জলরোধী চামড়ার বুটের জন্য বিখ্যাত আমেরিকান ব্র্যান্ড) পরা একজন হোমলেস লোককে ঠেকিয়ে রাখতে ব্যস্ত থাকবে।

একদিন রাতে গাড়ির দিকে দীর্ঘ পথ হাঁটার সময় ব্যাপারটা তোমাকে বিশেষভাবে আঘাত করবে।

বাড়ি ফেরার পথে তুমি চুপ করে থাকবে। তারপর তোমার বাড়ির পেছনের গলিতে উল্টিয়ে রাখা একটা বালতির ওপর গিয়ে বসবে, যেখানে তুমি নিজের সাথে মন খুলে কথা বলবে। ঠিক আছে, এটা তোমার দেখা সেরা পিকআপ গেম, কিন্তু ওরা তো তোমাকে খেলতেই দেয় না। ওরা মেক্সিকানদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। অথবা যারা সামনেই ক্লাস নাইনে উঠবে, তাদের প্রতি, কিংবা উভয়ের প্রতিই। ভোরের আলো ফোটার আগেই ঘুম থেকে উঠে একটা VW বাগের মধ্যে কুঁকড়ে ঘুমিয়ে, সারাদিন শুধু গ্যালারিতে বসে থাকার কী দরকার? নাঃ, তা চলবে না। তুমি একজন খেলোয়াড়, দর্শক নও। অন্তত রাস্তার ধারের কোর্টটাতে গেলে তুমি ঘাম ঝরাতে পারবে।

সেদিন রাতে নিজের ঘরে যাওয়ার বেলায় তুমি তোমার বাবাকে খবরটা দেবে। "শুধু জানিয়ে রাখছি, বাবা, আমি আর তোমার সাথে গাড়িতে যাব না। এতবার আমাকে নিয়ে

যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ।"

তিনি ভ্রু কুঁচকে তাঁর বিয়ার থেকে মুখ তুলে তাকাবেন – "কী হয়েছে?"

তুমি বেশ শক্ত মনের ছেলে। কোনো কিছুতেই তোমার তেমন কিছু যায় আসে না। কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে তাঁর প্রশ্নটা শুনে তোমার গলা বুজে আসবে।

- "আসলে... আমি নিজেও জানি না কেন, কিন্তু ওরা আমাকে খেলতে দেবে না।"

মনে মনে তুমি বাবার কাছ থেকে একটু উপদেশ পাওয়ার আশা করবে, কিন্তু তা পাবে না। তার বদলে তিনি একটু মুচকি হাসবেন এবং আবার তাঁর বিয়ারের প্রতি মনোযোগ দেবেন।

সেদিন রাতে তুমি অ্যালার্ম দেবে না। দেরিতে ঘুম থেকে ওঠার চিন্তায় উত্তেজিত হয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেবে। পুরোনো রুটিনে ফিরে আসার স্বস্তিতে তুমি আরাম অনুভব করবে।

কিন্তু একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে। পরের দিন সকালে তোমার শরীর স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাড়ে চারটায় জেগে উঠবে। তুমি হতবিহ্বল হয়ে চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসবে। তোমার হাত অজান্তেই নোংরা কাপড়ের স্তূপ থেকে বাস্কেটবলের পোশাক খুঁজবে এবং তোমার পা তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাঁচটা বাজার কয়েক মিনিট আগেই তোমাকে গাড়ির কাছে পৌঁছে দেবে। যখন তোমার বাবা তোমাকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবেন, তিনি আবার মুচকি হাসবেন। কিন্তু তিনি মুখে কিছুই বলবেন না।

ওখানে একটা অপদার্থের মতো বসে থেকো না

চতুর্থ সপ্তাহ না আসা পর্যন্ত তুমি কোনো অর্থপূর্ণ খেলায় অংশ নিতে পারবে না। ততদিনে তুমি বেশিরভাগ লোককে তাদের ডাকনামে চিনে যাবে। আর জানতে পারবে তারা কীভাবে খেলে। একটা সময়ে খেলার ইচ্ছার চেয়ে তাদের বিভিন্ন দক্ষতার বিশ্লেষণ করার দিকেই তোমার মনোযোগ চলে যাবে। বিশেষ করে একজনকে তুমি খুঁটিয়ে দেখবে। দান্তে। সে ছয় ফুট চার ইঞ্চি লম্বা এবং রোগা। বয়স হয়তো ত্রিশের কোঠার শুরুতে। জিমে সেই একমাত্র লোক যে তোমার সাথে কখনো একটা কথাও বলেনি। সে এমনভাবে পাশ দিয়ে হেঁটে যায় যেন তোমার কোনো অস্তিত্বই নেই সেখানে। কিন্তু সে সত্যিই দারুণ খেলতে পারে। সে যে শুধু প্রায় প্রতিটি জাম্পারকে মোকাবিলা করে শট নেয় তাই নয়, তার বল কদাচিৎ রিম স্পর্শ করে। পোস্টের কাছে তার একটা চমৎকার ফেডঅ্যাওয়ে শট আছে, এবং যখনই কেউ ফাস্ট ব্রেকে তাকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করে, তারা বাজেভাবে হেরে যায়, পোস্টারাইজড হয়, আর সাইডলাইনের লোকেরা তখন হাসতে হাসতে, পা ঠুকতে ঠুকতে আর আঙুল দিয়ে দেখাতে দেখাতে একে অপরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। উইং থেকে একটা বিশেষ গেম উইনিং শট জালে জড়ানোর পর, যখন দুজন লোক তাকে জড়িয়ে ধরেছে, সে হঠাৎ তোমার দিকে ঘুরে গর্জন করে উঠবে, "এই ছেলে, তুই এখনো এখানে আসিস কেন?"

তুমি ড্রিবলিং থামিয়ে হতবাক হয়ে যাবে। "কে, আমি?"

- "কেউ মনে করে না যে তুই এখানে খেলার জন্য যথেষ্ট ভালো; বুঝতে পারছিস? তুই বরং তোর বস্তিতে ফিরে যা, ছোঁড়া।"

তার কথায় তুমি এতটাই ধাক্কা খাবে যে তোমার পুরো শরীর জমে যাবে। পুরো জিমের সবাই একটু একটু করে এগিয়ে এসে এরপর কী হয় তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে।

দান্তে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে তোমার মুখের সামনে আঙুল তাক করে বলবে, "কী, তুই কি কালা নাকি হে ছোকরা? আমি বলছি চলে যা!"

তোমার মস্তিষ্কে কোনো শব্দ তৈরি হয় না। কোনো চিন্তাও আসে না।

দান্তে বাকি ছেলেদের দিকে ঘুরে দাঁড়ায় – "কেউ এই অপদার্থটাকে আমার সামনে থেকে সরাও, নয়তো আমি কিছু একটা বোকামি করে ফেলব।"

কয়েকজন নিয়মিত দর্শক তোমাকে গ্যালারির দিকে নিয়ে যাবে, কিন্তু তোমার পা তখনও ঠিকমতো কাজ করবে না। তুমি প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো বিহ্বল হয়ে ভাববে তুমি কী ভুল করেছ? কেন সে তোমাকে ঘৃণা করে? তোমার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা ধুকপুক করবে। মনে সন্দেহ দানা বাঁধবে। হয়তো সে ঠিকই বলছে। হয়তো তুমি সত্যিই একজন অপদার্থ। হয়তো তোমার এভাবে প্রতিদিন বিনা আমন্ত্রণে এখানে আসা উচিত নয়।

হয়তো পুরো গ্রীষ্মকালটাই একটা বড় ভুল ছিল। তুমি গ্যালারি থেকে তোমার জিনিসপত্র তুলে দরজার দিকে এগোতে শুরু করো, কিন্তু কোনো এক দুর্জ্ঞেয় কারণে তুমি থেমে যাও।

তুমি ঘুরে দাঁড়াও | তুমি কোর্টের ওপার থেকে দান্তের দিকে কটমট করে তাকাও এবং বিড়বিড় করে বলো, "আমি শুধু খেলতে চাই |"

"কী?" দান্তে পাল্টা চিৎকার করে ওঠে | সে একটা বল তুলে তোমার দিকে ছুঁড়ে মারে, যা অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় – "কিছু বলার থাকলে জোরে বল!"

- "আমি খেলতে চাই," এবার আরও জোরে তুমি কথাটা পুনরাবৃত্তি করো |

- "কী?"

- "আমি খেলতে চাই!"

কয়েকজন ছেলে আঘাত লাগার আগেই তোমাকে জিম থেকে বের করে দেওয়ার জন্য আবার তোমার দিকে এগিয়ে আসে, কিন্তু দান্তে তাতে বাধা দেয় – "ওর কাছ থেকে সরে যাও! এটা আমার আর এই ছেলেটার ব্যাপার!"

তোমার হৃদস্পন্দন ছাড়া পুরো জিমটা নীরব | তোমার ছোট ছোট, স্নায়বিক শ্বাসগুলো সময় মেপে চলেছে |

- "দেখো সকলে," দান্তে হঠাৎ ঘোষণা করে – "এই খেলায় ছেলেটা আমার জায়গাটা পেয়েছে |" তারপর সে তোমার দিকে ফিরে তাকায় – "তুই হেরে যাওয়ার পর, ওই দরজা দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাবি, আর কখনো এখানে ফিরে আসবি না, শুনছিস?"

তুমি সেখানে দাঁড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ তাকে পর্যবেক্ষণ করো, তার উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করো, এটা কোনো ধরনের কৌশল কিনা, তুমি এখনও বিপদে আছ কিনা, তা বোঝার চেষ্টা করো | কিন্তু তোমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই নিজেকে কোর্টের দিকে ধাক্কা খেতে দেখো |

- "তুমি ডলার বিলের সাথে খেলবে |" কেউ একজন তোমাকে বলছে |

কী ঘটছে তা বুঝতে এক মিনিট সময় লাগে | তারা তোমাকে খেলতে দিচ্ছে | আর যদি তুমি কোনো ভুল করো, তাহলে সব শেষ | যখন দান্তে তোমার মুখের সামনে চলে এসেছিল, তখন তোমার হৃদস্পন্দন যতটা দ্রুত হচ্ছিল, বল খেলা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তা আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে | কারণ এটাই পুরো পৃথিবীর একমাত্র জায়গা যেখানে তুমি সত্যিই জীবিত অনুভব করো | যেখানে তোমার মস্তিষ্ক কাজ করা বন্ধ করে দেয় এবং প্রতিটি পদক্ষেপ সহজাত প্রবৃত্তির বশে নেওয়া হয় | জড়তা কাটিয়ে ছন্দে ফেরার জন্য কোর্টের এদিক-ওদিক মাত্র দু'বার দৌড়াদৌড়িই যথেষ্ট | প্রথমবার যখন উইং-এ তোমার দিকে বলটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তুমি তোমার ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বেরিয়ে যাও এবং লেনের ভেতরে ঢুকে কাঁচের বোর্ডে লাগিয়ে দশ ফুটের একটি ছোট ব্যাংক শট নাও | সাইডলাইনে থাকা কয়েকজন ছেলে তখন 'ওহ' 'আহ' করে ওঠে | কয়েকটা প্লে পরেই তুমি বিশ ফুট দূর থেকে একটা ওপেন শট বাস্কেটে ফেলো, শুধু নেটটাই নড়ে ওঠে, ঠিক দান্তের স্টাইলে | তুমি হাফ কোর্টের কাছে ডলার বিলকে কাটিয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে গিয়ে রিমের উপর দিয়ে একটা ফিঙ্গার রোল করো | আর এরপর যখন তুমি ডিফেন্সের জন্য পেছনে ফিরছ, তখন শুনতে পাও পুরো জিমটাই উল্লাসে ফেটে পড়ছে | এখন তুমি খেলার গভীরে পুরোপুরি ডুবে গেছ | বাইরের জগৎটা পিছলে আড়ালে চলে যায়, আর তুমি শুধু তোমার চারপাশের ছন্দবদ্ধ নড়াচড়াগুলোই দেখতে পাও | সেই নাচ | জুতোর ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ, গোঙানি আর শরীরের সাথে শরীরের ধাক্কার এক সুন্দর ঐকতান | প্রতিটা মানুষের ভারী শ্বাস আর তার চোখগুলো যেন তার মনের গভীরে যাওয়ার এক প্রবেশদ্বার | তুমি আরও দুটি দূরপাল্লার জাম্পার বাস্কেটে ফেলো, এরপর লেনের ভেতর থেকে একটা গেম-জয়ী স্কুপ শট, যার ফলে প্রতিপক্ষের লম্বা খেলোয়াড়টা নিজের পায়ে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় | তোমার দলের ছেলেরা মাঠের মাঝখানে তোমাকে ঘিরে ধরে | তারা বলে, "সাবাস, ইয়ং ম্যান! এভাবেই বোকাদের বুঝিয়ে দিতে হয় |"

কয়েকজন বলতে থাকে যে তারা নাকি সারা গ্রীষ্ম ধরে তোমাকে দলে নেওয়ার কথা ভাবছিল, কিন্তু সুযোগই পাচ্ছিল না, ইত্যাদি, ইত্যাদি | কিন্তু যেই না তুমি নিজেকে নিয়ে গর্ব করতে শুরু করবে, দান্তে আবার তোমার সামনে এসে হাজির হবে – "কী ব্যাপার, দুটো জাম্পার মেরেছিস, আর অমনি নিজেকে কেউকেটা ভাবতে শুরু করেছিস?"

- "না, আমি তো শুধু..."

- "আমার কোর্ট থেকে নেমে যা, পুঁচকে |"

- "কিন্তু..."

সে তোমার হাত ধরে তোমাকে গ্যালারির দিকে ছুঁড়ে দেবে, আর বাকি সবাইকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে বলবে, "এই, আমি আমার জায়গা ফিরে পেয়েছি! চেক বল!"

তুমি হয়তো এখানে প্রতিরোধ করার কথা ভাববে, কিন্তু তা করো না। আমার কথা বিশ্বাস করো।

আসল কথা হ'ল, তুমি প্রমাণ করেছ যে তুমি খেলতে পারো। যারা তোমার এই খেলা দেখল, তারা এখন তোমাকে অন্য চোখে দেখবে। এর প্রমাণ হিসেবে, ত্রিশ সেকেন্ডও পেরোয়নি, স্লিম নামের একজন ছেলে হেঁটে এসে বলবে, "এই, ইয়ং ম্যান, এরপর আমার পালা। আমার সাথে খেলবে?"

- "অবশ্যই।"

রব এই কথাগুলো শুনে চিৎকার করে বলবে, "এই, স্লিম, আমি তো ভেবেছিলাম তোমার দলে পাঁচজন হয়ে গেছে। কাকে বাদ দিচ্ছ?"

- "তোমাকে।"

- "আমাকে?"

- "তুমি এই ছেলেটার কেরামতি দেখেছ তো, তাই না? আমার একজন পয়েন্ট গার্ড দরকার।"

- "কিন্তু তুমি তো বলেছিলে আমি দলে আছি, স্লিম। তোমার বন্ধুর সাথে এমনটা করো না..."

এই বিতর্কের মাঝেই একটা এলোমেলো বল গড়িয়ে তোমার দিকে মাঠের বাইরে চলে আসবে, এবং দান্তে সেটার পিছু নেবে। সে বলটা ধরে তোমার থেকে পাঁচ ফুটেরও কম দূরত্বে হাঁটু গেড়ে বসে তার জুতার ফিতে বাঁধবে আর নিচু গলায় বলবে, "এই, ছেলে।"

- "হ্যাঁ?"

সে জুতার ফিতে বাঁধার মাঝেই তোমার দিকে চোখ তুলে তাকাবে – "তুমি যদি খেলায় নামতে চাও, তাহলে একটা ভীতুর মতো ওখানে বসে থাকবে না, তাই না? তুমি উঠে দাঁড়াবে এবং জিমে সবচেয়ে শক্তিশালী লোকটাকে চ্যালেঞ্জ করবে। আমার মতো কাউকে। তারপর তুমি তোমার কাজটা করবে। বুঝতে পেরেছ?" তার তীব্র চোখদুটো তোমার বুকের ভেতর ছুরির মতো বিঁধবে।

- "আচ্ছা, স্যার।"

সে উঠে দাঁড়াবে এবং মাথা নাড়বে, তারপর দৌড়ে কোর্টে ফিরে যাবে, চিৎকার করে বলবে, "এই, বল চেক করো! চলো শুরু করি!"

তুমি ভাববে এটা কোনো অর্থপূর্ণ পরামর্শের শুরু, কিন্তু তা হবে না। আসলে, গ্রীষ্মের বাকিটা সময় দান্তে তোমার সাথে আর একটাও কথা বলবে না। এমনকি তুমি সরাসরি কোনো প্রশ্ন করলেও না। কিন্তু সময়ের সাথে তুমি তার নীরবতার শক্তি দেখতে শুরু করবে। এবং আশ্চর্যজনকভাবে এটা তোমাকে তোমার বাবার নীরবতার কথা মনে করিয়ে দেবে।

নবম শ্রেণীতে থাকাকালীন কয়েক মাস পর, তোমার একটি ম্যাচের সময় গ্যালারিতে দান্তেকে দেখতে পাবে। সে একা একা বসে পপকর্ন খাচ্ছে আর খেলা দেখছে। তুমি ভার্সিটি দলের স্টার্টিং পয়েন্টের গার্ড হিসাবে থাকবে – একজন নবম শ্রেণীর ছাত্রের জন্য সেটা চাট্টিখানি কথা নয়। এবং সেদিন তুমি সিজনের সেরা খেলাটি খেলবে। হাফ-টাইমের সময় দান্তের পাশ দিয়ে দৌড়ে যাওয়ার সময় তুমি তার দিকে হাত নাড়বে, কিন্তু সে মোটেই হাত নাড়বে না। সে তার পপকর্ন খেতেই থাকবে। এরপর খেলার শেষে তুমি তাকে খুঁজতে লোকভর্তি গ্যালারিতে উঠে আসবে, কিন্তু সে ততক্ষণে চলে গেছে। তবে তোমার বাবা সেখানে থাকবেন। আর সেই রাতে তোমার অ্যাপার্টমেন্টে ফেরার পথে তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপলব্ধি করবে। তোমার বাবা সবসময়ই তোমার সাথে আছেন এবং তিনি সবসময়ই ছিলেন। আর তুমি কত পয়েন্ট স্কোর করেছ, কতগুলো অ্যাসিস্ট করেছ, সে বিষয়ে তিনি কিছু না বললেই বা কী আসে যায়? বড় জয়টা নিয়ে আলোচনা না করে তিনি যদি রেডিওতে খবরের অনুষ্ঠান চালিয়ে দেন, তাতেও বা কী? হয়তো শব্দগুলোই আসল গুরুত্বপূর্ণ নয়। হয়তো শব্দগুলো তোমার নিজের মতো করে ভাবার স্বাধীনতাটুকুই কেড়ে নিত। এই গ্রীষ্মে তুমি যা করেছ।

নবম শ্রেণীর প্রথম দিনে তোমার প্রথম ক্লাসটি হবে মিস্টার হাওয়ের সাথে ইংরেজি ক্লাস। অন্য সবার সাথে তুমিও ধীর পায়ে ঘরে ঢুকবে। তোমার নামের ট্যাগ লাগানো ডেস্কটি খুঁজে নিয়ে বসে পড়বে। মিস্টার হাওয়ে ক্লাসের সবার সাথে পরিচিত হওয়ার পর সবাইকে একটি করে কাগজ বের করতে বলবেন। এবং তিনি সেমিস্টারের পুরো সময়ে দেওয়া সতেরো হাজার লেখার বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি তোমাদের দেবেন। তিনি বলবেন, "এটা সহজ। আমি শুধু চাই তোমরা এই গ্রীষ্মে করা একটি কাজ এবং শেখা একটি জিনিস বর্ণনা করো। তোমাদের জন্য পনেরো মিনিট সময়। শুরু করো!"

তুমিও অন্য সবার সাথে বিরক্তি প্রকাশ করবে, কিন্তু একবার লেখা শুরু করলে গ্রীষ্মের স্মৃতিগুলো উপচে পড়বে | তুমি লিখবে VW বাগ গাড়িতে ঘুমানোর কথা, পুলিসের জানালা ধাক্কা দেওয়ার কথা, দীর্ঘ হাঁটার পথে পার হওয়া সব বিক্রেতাদের কথা, আর কীভাবে গরমের দিনে পুরোনো জিমের দেয়ালগুলো মচমচ করত, এবং কীভাবে গ্রীষ্মের দ্বিতীয়ার্ধে তুমি সব খেলায় সুযোগ পেতে আর ছেলেরা তোমাকে 'মেক্সিকান বাকেটস' বলে ডাকতে শুরু করেছিল এবং কে তোমাকে পাহারা দেবে তা নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করত | কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে, কোর্টে কাটানো সময়টা আসলে গ্যালারিতে কাটানো সময়ের মতো ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না | আর তুমি তোমার বাকি সবটুকু সময় একটি আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মুহূর্তের বর্ণনা দিতেই ব্যয় করবে | জিমে তোমার শেষ সপ্তাহে স্লিম তোমাকে দুপুরের খাবারের জন্য একটি হট ডগ আর কোক কিনে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল | সে বলেছিল যে, প্রতিদিন তোমাকে মুঠো মুঠো সাধারণ গ্রানোলা মুখে পুরতে দেখতে দেখতে সে ক্লান্ত হয়ে গেছে – "তুমি তো বেড়ে ওঠা ছেলে, দোস্ত | তোমার একটা সুষম খাদ্য দরকার | চলো, তোমাকে একটা হট ডগ আর কোক কিনে দিই |"

- "না, ধন্যবাদ |" তুমি তাকে বলেছিলে |

সে অবাক হয়ে তোমার দিকে তাকাল – "তুমি নিশ্চিত? আমার তরফ থেকে ট্রিট |"

- "না, আমি ঠিক আছি," তুমি বললে | "তবে ধন্যবাদ |"

- "ঠিক আছে |" সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আমার মনে হয় তুমি সত্যি ওই গ্রানোলা খুব পছন্দ করো |" তারপর সে চলে গেল | আসলে, সেদিন তুমি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে কারণ তুমি জানতে যে তার কাছে কোনো টাকা নেই | গ্রীষ্মের শুরুতে সে তার নিরাপত্তারক্ষীর চাকরিটা হারিয়েছিল | তার জুতো ছিঁড়ে যাচ্ছিল এবং তুমি শুনেছিলে যে তাকে তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে | তুমি ভেবেছিলে, না বলাটাই সঠিক কাজ ছিল | কিন্তু সেদিন বিকেলে গাড়িতে করে বাড়ি ফেরার পথে তোমার বাবা হতাশায় মাথা নাড়লেন | গ্রীষ্মকালে এই প্রথমবার তিনি তার খবরের অনুষ্ঠান শোনা বন্ধ করলেন | তিনি বললেন, "যখন একজন নিঃস্ব মানুষ তোমাকে কিছু দেওয়ার প্রস্তাব দেয়, তখন তা গ্রহণ করা উচিত |"

- "তুমি করো?"

- "সবসময় |"

- "কেন?"

হাইওয়েতে উঠতে উঠতে তোমার বাবা তোমার দিকে একবার তাকাবেন | বলবেন, "সেটাই করতে হয়, বুঝলে?"

কথাটা তখন তোমার মাথায় ঢুকবে না | তুমি তো আসলে স্লিমের টাকাটা বাঁচাতে চেয়েছিলে | কিন্তু আজ যখন ওই ঘটনাটার কথা লিখতে যাবে, তুমি কিন্তু ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখতে শুরু করবে এবং তুমি তোমার অ্যাসাইনমেন্টটি শেষ করবে এই বলে, "আমি যা শিখেছিলাম তা হ'ল, যে মানুষটা বেশিরভাগ সময় চুপ থাকে, সে যখন কোনো পরামর্শ দেয়, তখন সেটা মেনে নিতে হয় | এমনিই মেনে নিতে হয়, ঠিক আছে?"

*****



{ম্যাথিউ দে লা পেনা একজন আমেরিকান শিশুতোষ লেখক যিনি তরুণদের জন্য উপন্যাস রচনায় বিশেষজ্ঞ | 'পেনা' শব্দের অর্থ দুঃখ বা বেদনা | তিনি ২০১৬ সালে তাঁর "লাস্ট স্টপ অন মার্কেট স্ট্রিট" বইয়ের জন্য নিউবেরি পদক জিতেছিলেন |}





নিবেদিতা এবং সিদ্ধার্থ গাঙ্গুলীর বাড়িতে প্রবাস বন্ধু পাঠচক্রের সভ্যদের নববর্ষ উদ্‌যাপন সভা

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা ১৪৩৩ (2026)

প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় আমরা শুধুমাত্র বাংলা লেখা প্রকাশ করি।
যাঁরা এই পত্রিকায় লেখা বা আঁকা পাঠাতে ইচ্ছুক,
তাঁরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান।
কেবলমাত্র Google বাঙলায় টাইপ করা লেখা নেওয়া হয়।
https://www.google.com/intl/bn/inputtools/try/ এই ওয়েবসাইটে গিয়ে টাইপ করুন।
লেখা pdf করে পাঠাবেন না। **Word**-এ পাঠাবেন। প্রসঙ্গত Vrinda টাইপও ঠিক হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:

Malabika Chatterjee
6 Wimberly Court
Decatur, GA 30030-2802
e-mail address: c.malabika@gmail.com

অথবা

Sujay Datta
41 Rotili Lane
Copley, OH 44321
e-mail address: sujayd5247@yahoo.com

সাহিত্য সভার সভ্য হবার বাৎসরিক চাঁদা পরিবার পিছু ২৫ ডলার।
প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার অধিবেশন পরিচালিত হয় বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে।
বছরে দুবার (নববর্ষ সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা) 'প্রবাস বন্ধু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
লেখা পাঠাবার ইচ্ছা থাকলে নববর্ষ আর দুর্গাপুজোর পনেরো দিন আগে লেখা জমা দিন।
এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রবাস বন্ধু ওয়েববসাইটে **https://www.prabashbandhu.org/**
রবি ও চন্দ্রা দে-র বাড়িতে পাঠচক্রের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বাংলা বই আছে।
সেগুলি সভ্যরা ব্যবহার করতে পারেন।
সাহিত্য সভার সভ্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন রবি ও চন্দ্রা দে-র ঠিকানায়।

Rabi & Chandra De
8 Prospect Place
Bellaire, TX 77401
Phone: 713-669-0923
e-mail address: rabide@yahoo.com


শুভ
শারদীয়া